বঙ্গীয় সাবর্ণ কথা
কালীক্ষেত্র কলিকাতা

[একটি ইতিবৃত্ত]

ভবানী রায় চৌধুরী

মান্না পাবলিকেশন

৩০/১ বি, কলেজ রো • কলকাতা-৭০০ ০০৯

BANGIYA SABARNA KATHA
KALIKSHETRA KALIKATA
By Bhabani Roy Choudhuri

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ লেখক
প্রচ্ছদ ঃ সন্দীপ রায় চৌধুরী ও জয়দীপ রায় চৌধুরী

প্রকাশক ঃ অশোক মান্না
মান্না পাবলিকেশন, ৩০/১বি, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ৯৪৩৩১৮৬০৬৪

টাইপসেটিং ঃ স্বস্তিকা এন্টারপ্রাইজ
১৯/১, নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণ ঃ নবলোক প্রেস
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

আমাদের পূর্বপুরুষ
সাধনসিদ্ধ কামদেব ব্রহ্মচারী
এবং
ইষ্টদেবীর বরপুত্রী সাধ্বী পদ্মাবতী দেবীর
চরণ কমলে—

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ

সাবর্ণ সংগ্রহশালার পক্ষে সম্পাদকমণ্ডলী—

শ্রী নির্মল কুমার রায় চৌধুরী

শ্রী কানুপ্রিয় রায় চৌধুরী

শ্রী মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী

শ্রী চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী

শ্রী শিবসৌম্য বিশ্বাস

শ্রী দেবর্ষি রায় চৌধুরী

কুমারী বহ্নি রায় চৌধুরী

এ পর্যন্ত সংগ্রহশালায় সংগৃহীত পুরানো দলিল-নথিপত্র, পারিবারিক সূত্র, বংশতালিকা এবং গ্রন্থাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহৃত হল।

যোগাযোগ

সাবর্ণ সংগ্রহশালা, ''সপ্তর্ষি ভবন'' বড়বাড়ি, বড়িশা, কলকাতা-৭০০ ০০৮

ফোন : ২৪৯৬-২৪৭৮, ২৪৪৭-৩৫৫০

ভূমিকা

১.

মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাস-চর্চা মুখ্যত মুসলমান-বিজয়ের (১২০৩ খ্রি.) পর থেকে সুলতানি শাসনকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও প্রাচীনকাল থেকে নির্দিষ্ট এক ভৌগোলিক গণ্ডিতে আবদ্ধ এই অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাস আজো বহুলাংশে অজ্ঞাত থেকে গেছে। এক শ্রেণির ইতিহাসবিদের মত অনুসরণ করে যদি আমরা মেনে নিই যে এই বাঙলা তথাকথিত আর্যদের কাছে এক 'ব্রাত্য' দেশ বলে পরিগণিত হোত, যেখানের বেশিরভাগ স্থানই ছিল জঙ্গলাকীর্ন, পথঘাট প্রায় কিছুই ছিল না, আদিবাসী মানুষ যেখানে বাস করত তাদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থার মধ্যেও নিজস্ব সংস্কৃতিকে পোষণ করে তা'হলে একথা বলতে হয়, আর্যদের উন্নততর সংস্কৃতির লেশমাত্র সেখানে ছিল না। এই 'লাঢ়' বা রাঢ় দেশে জৈন ধর্ম প্রচার করতে এসে জৈনধর্ম প্রচারক পার্শ্বনাথ ও তার অনুগামীদের প্রতি এই স্থানের আদিম অধিবাসীরা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। এই কথা আমরা পাই 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ ও প্রচার এই দেশে আরো অনেক পরে হয়। বিশেষ করে, বেদের যে প্রবর্তয়তা আর্যরা, সেই বেদচর্চা বাঙলাদেশে সেসময় একেবারেই ছিল না। বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ ও বেদবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করার জন্য বাঙলাদেশে বেদজ্ঞ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত না থাকায় খ্রিষ্টীয় দশম শতকের শেষ দিকে রাজা আদিশূর উত্তরপ্রদেশের কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে এখানে নিয়ে আসেন। তাঁরা হলেন শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ. দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। রাজা আদিশূর তাঁদের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি দান করে বেদবিহিত যাগযজ্ঞ, পুজোপাঠ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করায় এদেশে বেদোক্ত যাগযজ্ঞ ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার্চনা প্রচলিত হয়। তখন বাঙলায় পাল সম্রাটদের শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল। তাঁরা প্রধানত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার তখন খুব একটা হয় নি। কিন্তু তারও আগে গুপ্তসম্রাটদের শাসনে বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে প্রসার হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। পাল আমলে তাতে কিছু ভাটা পড়েছিল।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদগর্ভ ছিলেন অষ্টম মনু সাবর্ণের বংশোদ্ভূত। সাবর্ণ (সাবর্ণি নামেও পরিচিত) ছিলেন তাঁর গোত্রের প্রবর্তক। সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ মল্লভূম রাজ্যের বটগ্রামে প্রথম বসতি করেন। সাবর্ণের বংশধারা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বেদগর্ভের দ্বাদশ পুত্র তাঁদের বাসগ্রাম অনুসারে 'গাঙ্গুলি' প্রভৃতি নানা 'গাঁই' বা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বেদগর্ভের বংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ভট্ট ভবদেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত ও দক্ষ প্রশাষক। তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ' গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। বেদগর্ভের জ্যেষ্ঠপুত্র রাঘব বর্ধমান অঞ্চলের

গঙ্গার নিকটবর্তী 'গঙ্গগ্রামে' বাস করায় 'গঙ্গোপাধ্যায়' পদবি গ্রহণ করেন। এঁর পরবর্তী অনেক বংশধর এই 'গঙ্গোপাধ্যায়' পদবি ব্যবহার করেছিলেন।

এই সাবর্ণবংশধারা সুপ্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কালেও বহু কৃতী সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কোলকাতার বড়িযা অঞ্চলের 'সাবর্ণ চৌধুরী' বা 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী' বংশ। মধ্যযুগে মুঘল আমলে এঁরা রায় চৌধুরী, মজুমদার প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। আবার নবাবি আমলেও স্বীয় কর্মদক্ষতার জন্য 'রায় চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের বিভিন্ন শাখা বর্তমান পশ্চিম বাঙলার নানা স্থানে বসতি করে। হালিশহর, নিমতা-বিরাটি, উত্তরপাড়া এবং শেষ পর্যন্ত প্রাচীন কোলকাতার সন্নিকটবর্তী বড়িষা বা বড়িশায় এসে এই রায় চৌধুরী বংশ স্বীয় প্রতিভা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতায় জমিদারি লাভ করে নানা জনহিতকর কার্যে ব্রতী হয়। এই বংশের বংশতালিকা লক্ষ করলে দেখা যায়, বেদগর্ভের পরবর্তী দ্বাবিংশতিতম পুরুষ রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার রায় চৌধুরী ছিলেন এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর জীবৎকাল ১৫৭০-১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ। লক্ষ্মীকান্তের প্রসঙ্গে আসার আগে বংশতালিকা থেকে জানা যায়, তাঁর পিতৃদেব কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে জীয়া (১৫৩৫/৩৮-১৬২০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন সাধক। লক্ষ্মীকান্তের মাতা সাধ্বী পদ্মাবতী দেবী। লক্ষ্মীকান্তের প্রপিতামহ পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় বা 'পাঁচু শক্তি খান' ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে বর্তমান হুগলি জেলার গোহট্ট গোপালপুরে (গোঘাটা) বাস করে পরে হাভেলি শহর বা হালিশহরে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ হুমায়ুনের মুঘলসৈন্যের সেনাপতি। বাদশাহের সঙ্গে পাঠান সম্রাট শেরশাহের যুদ্ধে শেরশাহ পরাজিত হলে হুমায়ুন তাঁকে 'শক্তিখান' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেনাবাহিনীর কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে পাঁচু শক্তি খান বা পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় হাভেলি শহর পরগণায় (উত্তর চব্বিশ পরগনার বর্তমান হালিশহর) নতুন সমাজ গঠন করে হাভেলি সমাজ বা হাভেলি শহর গড়ে তোলেন। তার আগে এবং পরবর্তীকালেও এই স্থান কুমারহট্ট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পাঁচু শক্তিখানের পুত্র শম্ভুপতি এবং তাঁর পুত্র কামদেব বা জীয়া। হুগলি জেলার গোহট্ট-গোপালপুরে জন্মগ্রহণ করলেও জীয়া হাভেলি শহরে আসেন সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভের জন্য। জীয়া বা কামদেব পরে কালীক্ষেত্র, কালীঘাটে সস্ত্রীক বাস করে তন্ত্রসাধনা করে 'কামদেব ব্রহ্মচারী' নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও নৈয়ায়িক। কামদেব ও পদ্মাবতীর যে সন্তান হয়, তাঁর নাম লক্ষ্মীকান্ত।

লক্ষ্মীকান্ত কৈশোর থেকেই অদ্ভুত প্রজ্ঞা, বিদ্যাবত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বারো ভূঁইয়া বিক্রমাদিত্যের অধীনে সপ্তগ্রাম সরকারের রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত হন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্যেরও তিনি দেওয়ান নিযুক্ত হন। মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানি ছেড়ে দেন। সে সময় রাজা মানসিংহ ছিলেন 'গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপতি'। কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ

মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচটি পরগনার ও হাতিয়াগড় পরগনার কতক অংশের জায়গির ও সনদ আনিয়ে দেন। জায়গির লাভের পর তাঁর পরিচালনা ও রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থার জন্য লক্ষ্মীকান্তের পুত্র গৌরহরি বা গৌরীকান্ত (১৬০০-১৬৯০ খ্রি.) পূর্বোক্ত গোহট্ট গোপালপুর থেকে বর্তমান দমদমের কাছাকাছি নিমতা রিবাটিতে বাসস্থান তৈরি করেন।

মুঘল আমলের শেষদিকে নবাব মুরশিদকুলি খাঁয়ের নির্দেশে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে যে জরিপ বা ভূমি বন্দোবস্ত হয়, তাতে বাঙলা সুবা চৌত্রিশটি সরকার ও তেরটি চাকলা ও ১৩৫০টি মহালে বা পরে আবার ১৬৬০টি পরগণাতে বিভক্ত হলে প্রতি চাকলায় একজন করে রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী নিযুক্ত হন। লক্ষ্মীকান্তের প্রপৌত্র কেশবরাম (১৬৫০-১৭২৬ খ্রি.) দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব সংগ্রহের কর্মচারী (জমিদার) নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'রায় চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। তিনি এবং তাঁর আত্মীয়েরা সে সময় জমিদারি সুবন্দোবস্তের জন্য জমিদারির কেন্দ্রস্থলে কোলকাতার সংলগ্ন বড়িষায় বসতি স্থাপন করেন। পরিবারের পরিচিত হয় 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী'। যদিও তাঁরা মজুমদার, রায়, রায় চৌধুরী উপাধিগুলিও ব্যবহার করতেন। লক্ষ্মীকান্ত মানসিংহের কাছ থেকে বিশাল ভূসম্পত্তি লাভ করা ছাড়াও 'মজুমদার', 'রায় চৌধুরী' উপাধির দ্বারা ভূষিত হন। কেশবরামের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন রায় কুশল মজুমদার চৌধুরী (১৭১৭ খ্রিঃ)। তাঁর জেষ্ঠপুত্র রামদুলাল বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার খেপুতে জমিদারি লাভ করে বসতি স্থাপন করেন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। তখন এই অঞ্চল চিতুয়া বা চেতুয়া পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিন্তু বড়িষার সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশ কোলকাতার ইতিহাসে আজো এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে বর্তমান কোলকাতার পত্তনের মূলে। কারণ সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই তিনটি গ্রাম কেশবরামের তিন নাবালক পৌত্র রামভদ্র প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানিকে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ই নভেম্বর তেরশ টাকার বিনিময়ে 'লিজ' দিয়েছিলেন। তার আগে কোম্পানি তখনকার বাঙলার সুবাদার (নবাব) আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস্-সান বা আজিমুদ্দিনকে ষোল হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়ে ওই তিনটি গ্রাম সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের কাছ থেকে নেবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন। সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের একটি পাকাবাড়ি ছিল বর্তমান লালদিঘির পাড়ে। সেটি ছিল কাছারিবাড়ি। এটিই তখন কোলকাতার একমাত্র কোঠাবাড়ি ছিল বলে জানা যায়। জোব চার্নকের জামাতা চার্লস আয়ার প্রথমে এটি কোম্পানির সেরেস্তা রাখার জন্য ভাড়া করেন। এটি সে সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম অফিস বাড়ি হয়। জমির মালিক সাবর্ণ রায় চৌধুরীর সঙ্গে

বায়না নামার ফলে মুঘল দরবারে দেয় খাজনা নির্ধারিত হয় ১১৯৪ টাকা ১৩ আনা ৫ পাই। সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের সঙ্গে একটি অঙ্গীকারপত্র লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এই তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব লাভ করার পর ইংরেজ কোম্পানির মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। জমিদারের মতো খাজনা আদায়ের অধিকারও তাদের হাতে আসে। তারা দুটি কাছারি বাড়ি তৈরি করে ও শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ রাখারও অধিকার লাভ করে।

২.

লেখক শ্রীভবানী রায় চৌধুরী তাঁর লিখিত **'বঙ্গীয় সাবর্ণ কথা—কালীক্ষেত্র কলিকাতা'** [একটি ইতিবৃত্ত] নামক বর্তমান গ্রন্থে বাঙলার একটি প্রাচীন বংশের ইতিহাস কয়েকটি অধ্যায়ে বিবৃত করেছেন। বহু আগে লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থে বাঙলার অনেক বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা পেয়েছি। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও বাণী কুমার রচিত 'রায় বাঘিনী' গ্রন্থেও আমরা একটি বিস্মৃতপ্রায় রাজবংশের পরিচয় পাই। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থেও আমরা প্রাসঙ্গিক তথ্য পেয়েছি। সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর 'বন্দর কাশিমবাজার' গ্রন্থেও কাশিমবাজার ও রাজপরিবার সম্পর্কে জানা যায়। আঞ্চলিক যে সব ইতিহাস বহুকাল ধরে রচিত হয়েছে, যেমন হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা সেকালের ও একালের', সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস', প্রাণকৃষ্ণ দত্তের 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত', বিনয় ঘোষের 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা কিছু কিছু রাজা বা জমিদারবংশ সম্পর্কে জানতে পারি। ইংরাজিতেও এ ধরনের গ্রন্থ আছে, যেমন, লোকনাথ ঘোষের জমিদারদের সম্পর্কিত গ্রন্থ।

কিন্তু বড়িষার জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরীরা কোলকাতার মতো সুপ্রসিদ্ধ স্থানের সঙ্গে মধ্যযুগে যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং মুঘল আমল ও তার আগে থেকে বাঙলার সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই তথ্য এতদিন আমাদের কাছে অনেকটা অজ্ঞাত ছিল। গ্রন্থকার ভবানী রায় চৌধুরী নিজে সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের খেপুতে আগত রামদুলাল রায় চৌধুরীর বংশধর হওয়ায় এই বংশের একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনায় আগ্রহী হয়ে বিপুল পরিশ্রমে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। ২২৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি পাঠ করলে 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী' বংশের বিস্তৃত পরিচয় ও বংশতালিকা ছাড়াও কিছু কিছু কাহিনি ও উপকাহিনির মধ্য দিয়ে তিনি সেকালের প্রায় বিস্মৃত ইতিহাসের এক অজানা দিক উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন। এটি ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান রূপে পরিগণিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বড়িষার সুবিখ্যাত সাবর্ণ রায় চৌধুরীরা এক প্রসিদ্ধ গোত্রপ্রবর্তক সাবর্ণের বংশধারাকে অনির্বাণ দীপশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত রেখেছেন দীর্ঘকাল ধরে এবং তা আজও অম্লান হয়ে আছে। তা প্রতিফলিত হয়েছে সতের শতকের শেষ দিকে ইংরেজ কোম্পানির এজেন্ট

জোব চার্নককে কোলকাতার প্রতিষ্ঠাতার শিরোপা দেওয়া নস্যাৎ করার মধ্যে। বেশ কিছুকাল ধরে ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান কোলকাতার একদল বুদ্ধিজীবীর মধ্যে লালিত পালিত হচ্ছিল এবং চার্নকের কোলকাতার মাটিতে তৃতীয়বার পদার্পণের দিন ২৪শে আগস্টকে (১৬৯০ খ্রিঃ) কোলকাতার জন্মদিন বলে পরিগণিত করে এই নগরের জন্ম তিনশ বছর বা তার কিছু বেশি বলে ঘোষণা করে ওই দিনটিতে তাঁরা কোলকাতার জন্মদিন বলে জয়ধ্বনি দিয়ে আসছিলেন। বড়িষার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার সেই ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে কোলকাতা যে এক অতি প্রাচীন শহর সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একদল ইতিহাসবিদ বুদ্ধিজীবীর প্রতিবেদন ও উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় যা সেই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করে কোলকাতার প্রাচীনত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এই গ্রন্থের শেষভাগে সেই রায়ের ও ইতিহাসবিদদের প্রতিবেদন উপস্থাপিত করে গ্রন্থকার এক মহান কর্তব্য সমাপন করেছেন। জোব চার্নক যে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা প্রতিষ্ঠা করেন, একথা কোলকাতার সেন্ট জনস্ চার্চ প্রাঙ্গণের কবরখানায় ল্যাটিন ভাষায় লেখা তাঁর সমাধিলিপিতে কোথাও উল্লেখ নেই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আত্মম্ভরী প্রতিভূ রুডইয়ার্ড কিপলিং কোলকাতার প্রতিষ্ঠাতারূপে জোব চার্নককে শিরোপা ইঙ্গিত দেন এই কবিতায় ঃ

'There the midday half of Charnock
    More is the pity
    Grew a city
As the fungus sprouts chaotic from its bed
    So it spread
Chance directed, chance erected laid and built
    On the silt
Palace, byre, hovel–poverty and pride
    side by side
And above the packed and pestilential town
    Death looked down ?

অর্থাৎ দুপুরবেলায় চার্নক গঙ্গার পুব তীরে নামলেন। এর ফলে ভূঁইফোড় ছত্রাকের মতো নগরটি এলেমেলোভাবে গড়ে উঠল, পলিমাটির ওপর একদিকে বড়ো বড়ো প্রাসাদ অট্টালিকা অন্যদিকে ছোটো ছোটো বস্তি ও গোয়ালঘর পাশাপাশি থেকে জায়গাটিকে ভরে তুলল, মহামারীর শহর হোল এই কোলকাতা। সেখানে মৃত্যু অহরহ উঁকি দিতে লাগল।

যেন কোলকাতার অস্তিত্ব আগে ছিল না! অথচ কত আগে বিভিন্ন বাঙলা মঙ্গলকাব্যে 'কলিকাতা' এই নামের উল্লেখ আছে। যে যে মঙ্গলকাব্যে 'কলিকাতা'র

উল্লেখ আছে, তার মধ্যে বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসাবিজয়' কাব্য (১৪৯৫-৯৬ খ্রি.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৬০০ খ্রি.), কৃষ্ণরাম দাসের (কালিকামঙ্গল' (১৬৭৬-৭৭ খ্রি.), কেতকদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' (১৬৪০ খ্রি.), সনাতন ঘোষালের ভাগবতের বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে 'কলিকাতা'র উল্লেখ (১৬৭৯-৮০ খ্রি.), 'আইন-ই-আকবরি'তে 'কলিকাতা'র উল্লেখ (১৫৯৬ খ্রি.), ওলন্দাজ বণিক ফান ডেন ব্রুক-এর 'অঙ্কিত মানচিত্রে' কলকাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আইন-ই-আকবরি'র রাজস্ব আদায়ের খতিয়ানে 'কলিকাতা'র ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরবর্তী বর্তমান হুগলি জেলার সপ্তগ্রাম এককালে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যবন্দর ছিল। সেখান থেকে বণিক সম্প্রদায় শেঠবসাকেরা খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষ দিকে গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করেন। পরে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা এখানে কাপড়ের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এরপর সুতানুটি গ্রামের সৃষ্টি হয়। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজেরা গোবিন্দপুরের হাটে ব্যবসা করতে শুরু করে। ডেনিশ (ডেনমার্কের অধিবাসী) ভ্যালান্টাইন তাঁর ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে সুতানুটি গ্রামের উল্লেখ করেছেন। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে সুতানুটি গ্রামের উল্লেখ করেছেন। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দের আগে ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য জাহাজ গঙ্গানদীতে প্রবেশ করে নি। তখন ওড়িশ্যার বালেশ্বরই ছিল জাহাজ নোঙর করার প্রশস্ত বন্দর। ওই বছরই ইংরেজদের বাণিজ্য জাহাজ 'ফ্যাকন' কোলকাতার বন্দরে প্রথম প্রবেশ করে।

শুধুমাত্র কোলকাতার উল্লেখ এইটুকুতেই নয়, কোলকাতার মধ্যস্থিত আদিগঙ্গার তীরবরাবর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন স্থান জয়নগর, মজিলপুর প্রভৃতি স্থান থেকে গুপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের পুরাতাত্ত্বিক বহু নিদর্শন মাটির ভেতর থেকে পাওয়া গেছে যার থেকে প্রমাণিত হয়, এই অঞ্চল সুপ্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই অঞ্চলে নগরায়ণ বহু আগেই ঘটেছিল। বহু জনবসতি না থাকলে এইসব পুরাবস্তু পাওয়া সম্ভবপর নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উত্তর জটায় রাজা জয়চন্দ্র কর্তৃক ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত (৮৯৭ শকাব্দ) সু-উচ্চ ইঁটের দেউলটি এই বিস্তীর্ন অঞ্চলেই বিদ্যমান। তাছাড়া বিখ্যাত 'চন্দ্রকেতুগড়' উৎখনন করে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি লক্ষ করা গেছে। লক্ষণ সেনের সুন্দরবন ও দক্ষিণ গোবিন্দপুরের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, সুন্দরবন ও তৎসন্নিহিত এক বিশাল এলাকা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত 'খাড়িমণ্ডলে'র অধীন ছিল। ওই তাম্রশাসনে 'বেতড্ড চতুরকে'র নাম পাওয়া যায়। তা কোলকাতার বিপরীত দিকে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী 'বেতড়', হাওড়া শহরের মধ্যবর্তী। এসব থেকে প্রমাণিত হয়, কোলকাতা ও তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ স্থান বহু আগে থেকেই সমৃদ্ধ ছিল। জোব চার্নকেরও আগে আর্মেনীয়রা এখানে আসে। কোলকাতায় তারা

ব্যবসাবাণিজ্য করতে থাকে। সমৃদ্ধ স্থান ও বহু জনবসতি না থাকলে এটা সম্ভবপর নয়।

বড়িষার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার একটি মহান সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লেখক ভবানী রায় চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে সেই সত্য ঘটনাকে যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরেছেন। কোলকাতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'ধর্মতলা' নামটির তিনি যে এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাও আমাদের কাছে এক নতুন তথ্য উপস্থিত করে। সুপ্রাচীন রায় চৌধুরী বংশ খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষভাগে বেদগর্ভকে ধরে মধ্যযুগে মুঘল-পাঠান শাসনাধিকারের সময় যে সম্মান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং ইংরেজ আমলেও তাঁরা যে সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার ইতিবৃত্ত বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের প্রবর্তিত বহু উৎসব, পুজো-পার্বণ মেলার উল্লেখ আছে।

বিশাল এই বংশের নানা শাখাপ্রশাখা প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে আছে। বংশতালিকা দেখে একথা জানা যায়। রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী প্রাচীন চেতুয়া পরগনা (দাসপুর থানার) খেপুতে রামদুলাল মজুমদার রায় চৌধুরীর বংশের উত্তরপুরুষগণ প্রসিদ্ধ 'ফিঙ্গারাজার ডাঙা'র সন্নিকটে আজো বর্তমান। এ বংশেও কৃতী ব্যক্তি বিরল নন। কালীপূজা এই বংশের ওই স্থানের প্রসিদ্ধ উৎসব। খেপুত গ্রামে খেপুতেশ্বরী মাতার প্রসিদ্ধি বহুদূর বিস্তৃত।

এই ধরনের পারিবারিক ইতিহাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে, যা কোনক্রমেই অবহেলার যোগ্য নয়। গ্রন্থকার ভবানী রায় চৌধুরী দীর্ঘকাল পরিশ্রম করে বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করে বিশাল 'রায় চৌধুরী' বংশের এক এক শাখার 'কুড়চিনামা' প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে ও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করায় গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বাঙলার এইরূপ পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হলে কোন বিশেষ অঞ্চল ও সমগ্র রাজ্যের ইতিহাস রচনায় তা সহায়ক হবে। সে দিক থেকে এই গ্রন্থটি মূল্যবান; এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রস্তাবনা

ইতিহাস হচ্ছে এমন এক আয়না, যাতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই মানুষের অতীত দিনের সমাজের মুখ। ঐতিহাসিকের কাজ হচ্ছে সেই আয়নাটাকে ধুলোময়লা পরিষ্কার করে ঝক্‌ঝকে করে তোলা।

অনেকের ধারনা, ঐতিহাসিক সৃষ্টি করেন ইতিহাস; কিন্তু এই ধারনা ভুল। আবির্ভাবের পর থেকে মানুষ বংশ পরম্পরায় সৃষ্টি করে চলেছে তার ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে গল্প আর কিংবদন্তির মোড়ক থেকে বের করে এনে আমাদের সামনে যিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেন, তিনিই ঐতিহাসিক।

ঐতিহাসিক যা করেন, তা হচ্ছে গবেষনার কাজ। কাজটা সকলে পারেন না। যাঁরা সব রকম সংস্কার থেকে মুক্ত এবং বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজের আস্তাকুঁড় থেকে সূক্ষ্ম উপাদানগুলোকে খোঁজার মত প্রবল ইচ্ছা আর প্রখর দৃষ্টি যাদের আছে, তাঁরাই কেবল চেষ্টা করলে ইতিহাসবিদ্ হতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরকম লোকের আগেও অভাব ছিল, এখনও আছে। যাঁদের ঐতিহাসিকের মন আর চোখ নেই, তাঁরা গবেষণার নামে যা করেন, তা পণ্ডশ্রম এবং যা ছড়ান, তা বিভ্রান্তি। যেমন, **কলকাতার জন্ম নিয়ে অনেকেই যা লিখেছেন, তা চরম বিভ্রান্তিকর। তাঁদের বই পড়ে লোকে ভুল জেনেছে, ভুল শিখেছে।**

অশিক্ষার চেয়ে ভুল শিক্ষা খারাপ। যিনি প্রকৃত শিক্ষক, তিনি কখনও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ভুল জিনিস শেখান না। তিনি যা জানেন না, ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা খোলাখুলি স্বীকার করেন। পরে জেনে নিয়ে তিনি তাদের সঠিক জিনিসটা বলে দেন। এতে তাঁর ওপর ছাত্রছাত্রীদের আস্থা এবং শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। ঐতিহাসিক হচ্ছেন এরকম একজন শিক্ষক।

কলকাতার আদিযুগের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অনেকে জোব চার্নকের কথা উল্লেখ করেছেন কিংবা 'জোব চার্নক' দিয়ে শুরু করেছেন। কিন্তু এখানকার আদি বাসিন্দা এবং আদি জমিদারদের কথা লিখতে ভুলে গিয়েছেন অথবা সজ্ঞানে এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁরা কলকাতার ইতিহাস লিখেছেন মনে মনে একটা তত্ত্ব খাড়া করে নিয়ে। তত্ত্বটা হচ্ছে : জোব চার্নক হচ্ছে কলকাতার স্রষ্টা; কলকাতা হচ্ছে জোব চার্নকের শহর। এই তত্ত্বের সপক্ষে তাঁরা কথার পাহাড় রচনা করেছেন। কলকাতার আদি মানুষরাই যে এখানকার আদি ইতিহাসের স্রষ্টা, একথা তাঁরা বেমালুম চেপে গিয়েছেন।

শহর হওয়ার আগে কলকাতা ছিল গ্রাম। শুধু কলকাতা নয়, সুতানুটি আর গোবিন্দপুরও গ্রাম ছিল। গ্রাম-তিনখানির প্রজারা খাজনা দিতেন জমিদারের কাছে। জমিদার ছিলেন সাবর্ন রায় চৌধুরী। আদি জমিদার ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। তাঁর আদি পদবী হচ্ছে 'গঙ্গোপাধ্যায়'; 'সাবর্ণ' হচ্ছে তাঁদের বংশের গোত্র। 'মজুমদার' কথাটির অর্থ হচ্ছে রাজস্বের হিসাবরক্ষক বা রাজস্ব আদায়কারী। দিল্লির বাদশা জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে দক্ষিণবঙ্গের রাজস্ব আদায়ের ভার বা জমিদারি পাওয়ার সময় তিনি 'মজুমদার' উপাধিও লাভ করেছিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত প্রথম জীবনে ছিলেন সুদক্ষ রাজকর্মচারী। যশোরের অধিপতি প্রতাপাদিত্যের অধীনে চাকরি করতেন তিনি। যুদ্ধের সময় রাজ্য শাসনের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করতেন। পরে মোগলদের হাতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটলে মোগল শাসকরা নিজেদের স্বার্থেই তাঁর উপর দক্ষিণবঙ্গের রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে যিনি রাজার কোষাগারে জমা দেন, তিনিই জমিদার বা জায়গিরদার। এই অর্থে লক্ষ্মীকান্ত দক্ষিণবঙ্গের জমিদার বা জায়গিরদার ছিলেন। কেবল গুরুদক্ষিণা নয়, নিজের যোগ্যতাও তাঁকে এই পদ লাভ করতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

কলকাতায় যখন এই মহানগরীর ৩০০ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হচ্ছিল, তখন আমি আমার 'কলকাতা-বিচিত্রা' গ্রন্থে (দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত) লিখেছিলাম ঃ

(১) কলকাতার নির্দিষ্ট কোনো জন্মদিন নেই।

(২) কলকাতা প্রথমে ছিল গ্রাম, পরে শহরে পরিণত হয়।

(৩) জোব চার্নক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা নন, কলকাতার নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠাতা নেই।

পরে হাইকোর্টের রায়ে এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ইতিহাসের বিকৃতি যাঁরা ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নামী গবেষক ঐতিহাসিকও ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে জানাই, সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ উদ্যোগী হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা না করলে কালকাতার জন্মদিন নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা দুষ্কর হত। পরিবার পরিষদের পক্ষে থেকে শ্রীমান দেবর্ষি রায় চৌধুরী মামলার শুরু থেকেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। শ্রী গোরাচাঁদ রায় চৌধুরী মহাশয় মামলার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এগিয়ে এসেছিলেন কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক এবং ঐতিহাসিক, যাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন।

বর্তমান গ্রন্থটিতে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলি হল ঃ বঙ্গে সমকালীন ব্রাহ্মণসমাজ, সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের বংশধরগণ, আমাটি গ্রামের বাসিন্দাগণ, প্রশাসনিক এবং সামাজিক পট পরিবর্তন, হালিশহর (হাভেলি শহর), সতীপীঠ কালিঘাট, দ্বাবিংশ পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত, কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুর ইজারার কথাচিত্র, সবার্ণ বংশতালিকা, হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় সাবর্ণ-বসতি, নিমতা-বিরাটিতে বসবাস, কলকাতার আদিপর্ব, বড়িশা, চন্ডীপূজা, বড়িশা বড়োবাড়ির রথযাত্রা উৎসব, বড়িশা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বড়িশা টাউন লাইব্রেরী, দু-একটি প্রাসঙ্গিক কথা, ময়দা গ্রামের কথা,বর্তমান প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন, খেপুত-উত্তরবাড়ের কথা, আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা, সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ, সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের ঐতিহাসিক জয় (কলকাতার জন্মদিনের মামলা), সাবর্ণ সংগ্রহশালা ইত্যাদি।

ভবানী রায় চৌধুরী মহাশয় 'বঙ্গীয় সাবর্ণ কথা—কালীক্ষেত্র কলিকাতা' নামক গ্রন্থটি লিখে পাঠক-পাঠিকার সামনে জানা-অজানা বহু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। কলকাতার আদি জমিদারদের কথা বলতে গিয়ে বহু প্রাসঙ্গিক কথা উচ্চারণ করেছেন তিনি। বেশ কিছু কথা-কাহিনিও এসে গিয়েছে, যেগুলি রসাত্মক হয়ে উঠেছে ভবানীবাবুর লেখার গুণে।

গ্রন্থটি পাঠকপাঠিকার কাছে সুখপাঠ্য হবে বলেই আমার বিশ্বাস। কলকাতার ইতিহাসের ছাত্র-গবেষকদের ব্যক্তিগত গ্রন্থতালিকায় এটি সংযোজিত হওয়ার উপযোগী।

আমার নিবেদন

দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর অনেকের সহযোগিতায় "বঙ্গীয় সাবর্ণ কথা—কালীক্ষেত্র কলিকাতা" গ্রন্থটি লেখা সম্ভব হল। গ্রন্থটিকে একটি ইতিহাস বললে ভুল করা হবে। মূলত এটি হল বঙ্গদেশের সাবর্ণ গোত্রীয় বংশধরগণের জীবনধারা ও জীবনকথা—একটি পারিবারিক ইতিবৃত্ত। সাবর্ণ গোত্রীয় সমস্ত বংশের কথা এতে সংযোজিত হয় নি। কেবল সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারগুলি এবং তাঁদের পূর্বপুরুষের জীবনধারাই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থটিতে বিভিন্ন স্থানের সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারগুলির জীবনধারা এবং তথ্যকথাই বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁদের জীবনধারার সঙ্গে কলিকাতা এবং কালীঘাট যতটুকু বিজড়িত কেবল সেটুকুই উল্লেখ করা হয়েছে।

জীবন কেবল জীবিকা অবলম্বন করেই হাঁটে না,—ধর্মীয় কর্ম-চিন্তা তার পাথেয় হয়। ফলে তাঁদের জীবন কথাগুলিকে অনেকের কাছে গল্পকথা মনে হতে পারে। কিন্তু তাহলে আমি অসহায়। কারণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিদ্যাসাগরের মতো সাধক ও মহাপুরুষদের জীবনকথাকেও অনেকের কাছে গল্পকথা মনে হবে। আবার অনেক ইতিহাসবিদ ভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করবেন। কী করব! .... নানা মুনির নানা মত।

গ্রন্থে 'রায় চৌধুরী' উপাধিটিকে পৃথক দুটি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এই উপাধি সাবর্ণ কুলসূর্য রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী দিল্লির মোগল সম্রাটের নিকট লাভ করেছিলেন। মোগল আমলে 'রায় চৌধুরী' উপাধিটি বিশ্লেষণ করলে 'রায়' অর্থে বিত্ত ও সৌভাগ্য আর 'চৌধুরী' অর্থে ভূ-সম্পত্তি ও জমিদারি বোঝায়। সেজন্য সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণ এই উপাধিটিকে দুটি পৃথক শব্দে ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের নিকট যাঁরা 'রায় চৌধুরী' উপাধি লাভ করেছিলেন তাঁরা উক্ত উপাধিটি একই সঙ্গে লিখে থাকেন। তাঁরা এই উপাধিটিকে সম্ভবত "সম্মান ও প্রাধান্য" অর্থে ব্যবহার করেন।

গ্রন্থে স্বীকার করেছি, তবু আবার উল্লেখ করছি—সাবর্ণ গোত্রীয় সমস্ত বংশধরগণের নাম ও জীবন পরিচয় এখনও সংগৃহীত হয়নি। সেগুলি সংগ্রহ করার ঐকান্তিক বাসনা রইল।

গ্রন্থটিতে সাবেকি বানান না লিখে বর্তমান বানানবিধি অনুসারে শব্দগুলির বানান ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে ড. প্রণব রায়, সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের সম্পাদক মণ্ডলী এবং প্রকাশক শ্রী অশোক কুমার মান্না যথেষ্ট সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছে

আমি কৃতজ্ঞ। আর যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি সেইসব গ্রন্থকারের কাছে আমি চির ঋণী এবং কৃতজ্ঞ রইলাম। আমার পরিকল্পনা অনুসারে প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রী সন্দীপ রায় চৌধুরী ও শ্রী জয়দীপ রায় চৌধুরীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভূমিকা এবং প্রস্তাবনা লিখে দেওয়ার জন্য ড. প্রণব রায় এবং রাধারমণ রায় মহোদয়গণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ভবানী রায় চৌধুরী

উত্তরবাড়, ডাকঘর ঃ খেপুত,
জেলা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন ঃ ৭২১১৪৮

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- জপমালা
- বাংলা সাহিত্যের কথা ও কল্লোল
- হারিয়ে গেল—না হারালাম
- পাথেয়
- জীবনের চালচিত্র
- উষ্ণতার জন্য
- নাম তার প্রজাপতি
- মানুষ ও মঞ্চ
- আলোর সোপান

বঙ্গে সমকালীন ব্রাহ্মণ সমাজ

দশম শতাব্দির শেষভাগে কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ পঞ্চক আনয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে হলে বঙ্গদেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

শোনা যায়, উত্তর ভারতের সিন্দুনদের তীরবর্তী আর্যগণই হলেন হিন্দু। 'স'-ধ্বনির উচ্চারণ বিভ্রমে 'হ'। সিন্ধু > হিন্দু।

কিন্তু আরও একটি কথা আছে। ....

"হীনাম্ দূষয়তে যঃ সঃ হিন্দু।"

অর্থাৎ হীনদের যে দোষ দেয় বা নীচ মনে করে সে-ই হিন্দু। এই উক্তিটির অন্তরালের সত্যটি হল—আর্যগণ উচ্চমার্গীয় চিন্তাধারায় পবিত্র কর্ম, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং স্বাবলম্বী সমাজব্যবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করতেন। কোনো নীচতা বা হীনতাকে প্রশয় দিতেন না। এতে সহজেই অনুমান করা যায়, আর্যগণ ভারতবর্ষে বসবাসকালে এই চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়ে ভারতীয়দের উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। আর্যগণ উচ্চমার্গীয় চিন্তাধারায় জীবনযাপন করতেন বলে নিজেদের উচ্চ শ্রেণিভুক্ত 'হিন্দু' এবং উচ্চ শ্রেণিভুক্ত সম্প্রদায় বলে বিবেচনা করতে লাগলেন। আর ভারতবর্ষের ভূমিসন্তানগণ অনার্য বা নিম্নশ্রেণিভুক্ত সম্প্রদায়রূপে গণ্য হতে লাগলেন।

আদিতে আর্য ব্রাহ্মণগণ সকলেই বেদজ্ঞ ছিলেন। ফলে সকলেই একই শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। পরে জ্ঞানবত্তার তারতম্য অনুসারে তাঁরা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হলেন। যিনি সতত যাগশীল অর্থাৎ যাঁর যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হত না তিনি সাগ্নিক বা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, আর যিনি সর্বদা বেদ অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন অর্থাৎ বেদজ্ঞ তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হতে লাগলেন।

বহু পরে ভারতীয় আর্যগণ গুণ ও কর্মের পার্থক্য অনুসারে চারবর্ণ বা শ্রেণিতে বিভক্ত হলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। শূদ্র জাতি ব্রহ্মার পদ থেকে জাত।

গীতায় স্বয়ং কৃষ্ণের উক্তি—"চতুর্বর্ণম্ ময়া সৃষ্ঠং গুণ-কর্ম বিভাগসঃ। অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারবর্ণের বিভাজন ঘটেছে। তবে শ্রীকৃষ্ণ কোন্ যুগে এই বিভাজন করেন শ্রীমদ্ভাগবতে তার উল্লেখ নেই। তবু সহজেই অনুমেয়—যখন হিন্দুসমাজ পূর্ণ বিকশিত হল তখন সমাজে কর্ম এবং শৃঙ্খলা ঠিক ঠিকভাবে রক্ষা করার তাগিদে এবং হিন্দুসমাজকে স্বাবলম্বী ও স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত করার প্রয়োজনেই এই বর্ণবিভাগ ঘটেছিল।

ব্রাহ্মণের ওপর শিক্ষাদান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং অনুশাসনের ভার ন্যস্ত হল। ক্ষত্রিয়গণ সমাজ রক্ষা করবেন এবং সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রতি আক্রমণ হলে তা প্রতিহত ও প্রতিরক্ষা করবেন। এরজন্য যুদ্ধবিদ্যা গ্রহণ করে রণকুশলী হবেন। বৈশ্যগণ চাষবাস, ব্যাবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব পালন করে সমাজের প্রয়োজনীয় পণ্য ও ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করবেন। আর সেবা ও শ্রমদানের কার্যে নিযুক্ত থাকবেন শূদ্রগণ। শূদ্রগণ মূলত অনার্য। সেজন্য এদের উপনয়ন ব্যবস্থা ছিল না। গায়ত্রীমন্ত্রেও দীক্ষা দেওয়া হত না। অবশ্য প্রথম তিন বর্ণের উপনয়ন ব্যবস্থা এবং গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করার রীতি ছিল। আর রীতি ছিল ব্রাহ্মণগণকেও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ক্ষত্রিয়গণকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার। অস্ত্রবিদ্যা শেখানোর দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণগণের ওপর। কেবল বেদশিক্ষা দান নয়। ফলে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ তখন ধর্মীয়, সামরিক এবং সামাজিক—সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ কেবল ভারতবর্ষের তিন বর্ণের মধ্যেই শিক্ষাদান, ধর্মানুষ্ঠান এবং সমর শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকবেন না, বিশ্বমানবকেও সর্ববিদ শিক্ষাদান করবেন।

মনুসংহিতায় (২/২০) সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে।

"এতদ্দেশো প্রসুতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষরেণ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।।

'এতদ্দেশো অর্থাৎ এইসব দেশ' বলতে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ এবং মথুরাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এসব দেশের অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট স্ব স্ব আচরণবিধি পৃথিবীর সব মানুষের শেখা উচিত।

ব্রাহ্মণধর্মের উদ্দেশ্য ছিল, কেবল অনুষ্ঠান নয়—প্রকৃত অনুশীলনের দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। বৈদিক যুগে সমাজে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণেরই প্রাধান্য ছিল, যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয়গণের নয়। ত্রেতাযুগে দশরথ বা রামচন্দ্র রাজা হওয়া সত্ত্বেও সমাজের শিরোমণি ছিলেন না। সমাজের শিরোমণি ছিলেন বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ঋষিগণ। দ্বাপরে দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং পঞ্চ পাণ্ডবগণ রাজপুত্র হয়েও ধর্মীয় এবং সামরিক শিক্ষা অর্জন করেন দ্রোণ কৃপ, পরশুরাম প্রভৃতি প্রকৃত ব্রাহ্মণগণের নিকট। কলিযুগেও মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় কূটনৈতিক, ধর্মীয় এবং যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। আরও পরে বঙ্গভূমিতেও এই রীতি দেখা যায়।

আকবরের রাজত্বকালেও বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য রায় সহ বারো ভুঁইয়াগণও এই রীতি অনুসরণ করেছেন। নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরের রানি ভবানী, পুরীর মুকুন্দদেব ইত্যাদি রাজা-মহারাজগণও ব্রাহ্মণের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের মর্যাদা দিয়েছেন। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেও কুল পুরোহিতের আদেশ ও আশীর্বাদের মূল্য ছিল।

এইসব শুভগুণগুলির মর্যাদা স্থাপন দেবী দুর্গার মেড়েও লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সামরিক শক্তির দেবতা যথাক্রমে সরস্বতী এবং কার্তিক দুর্গাদেবীর শুভ বামপার্শ্বে মহাশক্তি রূপে অবস্থান করছেন। ঐশ্বর্য আর সাফল্যের দেবতা লক্ষ্মী আর গণেশের স্থান দুর্গার দক্ষিণপার্শ্বে।

পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে অবশ্য ধনপতি কুবের বা ঐশ্বর্য বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান আরাধ্য দেবতা হয়ে উঠেছে। বর্তমান ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুসমাজে তার প্রভাব প্রকট। শিক্ষার ক্ষেত্রেও অধ্যাত্মশিক্ষার স্থান বিলুপ্তপ্রায়।

ফলে বর্ণবিভাজন বর্তমান সমাজে অন্যভাবে, অন্য পদ্ধতিতে ঘটছে—জন্মগত অধিকারের মাধ্যমে আর নয়। মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়—নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার জন্যেও। সমাজে এই সংগ্রাম এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অনেক সময় রাজশাসন এবং ধর্মীয় শাসন মানবসমাজকে অবক্ষয় আর অবনতির দিকেও ঠেলে দেয়।

খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে আমাদের বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সেরকম এক অবক্ষয় এসেছিল। সমগ্র বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েও তা ক্রমশ হীন অবস্থায় পৌঁছোয়। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ, উচাটন প্রভৃতি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। মানুষ ক্রমশ ধর্মহীন, দেবহীন হয়ে ছলা-কলা, ভেলকির আশ্রয় গ্রহণ করে। উত্তর ভারতের হর্ষবর্ধন এবং কামরূপের ভাস্করাচার্যের নিকট শশাঙ্কদেব পরাভূত হওয়ার পর বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। এমন সময় দশম শতাব্দির শেষে বাংলার শাসন কর্তারূপে উত্তর ভারতের কাম্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে আদিশূর নামক এক রাজা এলেন। তিনি রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের ক্রিয়াকলাপ, যাগযজ্ঞ দেখে হতবাক হলেন। মূলত সেইসব ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে শ্রোত্রীয় বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন তৎসৎ বা সারস্বত ব্রাহ্মণ। এই সারস্বত ব্রাহ্মণগণের পরিচয় হল—তারা বহু পূর্বে বর্তমান পাঞ্জাব-হরিয়ানা প্রদেশে সরস্বতী নদীর অববাহিকার অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা বঙ্গ দেশে সরস্বতী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সেজন্য তাঁদের সারস্বত ব্রাহ্মণ বলা হত। আবার, অন্যমতে তাঁরা সরস্বতীর উপাসনা করতেন বলে নিজেদের সারস্বত বলে পরিচয় দিতেন। যা হোক, সেইসব সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যেভাবে অজ্ঞ, সাধারণ বঙ্গ বাসীর পূজাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন রাজা আদিশূরের তা মোটেই মনঃপূত হল না। ওইসব ব্রাহ্মণের সংখ্যাও ছিল সমগ্র বঙ্গদেশে মাত্র সাতশোর মতো। সংখ্যাতেও অতি অল্প। তা ছাড়া সারস্বত ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ নন। বৈদিক ক্রিয়াকলাপে একান্ত অপারগ। এমনকি তাঁরা আমিষভোজী। খাদ্য গ্রহণেও তাঁরা ব্রাহ্মণ্যরীতি অনুসরণ করেন না।

অবশ্য এসবের মূলে অনেক কারণও ছিল। মহারাজাধিরাজ অশোকের সময় থেকে বঙ্গদেশের রাজা আদিশূরের শাসনকর্তারূপে আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত মূলত এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। সে কারণে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্রমশ বিলুপ্ত হয় এবং অল্পসংখ্যক সারস্বত ব্রাহ্মণ কোনোরকমে তা টিকিয়ে রাখেন। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় অনুষ্ঠিত হত না। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম মূল ক্রিয়াকলাপ থেকে সরে এসে একপ্রকার মিশ্রিত ক্রিয়াকলাপে পরিণত হয়।

রাজা আদিশূর বঙ্গদেশে এসে এসব প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি ঢাকা বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। সেজন্য তিনি পুত্রলাভের জন্য পুত্রোষ্টি যোগ্য করার মনস্থ করেন। তিনি বঙ্গদেশে সাতশোর মতো যেসব ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের পুত্রোষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার কথা বলতে তাঁরা সমস্বরে তাঁদের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। রাজা আদিশূর এতে শুধু হতাশ হলেন তা নয়—ভীষণ ক্ষুব্ধও হলেন। অতঃপর তিনি কান্যকুব্জের অধীশ্বরের নিকট পাঁচজন ভিন্ন গোত্রীয় বেদজ্ঞ, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে প্রেরণ করার জন্য আবেদন জানালেন। তখন কান্যকুব্জ বা কনৌজ ছিল আর্য ভারতের রাজধানী।

বঙ্গাধিপতি আদিশূরের আবেদনক্রমে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে এলেন। নির্দিষ্ট একটি শুভদিনে রাজা আদিশূর ওই ব্রাহ্মণ পঞ্চকের দ্বারা পুত্রোষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। যজ্ঞের ফলস্বরূপ অচিরে রাজমহিষী গর্ভবতী হলেন। রাজা আদিশূর অভিভূত হলেন এবং পরম শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত পাঁচ ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আন্তরিক অনুরোধ করলেন। বিদ্বান, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের ভক্তি এবং আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

যে ব্রাহ্মণ পঞ্চক বঙ্গদেশে এসেছিলেন তাঁরা কেবল বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক ছিলেন তা নয়—তাঁরা যোদ্ধাও ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। তাঁদের বাহুযুগল ছিল শালতরু সম। সুন্দর সুঠাম গঠন তাঁদের। বীরসুলভ অবয়ব। উত্তর ভারতের কান্যকুব্জ থেকে আসবার পথে হিংস্র জীবজন্তু এবং ডাকাত-তস্করের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তাঁরা সশস্ত্র ছিলেন।

উত্তর ভারতের যাদের বাঙালিরা মেড়ুয়া (ছাতুখোর) বলে অনেকে সময় উপহাস বা অবজ্ঞা করে, মূলত তাঁরাই বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণকুলের পূর্বপুরুষ।

ব্রাহ্মণগণের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা

যাহোক, রাজা আদিশূর এই সচ্চরিত্র, যজ্ঞনিপুণ, বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করানোর উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হলেন। তিনি ভাবলেন এই ব্রাহ্মণ পঞ্চক দ্বারা বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই রাজা আদিশূর পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণকে পাঁচটি গ্রাম বা এলাকা বসবাসের নিমিত্ত নিষ্করভাবে জায়গির দিলেন।

নীচে ব্রাহ্মণগণের পিতার নামসহ তাঁদের নাম, গোত্র, প্রবর এবং বাসগ্রামের তালিকা দেওয়া হল।

[তালিকা—নং-১]

ক্রমিক নং	ব্রাহ্মণগণের নাম ও পদবি (পিতার নাম)	গোত্র	প্রবর	বাসগ্রাম	সংশ্লিষ্ট প্রদেশ / অঞ্চল
১।	শ্রী বেদগর্ভ দ্বিবেদী (দুবে) পিতা—সৌভরী (স্বভরী)	সাবর্ণ	উর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব জানদগ্ন্য, আপ্লুবৎ	বটগ্রাম	মল্লভূম
২।	শ্রী দক্ষ ত্রিবেদী (তেওয়ারী পিতা—মেধাতিথি	ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য	কঙ্কগ্রাম	সিংভূম
৩।	শ্রী ভট্টনারায়ণ চতুর্বেদী (চৌবে), পিতা—বীতরাগ	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব	কামকোটি	বীরভূম
৪।	শ্রীহর্ষ পণ্ডিত (পাণ্ডে) পিতা—ক্ষিতীশ	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল (দৈবল)	পঞ্চকোটি	মানভূম
৫।	শ্রী ছন্দ : (ছান্দোড়) মিশ্র (মিশির), পিতা—সুধানিধি	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ	হরিকোটি	বর্ধমান

উক্ত পাঁচজন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যখন বঙ্গদেশে আসেন তখন প্রত্যেকে এক-একজন বীর ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ সন্তান সঙ্গে এনেছিলেন।

নীচে তাদের নাম, গোত্র এবং কুল/পদবি উল্লেখ করা হল।

[তালিকা—নং-২]

ব্রাহ্মণের নাম	সঙ্গে কায়স্থের নাম	কায়স্থের গোত্র	কুল/পদবি
শ্রী বেদগর্ভ দ্বিবেদী	শ্রী কালিদাস	বিশ্বামিত্র	মিত্র
শ্রী দক্ষ ত্রিবেদী	শ্রী দশরথ	গৌতম	বসু
শ্রী ভট্টনারায়ণ চতুর্বেদী	শ্রী মকরন্দ	সৌকালীন	ঘোষ
শ্রী হর্ষ পণ্ডিত	শ্রী বিরাট বা শ্রী দাশরথি	কাশ্যপ	গুই
শ্রী ছান্দোড় মিশ্র	শ্রী পুরুষোত্তম	মৌদ্গল্য	দত্ত

উক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চক আদিশূর কর্তৃক বাসগ্রাম জায়গির হিসেবে লাভ করায় সানন্দে বঙ্গদেশে বসবাস করতে লাগলেন। পরে তাঁদের ছাপ্পান্নটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে অধিক বাসস্থান এবং জীবিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন আদিশূর সেই ছাপ্পান্নটি ব্রাহ্মণ সন্তানকে বঙ্গদেশের বর্ধমান, রাজশাহি, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভাগে প্রত্যেককে পৃথক-পৃথক বাসগ্রাম জায়গির দিলেন।

ছাপ্পান্নটি বংশধরের মধ্যে বেদগর্ভের পুত্রসন্তান ছিল বারোটি। বেদগর্ভের একটি পুত্র বর্ধমান বিভাগের গঙ্গানদী এবং অজয় নদের অববাহিকায় 'গঙ্গগ্রাম' জায়গির পান।

দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন সংলগ্ন 'সমতট' বা পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি বিভাগ তখন জলা-জঙ্গলে ভর্তি ছিল। এখানে সাপ, বুনো মহিষ, হিংস্র শ্বাপদ বিচরণ করত। এতদঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোনো স্থলভূমি না থাকায় তেমন লোকবসতি ছিল না। এমনকি জমি জরিপের কাজও তখন শুরু হয়নি। ফলে আদিশূর প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভাগীরথীর উভয় তীরের 'সমতটের' কোনো জমি ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে জায়গির হিসেবে দেননি। দেওয়ার কোনো নজিরও পাওয়া যায়নি।

'সমতট' কথাটি চিনা পরিব্রাজক হুয়েন-সাং প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি প্রায় তিন শতক পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে জানা যায়—পূর্বে দক্ষিণবঙ্গ খালবিল, নদীনালায় ভরা ছিল। মাঝে মাঝে দ্বীপ জেগে উঠেছে মাত্র। সাগরের জোয়ারের জলে এসব অঞ্চল কানায় কানায় ভরে যেত। পরে পলি জমে জমে খণ্ড খণ্ড দ্বীপগুলি একটি 'সমতট' বা সমভূমির আকার নিয়েছে। নবদ্বীপ (নদিয়া) ন-টি দ্বীপের সমাহারে গঠিত। চক্রদ্বীপ (চাক্‌দহ), শুক সাগর, খড়্গাদ্বীপ (খড়দহ), আর্য দ্বীপ (আড়িয়াদহ), শৃগাল দ্বীপ (শিয়ালদহ) প্রভৃতি অঞ্চল দ্বীপের সমাহারে ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে গড়ে উঠেছে। এইসব অঞ্চলের ভূমিপুত্রগণের জীবনযাত্রায় দশম-একাদশ শতাব্দীতেও তেমন কোনো সামাজিক নিয়ম-নীতি বা ধর্মাচরণ অনুসৃত হত না।

সেজন্য দেখা যায়, পূর্বে বঙ্গদেশে যেসব ব্রাহ্মণ বসবাস করতে লাগলেন—তাঁদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গদেশে যেসব ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন তাঁরা রাঢ়ী শ্রেণি ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হতেন। উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণগণ পরিচিত হতেন বারেন্দ্র শ্রেণি বলে। আর পূর্ববঙ্গের (চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানের) ব্রাহ্মণগণ বৈদিক শ্রেণিভুক্ত হিসেবে গণ্য হতেন।

সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের বংশধরগণ

বর্তমান গ্রন্থে আমরা কেবল সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের বংশধরগণের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথমেই স্বীকার করে নিই—বেদগর্ভের সমস্ত বংশধরের বংশলতিকা বা কুল-পঞ্জিকা এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যাঁদের তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাঁদের বিষয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১নং তালিকার প্রথম ব্রাহ্মণ শ্রী বেদগর্ভ দ্বিবেদী (দুবে) বঙ্গদেশের প্রথম সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি চতুর্দশ মনুর অন্যতম মনু সাবর্ণ মুনির বংশধর। বঙ্গদেশে বেদগর্ভই সাবর্ণ বংশের প্রথম পুরুষ। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে আসেন। বেদগর্ভের অধস্তন পুরুষগণ বঙ্গদেশে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। বেদগর্ভের পিতার নাম সৌভরী (স্বভরী) উপাধ্যায়। তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'উপাধ্যায়'।

সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের **প্রথম পুরুষ বেদগর্ভ** বসতি স্থাপন করেছিলেন মল্লভূম প্রদেশের অন্তর্গত বটগ্রামে। বেদগর্ভ তাঁর পাণ্ডিত্যে, অধ্যাপনায় এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপে রাজা আদিশূরকে অভিভূত করেছিলেন। আদিশূর বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন—তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

বেদগর্ভ বেশ দূরদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বঙ্গসমাজকে গভীরভাবে অনুধাবন করলেন। বুঝলেন,—বঙ্গবাসী মেধাবী, কল্পনাপ্রবণ এবং খাদ্যরসিক। এদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। দৈহিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও এঁরা কল্পনাপ্রবণ হওয়ার জন্য জীবনে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। তাই মানুষ তৈরির সংকল্প নিয়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা, বেদচর্চার পাশাপাশি শারীরশিক্ষা এবং ভোজনরসিকতা চরিতার্থ করবার জন্য বা খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কৃষিশিক্ষা দান করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাতেও বঙ্গবাসীকে পারদর্শী করে তুলতে লাগলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন বঙ্গদেশের মাটি অত্যন্ত কৃষি-উপযোগী। কৃষিকার্যে সফল হলেই নিশ্চিন্তে জীবনজীবিকা নির্বাহ করা যাবে। তাঁর এই প্রচেষ্টা জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর রাঘবের মধ্যে দারুণভাবে কার্যকর হয়েছিল। বীর রাঘব যেন বেদগর্ভের স্বপ্ন ও সাধনার সফল দৃষ্টান্ত। বেদগর্ভের বারোটি পুত্রসন্তান। রাজা আদিশূর তাঁদের প্রত্যেককেই বঙ্গদেশের মধ্যে বারোটি গ্রাম জায়গির দিলেন।

২য় পুরুষ রাঘব বেদগর্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তিনি বর্ধমান প্রদেশ বা অঞ্চলের (বর্তমান কাটোয়া মহকুমার নিকটে) অজয় নদ এবং গঙ্গানদীর অববাহিকায় "গঙ্গগ্রাম" নামক গ্রামে বসবাস করবার জন্য বঙ্গাধিপতি আদিশূর কর্তৃক জায়গির পান। রাঘব পিতার মতো সংস্কৃত সাহিত্যে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একজন যশস্বী অধ্যাপকও ছিলেন। কৃষিকার্যেও তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। সেজন্য রাজা তাঁকে "হল" (লাঙ্গল) উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। রাঘব যুদ্ধবিদ্যাতেও পারঙ্গম ছিলেন। "বীর

রাঘব" নামে তিনি ইতিহাসে পরিচিত। বীর রাঘব রাজা আদিশূরের ব্রাহ্মণ সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ বা সেনাপতি ছিলেন। সেজন্য তিনি সর্বদা সশস্ত্র থাকতেন।

আরও একটা কথা—তিনি গঙ্গগ্রামে বসবাস করতেন বলে গ্রাম বা গাঁঞির নামানুসারে তিনি 'গঙ্গোপাধ্যায়' পদবি গ্রহণ করেন। কান্যকুব্জ বা কনৌজ ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেকেই বেদ ও বেদান্তের অধ্যপনা করতেন বলে তাঁরা 'উপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা পরিচিত হতেন। এই সূত্র ধরেই রাঘব গঙ্গগ্রামের সহিত উপাধ্যায় যোগ করে (গঙ্গ + উপাধ্যায়) 'গঙ্গোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা নিজেদের পরিচয় প্রদান করতেন লাগলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বেদগর্ভের বংশধরগণ গঙ্গানদীর অববাহিকায় বাস করতেন বলে রাজনির্দেশে "গঙ্গোপাধ্যায়" পদবি দ্বারা পরিচিত হন। পরে "গঙ্গোপাধ্যায়" ক্রমশ অপভ্রংশ হয়ে "গাঙ্গুলী" পদবি দ্বারা পরিচিত হতে থাকে।

যাহোক, অপর চার কনৌজ ব্রাহ্মণের বংশধরগণও বসবাসের প্রধান গ্রাম বা গাঁঞির নামের সহিত 'উপাধ্যায়' যুক্ত করে মুখোপাধ্যায় (ভরদ্বাজ গোত্রীয়), চট্টোপাধ্যায় (কাশ্যপ গোত্রীয়) এবং বন্দ্যোপাধ্যায় (শাণ্ডিল্য গোত্রীয়) পদবি দ্বারা পরিচিত হতে লাগলেন।

বীর রাঘব রাঢ়ীশ্রেণি ব্রাহ্মণগণের জন্য ধর্মীয় এবং সামাজিক আচরণবিধির প্রবর্তন করে গেছলেন। যাজকগোষ্ঠীর জন্যও তিনি যথারীতি অনুষ্ঠানবিধি প্রকরণ করে একটি নতুন পথ নির্ণয় করে গেছেন। আজও সেই পথ ধরেই রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করছেন।

বর্তমানে দেখা যায় বাৎস্য এবং সাবর্ণ গোত্রের প্রবর এক হওয়ায় (১নং তালিকায় উল্লেখ আছে) বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের অনেকে "গঙ্গোপাধ্যায়" বা "গাঙ্গুলী" পদবি ব্যবহার করছেন। অবশ্য পরে পরে সমস্ত গোত্রের ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন কারণে 'চক্রবর্তী', 'ভট্টাচার্য' প্রভৃতি পদবি গ্রহণ করতে শুরু করেন।

বেদগর্ভের আরেক পুত্রের পরিচয় আমরা পাই। তাঁর নাম বশিষ্ঠ সিদ্ধল। অবশিষ্ট দশটি পুত্রের আজও সঠিক তথ্য বা কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

২য় পুরুষ বশিষ্ঠ সিদ্ধল ছিলেন বীর রাঘবের অপর ভাই। তিনি বয়সে বীর রাঘবের ছোটো ছিলেন। তিনি বেদসম্মত শিক্ষাদানে এবং সংস্কৃত বিদ্যা ও অধ্যাপনায় সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে বশিষ্ঠ সিদ্ধল নামের যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বংশে স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষতা লাভ করতেও দেখা যায়।

বশিষ্ঠ সিদ্ধলের পুত্র ওড়িশায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি বংশ-

পরম্পরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। সিদ্ধলের বংশধরগণ জ্ঞানবিদ্যার সহিত অর্থকরী বিদ্যায় ক্রমশ পারদর্শী হতে থাকেন। এর ফলে তাঁরা পরিবারের আর্থিক উন্নতি সাধনে সফল হন। কিন্তু তাঁদের ঐশ্বর্য-সম্পত্তি ভোগবিলাসে ব্যয়িত হত না। তাঁদের ঐশ্বর্য ব্যয়িত হত দানধ্যানে, দেবসেবায়, সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে এবং জনসেবার কার্যে।

২য় পুরুষ বীর রাঘবের বংশধরগণ পাণ্ডিত্যে, সামরিক যোগ্যতায়, কৃষিকার্যে সফল হয়েছিলেন এবং প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অপরপক্ষে তাঁর ভাই বশিষ্ঠ সিদ্ধলের (২য় পুরুষ) বংশধরগণ ঐশ্বর্যে, দানশীলতায় দেবভক্তিতে স্বনামধন্য হয়েছিলেন।

তাঁর বংশধরগণ স্থাপত্যবিদ্যারও চর্চা করতেন। **বশিষ্ঠ সিদ্ধলের অধস্তন ৭ম পুরুষ অর্থাৎ বেদগর্ভের অধস্তন ৮ম পুরুষ ভবদেব বলবল্লভ ভুজঙ্গ** [বশিষ্ঠ সিদ্ধল ⟶ ভবদেব ⟶ বুদ্ধ ⟶ স্ফুরিত ⟶ আদিদেব ⟶ গোবর্ধন ⟶ ভবদেব বল বল্লভ ভুজঙ্গ] পুরী জেলায় ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মূর্তি এবং তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সঙ্গে একটি পুষ্করিণী খনন করে জনসাধারণের জলপানের জন্য উৎসর্গ করেন। পূর্বে এই ঘটনা সাবর্ণ বংশের মধ্যে জনশ্রুতি ছিল। কিন্তু বাংলার ছোটো লাট স্যার জন উডবার্ণের সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মন্দিরের পাদদেশের এক শিলালিপি থেকে এই জীবন্ত সত্য প্রকাশিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা যায় ১১৮০ খ্রিস্টাব্দে বশিষ্ঠ সিদ্ধলের অধস্তন ৭ম পুরুষ ভবদেব বলবল্লভ ভুজঙ্গ কর্তৃক ওই মূর্তি এবং মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য একটি প্রস্তর ফলকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের আচরণবিধি ও পৌরোহিত্য কর্মের প্রাথমিক রীতিও উল্লেখ করা আছে। বাসুদেব মন্দিরের পবিত্রতা এবং স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন এখনও সারা ভারতের মানুষকে আকৃষ্ট করে।

২য় পুরুষ বীর রাঘবের পর তাঁর বংশে কয়েক পুরুষ [গুনাই ⟶ হরি ⟶ সুবিক্রম ⟶ বিশাই ⟶ বলাই ⟶ হেরম্ব] সাধারণ নিয়মে পূর্বপুরুষের নীতি ও বিধি অনুসরণ করে জীবনযাপন করেন।

নীহাররঞ্জন রায়ের গবেষণায় জানা যায়,—আদি ভট্ট এবং ভবদেব ভট্ট সাবর্ণ পরিবারের বংশধর। ভবদেব ভট্ট গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলে তাঁকে জ্যোতিষ ফলসংহিতায় দ্বিতীয় বরাহ বলা হয়। কুমারিল ভট্টকে অনুসরণ করে ভবদেব এক হাজার ন্যায় মীমাংসা সংবলিত "তৌতলিক মততিলক" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া ভবদেব ভট্ট শাস্ত্রগ্রন্থ এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন।

আমাটি (< আমাটিয়া)

একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেদগর্ভের বংশধরগণ বর্ধমান জেলার ইন্দ্রানী পরগনার নিকটবর্তী আমাটিতে (আমাটিয়া) এসে বসবাস শুরু করেন।

৯ম পুরুষ শৌরী সম্ভবত ১০৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গঙ্গগ্রাম থেকে আমাটিতে আসেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় এ-সময় সমাজে এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি হল।

মূল পাঁচ গোত্রের ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন কারণে ক্রমশ মূল পদবি ত্যাগ করে অন্য পদবি গ্রহণ করে বঙ্গ তথা বঙ্গের বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। তখন গোত্র এবং প্রবর (১নং তালিকায় উল্লেখ আছে) দ্বারা সেই সব ব্রাহ্মণগণের শাখা বা বংশধারা চিহ্নিত হতে লাগল। ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বগোত্র স্বপ্রবরে বিবাহবিধি নেই। ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের পুত্র-কন্যার বিবাহের ব্যাপারে তাঁরা অপর চার গোত্রের ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহ দেওয়ার সুযোগ পেতেন। কিন্তু প্রবর এক হওয়ায় সাবর্ণ ও বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্রে অপর তিন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্ধান করতে হত। ব্রাহ্মণ্যধর্মে এই বিধি বা নিয়ম কোনো গোঁড়ামি নয়। এর পেছনে রক্তের শুদ্ধতা রক্ষা করার ধর্মীয় নির্দেশ ছিল। বর্তমানে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে বিজ্ঞানের EUGENICS শাখার গবেষণায়। সাবর্ণ গোত্রীয় বংশের বৃদ্ধি অধিক হওয়ায় প্রায় দুশো বছর পরে বল্লাল সেনের আমলে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়ার সমস্যা তাঁদের মধ্যে অধিক প্রকট হল।

১০ম পুরুষ পীতাম্বর (শৌরীর পুত্র) সৎ, বুদ্ধিমান এবং সামাজিক বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'গঙ্গোপাধ্যায়' পদবি ব্যবহার করতেন। বৈদিক অনুষ্ঠানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করি যে সমাজে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন বা চাহিদা থাকায় ব্রাহ্মণ বংশধরগণ বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে বাসস্থান পরিবর্তন করতেন। তা ছাড়া বংশবৃদ্ধিও অন্যতম কারণ ছিল।

পীতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের সমসামাজিক **দামোদর গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত বেদগর্ভের অধস্তন ১০ম পুরুষ ছিলেন**। তিনি হুগলি জেলার ত্রিবেণীর নিকট বেগাই (বাগাই) গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বংশধরগণের এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১১শ পুরুষ কুলপতি গঙ্গোপাধ্যায় ১১৮২ খ্রিস্টাব্দের সমসাময়িককালে আমাটিতে বসবাস করতেন। তিনি পীতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। কুলপতি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চতুষ্পাঠীর খ্যাতি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি কুলীন শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলংকৃত করেন। তাঁর সামাজিক খ্যাতি ছিল প্রশংসনীয়।

১২শ পুরুষ শিশুপতি গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কুলপতির যোগ্য সন্তান। পাণ্ডিত্যে তিনিও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও খ্যাতিও ছিল। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেজন্য রাজা বল্লাল সেন তাঁকে 'কুলীন শ্রেষ্ঠত্বের' সম্মানও প্রদান করেন। রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক তিনি ''কালীক্ষেত্র'' অঞ্চল রাজদান হিসেবে লাভ করেন। এই ''কালীক্ষেত্র'' অঞ্চল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে উত্তরে বর্তমানের আড়িয়াদহ (আর্যদ্বীপ) থেকে দক্ষিণে বেহালা (বহুলাপুরী) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন কালীক্ষেত্রে কালীঘাটের কালীমাতা পূজিত হতেন। সুতরাং দেখা যায় কালীঘাটের কালীমাতার প্রাধান্য বেশি ছিল। ওই সময়ে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী কর্তৃক কালীঘাটের কালীমাতাসহ দক্ষিণেশ্বর থেকে বড়িশা পর্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের দু'-যোজন অর্থাৎ প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ এলাকা ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই সাবর্ণ বংশের অধিকারে এসেছিল।

আদিশূরের কাল থেকে প্রায় দুশো বছর কেটে গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন বাংলার অধীশ্বর। তিনি সুপণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ''দানসাগর'' বল্লাল সেন কর্তৃক রচিত।

বল্লাল সেনের আমলে ভাগীরথীর পূর্ব তীরের সমতট অনেক উচ্চতা লাভ করেছে। সমুদ্রও সুন্দরবনের দিকে অনেক সরে গেছে। সমতটে বসতি ও কৃষিকার্য শুরু হয়েছে। দলে দলে মানুষ এসে জনপদ গড়ে তুলছেন। ব্রাহ্মণগণও ক্রমশ দক্ষিণবঙ্গমুখী হতে লাগলেন। এসব অঞ্চলে তখনও সঠিক সমাজ গড়ে উঠেনি। সমাজ গড়ার জন্য প্রয়োজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের। আর সেই সমাজ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন কায়স্থদের। এই সময় হিন্দুধর্ম একটি সনাতন ধর্মরূপে পরিচিত হতে শুরু করে। এতদিন হিন্দুধর্ম কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্মরূপে গণ্য হয়েছে।

সমাজের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিষ্ঠায়, পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে ভাটা পড়তে লাগল। ব্রাহ্মণের কুলীনত্বের অবক্ষয় শুরু হল।

তখন বল্লাল সেন কুলীন বিচারের নয়টি গুণ নির্ণয় করলেন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানম্ নবধা কুললক্ষণম্।।

বঙ্গদেশে হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য বল্লাল সেন উচ্চবর্ণের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কুলীন প্রথার প্রবর্তন করেন। সেজন্য তাঁদের উক্ত নয়টি গুণের অধিকারী হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু আচরণে, বিনয়ে, বিদ্যায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, তীর্থদর্শনের অভিজ্ঞতায় জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান, নিজবৃত্তিতে পারদর্শী, উপাসনায় এবং দানে সক্ষম—এই নয়টি লক্ষণ বা গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ খুব কমই সমাজে পরিলক্ষিত হতে লাগল।

বল্লাল সেন 'কুলীন' আখ্যাটি সর্বকালীন করেননি। নয়টি লক্ষণ বা গুণের কোনো একটির অভাব পরিলক্ষিত হলে কুলীনচ্যুতি ঘটত। সেজন্য তিনি পাঁচ কখনও বা সাত বছর অন্তর কুলীনদের গুণবিচার করতেন। এই নিয়মে কেউ নতুন কুলীন হতেন। আবার কেউ কুলীনত্ব হারাতেন। বল্লালসেন এই পদ্ধতিকে 'সমীকরণ' বলতেন। কিন্তু সমাজে এই নিয়মকে 'বল্লাল সেনী নীতি' বলা হত।

আমাটির সাবর্ণগোত্রীয় গঙ্গোপাধ্যায়গণ বল্লাল সেনের এই সমীকরণে কয়েক পুরুষ পর-পর উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আমাটির গঙ্গোপাধ্যায় বংশের চতুষ্পাঠীর খ্যাতিও অম্লান ছিল।

এই কৌলীন্য রীতির প্রভাব তখন সমাজে বিবাহাদির মাধ্যমে আত্মীয়তা স্থাপনের ক্ষেত্রে বিস্তার করেনি। পরে কৌলিণ্য গর্বের বিষয় হওয়ায় কুলীনে-কুলীনে বিবাহ রীতি প্রচলিত হয়। অবশ্য এটা বল্লাল সেনের অভিপ্রায় ছিল না। তিনি সমাজে উপযুক্ত অর্থাৎ গুণী ও যোগ্য ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের কথা ভেবেছিলেন মাত্র। যাতে হিন্দুধর্ম সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে সমাজকে সবল, সুন্দর এবং স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে।

বল্লাল সেনের সময়ে ব্রাহ্মণগণ নিজ গুণ জাহির করতে বা আত্মপ্রশংসা করতে রাজদরবারে স্বয়ং উপস্থিত হতেন না। পরম্পরায় গুণ বিচার করেই কৌলীন্য প্রদান করা হত। কিন্তু পরে ব্যবস্থাটি জটিল হয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণগণের লক্ষণ বা গুণের আখ্যা প্রদানের জন্য কুলাচার্য বা ঘটকশ্রেণির উদ্ভব হয়। তাঁরা রাজসমীপে ব্রাহ্মণগণের গুণ ব্যাখ্যা করতেন। রাজা তাদের কথা শুনেই কুলীন বাছাই করতেন। কথায় আছে—'রাজা কর্ণেন পশ্যতি'— রাজা কানে দেখেন।

সেনবংশের রাজত্বকালে কুলীনত্ব প্রাপ্তি যে কেবল সম্মান ছিল তা নয়, আর্থিক বৃত্তিলাভেরও একটি প্রকৃষ্ট পথ ছিল। ফলে অনেক ব্রাহ্মণ উৎকোচ প্রদান করে কুলাচার্য বা ঘটকগণকে বশীভূত করতে লাগলেন। সেজন্য বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনের আমলে 'কৌলিন্য সমীকরণ নীতি' ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল।

আমাটির ১৪শ পুরুষ হলধর গঙ্গোপাধ্যায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সমাজে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি ধরে রাখার জন্য 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'কবিরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ পরিহার করে কেবল তার অর্থের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যকর্ম নির্বাহ করতেন বলে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। হলধর গঙ্গোপাধ্যায় কৃষিবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজ গ্রাম ব্যতীত আশপাশের কয়েকটি গ্রামও দানস্বরূপ লাভ করেন। ফলে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তুর্কি আক্রমণের পরেও তিনি সগৌরবে অবস্থান করেন।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী নেতা বখ্‌তিয়ার বাংলায় অভিযান শুরু করেন। তুর্কী অভিযানের প্রথম আঘাতটা বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলল। বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ

অধিকৃত হল। বাংলার রাজলক্ষ্মী যেন অন্তর্হিত হলেন। সারস্বত ব্রাহ্মণ এবং সাধকগণ অনেকে নিরাশ্রয় হয়ে পুঁথিপত্র সঙ্গে নিয়ে বিদেশে পলায়ন করলেন। দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠিত হল। পুঁথিপত্র অনেকাংশে বিনষ্ট হল। হিন্দুমন্দির, বৌদ্ধমঠ সমানভাবে বিধ্বস্ত হল। দেশের ধর্ম ও সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের কয়েকটা মূল্যবান পৃষ্ঠা যেন ছিঁড়ে গেল।

এই বিপর্যয়ের মধ্যেও সাবর্ণ বংশধরগণ কোনোক্রমে স্বমহিমায় এবং পাণ্ডিত্যে টিকে রইলেন। কিন্তু কুলাচার্য বা ঘটকফুলকে উৎকোচ দিয়ে কৌলিন্য রক্ষায় বিরোধী ছিলেন বলে অনেক সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের কৌলিন্য চ্যুতি ঘটল।

১৫শ এবং ১৬শ পুরুষ যথাক্রমে আয়ুরাম এবং বিনায়ক পূর্বপুরুষের বৃত্তি, সম্মান এবং কৃষ্টিকে মূলধন করে আমাটির বসতবাটিতে জীবন যাপন করতে লাগলেন। বলাবাহুল্য, তাঁদের চতুষ্পাঠী বা টোল কিন্তু নিরন্তর বিদ্যাদানকার্যে ব্যাপৃত ছিল।

বল্লাল সেনের 'সমীকরণ' পদ্ধতির মাধ্যমে সমগ্র বঙ্গদেশে মাত্র উনিশটি পরিবারকে কৌলীন্যের নয়টি গুণের অধিকারী হিসেবে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। বঙ্গেশ্বর তাঁদের মুখ্য কুলীন আখ্যা দিয়েছিলেন। আমাটির গঙ্গোপাধ্যায় বংশ বরাবরই মুখ্য কুলীন ছিলেন।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে সামসুদ্দিন ইলিয়াস বাংলার স্বাধীন সুলতান হলেন। বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে সমাজ ও ধর্ম তার পুরাতন ধারা বা স্রোত ফিরে পেল। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ বাংলার পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের মতোই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাংলার সাহিত্য ও ধর্মচর্চায় তাঁদের অবদান হয়তো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশ এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী সেনবংশের নৃপতিগণের চেয়ে কয়েক ক্ষেত্রে অধিক ছিল।

বেদগর্ভের অধস্তন **১৭শ পুরুষ শিব গঙ্গোপাধ্যায়** আমাটির সাবর্ণ বংশে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি "জীব- বা জীও" নামেই পরিচিত ছিলেন। তুর্কি আক্রমণের পর মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি কুতুবউদ্দিন বঙ্গদেশে রাজ্যবিস্তার শুরু করেন। তারপর বখ্‌তিয়ার খিলজি প্রভৃতি শাসকগণের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে বঙ্গবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হলে পড়ে। সে সময় সারা বাংলায় অন্ধকার যুগ নেমে আসে। একথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। সেই অন্ধকার যুগের অবসান ঘুচিয়ে জ্ঞান ও শিক্ষার আলোক বর্তিকার মতো উদয় হন শিবজীব। শুধু সাবর্ণ পরিবারে নয়—সারা বাংলায় সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ও প্রতিপত্তির নতুন উৎস মুখ তিনি রচনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে "ব্যাস" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। কারণ তিনি রাজকীয় পরিবেশে ব্যাসদেবের মতো মর্যাদা আনয়ন করতে সমর্থ হন। তিনি একাধারে সুবক্তা, সুলেখক এবং মহাজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন।

১৮শ পুরুষ পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর যোগ্য পুত্র। তিনিও স্বনামধন্য

পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'পুরারি' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। পরমেশ্বর বা পুরারি গঙ্গোপাধ্যায় সুলতান আলাউদ্দিন হুসেনের আমলে সর্বপ্রথম বাংলায় মহাভারত রচনা করেন। গ্রন্থটি তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল। তবে এতদিন পরে সুলতানি আমলের অপছায়া তাঁর পরিবারে ধীরে ধীরে নেমে আসে। সামাজিক পরিবর্তনের নতুন ধাক্কা তাঁর পরিবারেও প্রতিফলিত হল। সুলতানি শাসনের অপকীর্তির শিকার হতে লাগল ব্রাহ্মণ সমাজও। গ্রাম্য সমাজের মানুষজনকে দুভাগে ভাগ করা হল—জমির মালিক আর রায়ত। এই শতাব্দীতে মুসলমান শাসকগণ হিন্দুসমাজ নিয়ে উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। তাঁরা কেবল কর, শুল্ক, রাজস্ব .... ইত্যাদির বিষয়ে অধিক তৎপর ছিলেন। সামন্ত রাজা, জমিদার, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি জমির মালিকদের ওপর কর বা রাজস্ব ধার্য করে তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনকে তাঁরা বিপর্যস্ত করতে লাগলেন। সুলতানগণ নিজ-নিজ প্রভুত্বটি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলবৎ করতে লাগলেন। সমাজ ও ধর্মের বিবাদে তাঁরা উদাসীন রইলেন। সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাদ ফয়শালার ভার ধীরে ধীরে সমাজের মানুষের হাতে এসে পড়ল। ফলে সমাজে আইনশৃঙ্খলার অভাব দেখা গেল। নিষ্কর দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমি-জায়গার ওপর কর ধার্য হওয়ায় ব্রাহ্মণ পরিবারগণ বড়ো বিপদে পড়লেন। কর বা রাজস্ব আদায় না হলে সে জমি নিলাম হয়ে যেতে লাগল।

এসব কারণে পরমেশ্বর চতুষ্পাঠী চালানো দুরূহ মনে করলেন। জমি-জায়গার কর ধার্য হয়েছে। আমাটির পরিবেশে জীবনচর্চাকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ফলে আমাটির গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার বৃত্তি পরিবর্তনের কথা ভাবতে লাগলেন। জীবিকার সন্ধানে ব্রাহ্মণগণ বাসস্থান ত্যাগ করে পরিব্রাজকের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় চতুষ্পাঠী নিয়ে কষ্ট স্বীকার করে আমাটিতেই থাকলেন। তবে তাঁর ভাই **মুরারি (১৮শ পুরুষ)** পূর্ববঙ্গে জীবিকার সন্ধানে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে বিবাহ করে স্থিতি হন।

মুরারির অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ বেদগর্ভের অধস্তন ২৪তম পুরুষ রাঘব ঢাকা বিক্রমপুরের নিকট বেগে গ্রামে বিবাহ করে সেখানে বসবাস করেন। তাঁর পরিবার **বেগের গাঙ্গুলী** বংশ বলে ইতিহাসে পরিচিত। তবে রাঘব সম্ভ্রান্ত বটব্যাল পরিবারের ঘরজামাই ছিলেন।

সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রাহ্মণগণের বসবাস কী বিচিত্র হয়ে পড়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ রাঘবের পৌত্র হরিহর গাঙ্গুলী পূর্ববঙ্গ থেকে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হন।

২৬তম পুরুষ হরিহর গাঙ্গুলী কলিকাতার বড়বাজারে বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। **তাঁর অপর ভাই (বা পুত্র?) জনাই-এর** গাঙ্গুলী পরিবারের প্রথম পুরুষ।

প্রশাসনিক এবং সামাজিক পট পরিবর্তন

সুলতানী আমলে হিন্দুগণের আধিপত্য ক্রমে ক্রমে অনেকটাই হ্রাস পেতে লাগল। সামাজিক, ধর্মীয় এবং আচার-আচরণ বিষয়ে তাঁদের আর এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। অথচ হিন্দুরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণগণ কেবল ধর্ম, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেননি—তাঁরা সমাজের শিরোমণিও ছিলেন। তাঁদের কথাই ছিল সমাজের শেষ কথা। কিন্তু দীর্ঘ মুসলমান শাসনে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অনেকাংশে খর্ব হল। হিন্দুরাজাগণ ধর্ম, সমাজ আর শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য চিন্তা করেছেন এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁদের চিন্তার সঙ্গে হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের মানুষজন, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণ সর্বদাই সহায়তা করে এসেছেন। হিন্দুরাজাদের নিকট তাঁদের মতামতের মূল্য ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দুরাজারা ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূমি দান করেছেন। এই নিষ্কর ভূমি ছিল—'ব্রহ্মোত্তর'। মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং দেবদেবীর পুজার্চনার ব্যয় নির্বাহ করার জন্যও তাঁরা নিষ্কর জমি প্রদান করেছেন। সেইসব জমিকে 'দেবোত্তর জমি' বলা হয়। এ ধরনের জমিগুলি মূলত ছিল 'রায়ত' শ্রেণিভুক্ত। বলাবাহুল্য, ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তর নিষ্কর জমি কেবল ব্রাহ্মণগণই পেয়েছেন। তখন এক-এক অঞ্চলে যেসব ছোটো-ছোটো জমিদারের আবির্ভাব ঘটেছিল—তাঁরা মূলত উচ্চবর্ণের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

শিক্ষার জন্য যেসব অধ্যাপক ব্রাহ্মণ চতুষ্পাঠী চালাতেন তাঁদের ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণকে হিন্দুরাজারা জমি বা গ্রাম দান করতেন। এইসব ভূমি বা গ্রামকে তালুক (Estate) বলা হত। এই তালুক অল্প কর বা বিনা করে অধ্যাপকগণকে দান করা হত। ছাত্রসংখ্যা এবং অধ্যাপকের যোগ্যতার বিচারে একাধিক গ্রামও দান করা হত।

এইসব ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, তালুক প্রভৃতি পরিভাষার জমির মালিক ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণগণ। ফলে দেখা যায়, গ্রামের জমি-জায়গার মালিকানা বেশিরভাগই থাকত ব্রাহ্মণগণের দখলে। গ্রাম্য সমাজে জমি-জায়গার দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ ছিল দু-প্রকার—জমির মালিক আর রায়ত। প্রাপ্ত জমিগুলিকে 'রায়ত' বলা হত। রায়তদের মধ্যে জমি-জায়গার বিবাদ প্রায় দেখা যেত না। বিবাদ হত জমির মূল মালিকের সঙ্গে অন্য মালিকের। না হয়—জমিদারে জমিদারে অথবা রাজায়-রাজায়।

উচ্চবর্ণের মানুষের অধিকার মূলত রায়ত বা দেবদত্ত হিসেবে সাব্যস্ত হত। উচ্চবর্ণের মানুষের অর্থসংগতি তখন অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল।

রাজ্যে রাজার পরিবর্তন ঘটলে সমাজে সাময়িক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হলেও তা ক্ষতিকর ছিল না। তবে হিন্দুরাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটলে হিন্দুপ্রধান গ্রাম্য সমাজে একটা নতুন ধাক্কা আসত।

মুসলমান শাসকগণের আমলে হিন্দুসমাজের স্থিতি বা উন্নতি বা অবনতি বিষয়ে শাসকগণ উদাসীন থাকায় হিন্দুসমাজের বাঁধন আলগা হতে লাগল। তা ছাড়া মুসলমান শাসকগণ গ্রামগঞ্জের মানুষের ওপর নানারকম কব বা শুল্ক আরোপ করে রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে বেশি তৎপর হয়ে উঠতেন। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর—এমনকি সামন্তরাজা, জমিদার কাউকে রেহাই দিতেন না। তাঁদের শাসনের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক বুনেদ শক্ত করা বা বৃদ্ধি করা। ফলে গ্রামে-গঞ্জে সামাজিক, বৈষয়িক, ধর্মীয় বাদ-বিবাদ বেশ প্রকট রূপ ধারণ করতে লাগল। জাতপাতের সমস্যাও নিকৃষ্ট রূপ গ্রহণ করল। সামন্তরাজ ও জমিদারগণের মধ্যেও দখলদারি অথবা প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য কাজিয়া বেঁধে যেত। প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বিস্তারের তাগিদে সমাজে লাঠিয়াল 'পোষার' আগ্রহ শুরু হল। এই সময় থেকেই ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের বা বর্ণের মানুষের ক্রমশ আধিপত্য ঘটে। তাদের হাতে সমাজ, জমি-জায়গা এবং রাজ্যের শাসনভার চলে যেতে শুরু হয়। "জোর যার মুলুক তার"—প্রবাদ বচনের সূত্রপাত এই সময় থেকেই ঘটে। দেশে চোর-ডাকাত, রাহাজানি দিনে দিনে বেড়ে চলে। কিন্তু নবাবগণ এসব ব্যাপারে উদাসীন, তাঁদের আগ্রহ কেবল কর বা রাজস্ব আদায় করা।

১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত পনেরো জন সুলতানি শাসক প্রায় দেড়শো বছর গৌড়ীয় বাংলায় লুটতরাজ চালালেন। বৌদ্ধ ধার্মিকগণ বাংলা ছেড়ে চলে গেলেন। হিন্দুধর্ম দিশেহারা হয়ে পড়ল। ধর্ম, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতির সে এক অন্ধকার যুগ। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে ফক্রুদ্দিন দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন অধিপতি বলে ঘোষণা করলেন। তারপর আরও পাঁচজন মুসলমান নবাব বাংলায় রাজত্ব করলেন। মাঝে সাত বছরের জন্য রাজা গণেশ নামক এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করেন। অবশেষে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ সুলতান দায়ুদ খাঁ বাংলার রাজত্ব হারান। দীর্ঘ ১২০৩ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পৌনে চারশো বছর বাংলায় মুসলমানি শাসন ছিল। তাঁরা লুটতরাজ, রাজস্ব আদায় ব্যতীত হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

ক্রমশ বাংলার ব্রাহ্মণগণের জীবনজীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ল। ফলে অনেকেই বাসস্থান ত্যাগ করে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সাবর্ণ বংশধরগণও এর ব্যতিক্রম নন।

হালিশহর (হাভেলিশহর)

পূর্বে উল্লেখ করেছি ব্রাহ্মণগণ জীবিকার প্রয়োজনে এবং কতকটা সমতটের নতুন মানববসতির আকর্ষণে তাঁরা ধীরে ধীরে দক্ষিণ বঙ্গাভিমুখী হতে লাগলেন। বর্ধমানের আমাটির বসবাস ত্যাগ করে সাবর্ণগোত্রীয় কিছু বংশধর বর্তমান হুগলি জেলার ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে গোহট্ট (বর্তমানে গোপালপুর) গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন।

সাবর্ণগোত্রীয় ওইসব ব্রাহ্মণের মধ্যে কবি পরমেশ্বর (পুরারি) গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগ্য পুত্র **১৯তম পুরুষ পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সময়টা খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিক। পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় অন্যান্য ব্রাহ্মণ সন্তানের মতো আমাটি থেকে হুগলি জেলার ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে গোহট্ট গোপালপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। সে সময় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে শের (শাহ্) খাঁর যুদ্ধ শুরু হয়। পঞ্চানন মুঘলসৈন্যের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে শের খাঁকে পরাজিত করেন। এতে মুঘল সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে পঞ্চাননকে 'শক্তি খাঁন' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন এবং একটি মানপত্র প্রদান করেন। এরপর পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় 'পাঁচু শক্তি খান' নামে বিশেষ পরিচিত হন।

বেদগর্ভের পুত্র বীর রাঘবের (২য় পুরুষ) মতো পাঁচু শক্তি খান রাজদরবারে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সাবর্ণ বংশের রণকুশলতার দ্বিতীয় পরিচয় দিলেন।

পাঁচু শক্তি খান মুঘল সম্রাট কর্তৃক হাভেলি পরগনা জায়গির পান। ইতিপূর্বে সাবর্ণ বংশধরগণ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অথবা পূর্ববঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কেউ বসতি স্থাপন করেননি। সেনাবাহিনীর কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর 'পাঁচু শক্তি খান' ভাগীরথীর পূর্ব তীরে হাভেলি শহর পরগনায় (বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত) নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে হাভেলি সমাজ বা হাভেলি শহর গড়ে তোলেন। এইভাবে এখানে তৎকালীন কোনা সমাজের পরিবর্তে কুমারহট্ট হালিশহর (< হাভেলিশহর) সমাজ গড়ে উঠতে শুরু হয়। পাঁচু শক্তি খানই প্রথম সাবর্ণ বংশধর যিনি ভাগীরথীর পূর্ব তীরে একটি 'সমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন ভাগীরথীর পূর্বকূল অনেকটা উর্বর সমতটে পরিণত হয়েছে। সুন্দর নদীবিধৌত প্লাবন ভূমি অঞ্চল। ফলে এই অঞ্চলের প্রতি পাঁচু শক্তি খানের আকৃষ্ট হওয়ার এটাও একটা কারণ ছিল।

[Ref : Panchanan Ganguly, a resident of Amati who had migrated to Go-ghat (Go-hatta-Gopalpur) in the district of Hooghly and later

served as a soldier in the imperial army of Humayun and beeing awarded the title of Sakti Khan for his valour and prowess in the field of battle, founded a samaj at Halisahar on his retirement from the army.

–'Laksmikanta'–by A K. Ray.]

সেনাবিভাগ থেকে অবসর নেওয়ার পর পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাব, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য প্রভৃতির ঘাটতি ছিল না। সবচেয়ে বড়ো সম্বল তাঁর দৃঢ় মনোবল এবং সুদক্ষ পরিচালন প্রতিভা।

পাঁচু শক্তি খান ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলের গোহট্ট গোপালপুর থেকে বসবাস পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে চলে আসেন ভাগীরথীর পূর্বতীরের হাভেলি শহরে।

এই হাভেলি শহরে মুঘল হাবিলদারদের শিবির ছিল। আর ছিল কর বা রাজস্ব আদায়ের জন্য গোমস্তা-সেরেস্তাদারদের আবাসগৃহ—যাকে বলা হত 'হাভেলি'। সেজন্য লোকে তখন এই অঞ্চলকে 'হাভেলি শহর' বলত। তা ছাড়া 'হাভেলি' শব্দের অর্থ অট্টালিকা বা প্রাসাদ। ওই সময় এখানে বহু অট্টালিকা ছিল। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত এই হাভেলি শহর। 'হাভেলি শহর' কথা থেকেই 'হালিশহর' কথাটির উৎপত্তি।

পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় (পাঁচু শক্তি খান) সেনাপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন। তা ছাড়া মুঘল শাসক এবং সেনাপতিগণের সহায়তাও ছিল তাঁর প্রভূত ভরসা। সেকারণে তিনি হাভেলি শহরে নতুন করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ পত্তন করার বিশেষ প্রয়াসী হলেন। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর থেকে বৈদ্য আনলেন। তাদের একদল হাভেলি শহরের নিকট বসবাস শুরু করলেন। বৈদ্যদের অপর একটি বড়ো দল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে হুগলি জেলায় পল্লি গঠন করলেন। বর্তমানে ওই পল্লির নাম 'বৈদ্যবাটি'। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের কোন্নগর থেকে কায়স্থ পরিবার এনে তাদের বসতি দান করলেন। ওড়িশা এবং দক্ষিণ ভারত থেকে যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ এনে তাদের চতুষ্পাঠী স্থাপন করার জন্য ভট্টপল্লিতে জমি ও বসতি দান করলেন। বর্তমানে ওই ভট্টপল্লি 'ভাটপাড়া' নামে খ্যাত। হাভেলি শহরেও প্রচুর চতুষ্পাঠীর পত্তন হল। টোলে টোলে বহু কুমারবয়েসি ছাত্রদের সমাগম ঘটল। যেন হাভেলি শহরে কুমারদের হাট বসে গেছে। এরূপ কল্পনা থেকে হাভেলি শহরকে চতুষ্পাঠীর ভাষায় 'কুমারহট্ট' বলা হত। তখন কুমারদের বেদ অধ্যয়নের শোরগোলে চতুষ্পাঠী অঞ্চল এবং ভট্টপল্লি শোরগোলে মুখর হয়ে থাকত। সেজন্য 'কুমারহট্ট হাভেলিশহর' বা 'কুমারহট্ট হালিশহর' নামে এই অঞ্চলের পরিচিতি ছিল। বর্তমানে 'কুমার হট্ট' নাম প্রায় মুছে গেছে। এমনকি 'হাভেলিশহর' নামের পরিবর্তন হয়ে 'হালিশহর' নামে প্রচলিত হয়েছে।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পারদর্শী শিল্পী এনে পাঁচু শক্তি খান হাভেলি পরগনার এক-এক গ্রামে তাদের শিল্পানুসারে বিভাজন করে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। কারুশিল্পীদের মধ্যে কুম্ভকারগণ মৃৎশিল্পে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিলেন। কুম্ভকারদের 'কুমার বা কুমোর' বলা হয়। সেকারণে তাদের পল্লির নাম 'কুমারহট্ট' নামকরণের অন্যতম কারণ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে।

কেবল কুম্ভকার নয় স্বর্ণশিল্পীদেরও বসতি দান করা হয়েছিল। তাদের বসতির নাম ছিল 'কাঞ্চন পল্লি'। বর্তমানে কাঞ্চন পল্লির নাম 'কাঁচড়াপাড়া'। এখানে এখন পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপ গড়ে উঠেছে।

শিল্পীদের বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী বিক্রি করার জন্য একটি নতুন হাট বসানোরও ব্যবস্থা করা হল। সেই স্থানটির নাম হয় 'নবহট্ট'। বর্তমানে নবহট্ট গ্রাম 'নৈহাটি' নামে পরিচিত।

এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাঁচু শক্তি খানের স্বপ্নের হাভেলি শহর নতুনরূপে গড়ে উঠল। হাভেলি শহরের উন্নতির কারণেই পরবর্তীকালে বিদেশি বণিকগণ ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে হুগলি জেলার চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, ব্যান্ডেল প্রভৃতি স্থানে কুঠিবাড়ি নির্মাণ করেন।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ড দেশীয় (Dutch) বিখ্যাত পরিব্রাজক ফানডেন ব্রুক (ওদের ভাষায় 'V'-এর উচ্চারণ 'ফ'-এর মাতো) (Van-dcn-Broucke) হাভেলি শহরকে ভাগীরথী নদীর পূর্ব উপকূলে সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে যে ভাগীরথীর পশ্চিমপারের হুগলি শহরের প্রায় দু-মাইল উত্তর এবং পূর্বপারের কুমারহট্ট বরাবর হাভেলি শহর তখন দক্ষিণবঙ্গের একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগররূপে দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তীকালে কলিকাতা নগরের যে শ্রীবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি ঘটেছিল তার প্রথম রূপ হাভেলিতেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। সুতরাং সাবর্ণ বংশধরগণ যখন যেখানে পদার্পণ করেছেন সেখানেই সৃষ্টি আর শ্রীবৃদ্ধির নিদর্শন রেখে গেছেন। পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় অর্থাৎ পাঁচু শক্তি খান সেইসব সৃজনশীল সাবর্ণ বংশধরগণের মধ্যে অন্যতম।

হাভেলি শহরের কালিকাতলা ঘাট থেকে অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলার ভূষণা পর্যন্ত যাতায়াতের সড়ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানে এই সড়ক নিশ্চিহ্ন। হাভেলি শহর অর্থাৎ হালিশহর কালিকাতলার কালীমন্দির আজও অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। সেই নামানুসারে রয়েছে কালিকাতলা বাজার ও কালিকাতলা পুলিশ ফাঁড়ি।

শিল্প, বাণিজ্য ব্যতীত শিক্ষা তথা সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে হালিশহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য আসন গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রগণ অধ্যয়নের নিমিত্ত এখানে আসতেন এবং এখানের অধ্যাপকগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পাঠচর্চা করতেন। বৈষ্ণব

সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এখানে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী (ঈশ্বরচন্দ্র আচার্য) নামক মহাপণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পাঠচর্চা করেন। সংক্ষেপে বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কালে নবদ্বীপের উত্থান ঘটার পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে কুমার হট্ট হালিশহর ছিল অতি উল্লেখযোগ্য স্থান।

'আইন-ই-আকবরি'তে সরকার সাতগাঁর (সপ্তগ্রাম) অন্তর্ভুক্ত পরগণাসমূহের মধ্যে হাভেলি শহরের নাম উল্লেখ আছে।

কথিত আছে পাঁচু শক্তি খানের সাতটি পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই হালিশহরে বসবাস করতেন।

তবে সাত পুত্রের মধ্যে **২০তম পুরুষ শম্ভুপতি গঙ্গোপাধ্যায়** বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তিনি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শম্ভুপতি জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

২১তম পুরুষ জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় শম্ভুপতির অন্যতম পুত্র। জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় (১৫৩৫/৪৮--১৬২০) অতি অল্পবয়স থেকেই মহাপণ্ডিত রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৫৩৫ বা ৪৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার গোহট্ট-গোপালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শিক্ষালাভের বয়সকালে তিনি হালিশহরে আসেন। তিনি হালিশহরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতেন। কৃতধী জীয়া একজন প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিতরূপে অচিরে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং চেষ্টায় তখন বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন কবিতার দুটি পংক্তি সবার মুখে শোনা যেত—

'কাম-কমল-গঙ্গেশ
তিন নিয়ে বঙ্গদেশ।'

জীয়ার অপর নাম কামদেব। তাঁর সাধনোত্তর নাম কামদেব ব্রহ্মচারী। পণ্ডিত জীয়া 'বিদ্যা বাচস্পতি' উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন। আইন-ই-আকবরিতে উল্লেখ আছে জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় সুদক্ষ অশ্বারোহীও ছিলেন।

অল্পবয়সে জীয়ার বিবাহ হয়। স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তিনি অতি সুন্দরী রমণী ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন কৌলীন্য বিচারে পদ্মাবতী মুখ্য কুলীন বংশের কন্যা ছিলেন না। সেজন্য ওই সময়ের প্রভাবশালী কুলাচার্য বা ঘটক দেবীবর বিদ্যাবাচস্পতি জীয়াকে কুলীনচ্যুত করেন। এতে জীয়া দমেননি। অবশ্য ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিদ্যা এবং সাধনশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। এইসব সম্পদ তাঁর নিকট মোটেই তুচ্ছ নয়।

উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত পদ্মাবতী কোনো সন্তানের জননী না হওয়ায় জীয়া এবং পদ্মাবতী উভয়েই সন্তানলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তখন কালীক্ষেত্র কালীঘাটে গঙ্গাতীরে কালীমূর্তি এবং নকুলেশ্বর ভৈরবের অনতিদূরে পর্ণকুটির তৈরি করে স্বামী-

স্ত্রী বসবাস করতে থাকেন। কালীঘাটের দেবীর মাহাত্ম্য তখন বিশেষভাবে সর্বত্র প্রচারিত। এস্থান তখন জঙ্গলাকীর্ণ, জলাভূমি। কালীঘাটের কালীমাতা হালিশহরের গঙ্গোপাধ্যায় বংশের কুলদেবতা। তা ছাড়া জীয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের ইষ্টদেবী। প্রধান পুরোহিত হিসেবে তখন নিযুক্ত ছিলেন আত্মারাম। তাঁর শিষ্য অন্নদাগিরিও তাঁর সঙ্গে মন্দিরে থাকতেন। তখন কালীমাতার মন্দির বলতে ছিল একটি সাধারণ দেবগৃহ।

জীয়া শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ এবং মহাপণ্ডিত। ইতিপূর্বে তিনি কিছুটা সাধনশক্তি অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি সাধনায় মহাতান্ত্রিক হয়ে উঠলেন। জীয়া ও পদ্মাবতী উভয়ে কালীমাতার নিকট মানত করে একনিষ্ঠ চিত্তে অনশনব্রত অবলম্বন করে 'হত্যা' দিয়ে পড়লেন। তৃতীয় দিনের পর শেষ রাত্রে পদ্মাবতী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। জেগে উঠে দেখলেন কালীকুণ্ডের পূর্বদিকে একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। তিনি স্বামীকেও দেখালেন। তিনি স্বামীকে বললেন যে স্বপ্নে মা-কালী তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছেন যে তিনি কালীকুণ্ডে স্নান করলে পুত্রসন্তান লাভ করবেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে যখন সূর্য পূর্বদিগন্তে ব্রহ্মরূপ ধারণ করেছেন—সেই সময় পদ্মাবতী-কালীকুণ্ডে স্নান করে দেখলেন—কুণ্ডের একটি নির্দিষ্ট স্থানে দেবীর দক্ষিণ হস্ত জলের ওপরে প্রতীয়মান হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতী দৈববাণী শ্রবণ করলেন—ওইখানে সতীর দক্ষিণ পদের অংশ নিমজ্জিত আছে। পদ্মাবতী যেন পুরোহিতগণকে সেই দেহাংশ জলতল থেকে তুলে আনতে বলেন।

[Ref : Padmabati, renowned alike for her beauty and charity, disappointed her relatives in that no child was born to her even though she was nineteen years of age. So they prevailed upon her to accompany her husband to Kalighat and there to prostrate herself before her family deity, the Goddess Kali, in penance and prayer for three days and three nights and invoke her blessing for the birth of a son. In the night of the third day she saw a halo of light on the surface of the tank, east of Kali's temple, and drew her husband's attention to it. She told him that she had dreamt that she would become the mother of a son, if she bathed in the tank. Next day when she went to bathe there, she saw the right arm of Sati above the surface of the water and heard a voice to say that the sebayats of the goddess would recover the relic of the right foot of Sati at the bottom of the tank. ['Laksmikanta'–by A. K. Ray]

পদ্মাবতী ও জীয়ার অনুরোধে সেবায়েতগণ কালীকুণ্ডের সেই নির্দিষ্ট জলতল থেকে সতীর দক্ষিণ পদের চারটি আঙুল সংবলিত একখণ্ড প্রস্তর তুলে আনলেন। সতীর দেহাংশ লাভ করে সেবায়েত তন্ত্রাচার্য আত্মারাম এবং তাঁর শিষ্য আনন্দগিরি মহানন্দে "মা মা" রবে নৃত্য শুরু করলেন। এতদিনে তাঁরা বুঝতে পারলেন—কেন দেবীর এত মাহাত্ম্য। কেন দেবী তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিদান করেন।

সামনের স্নানযাত্রার পূর্ণিমা তিথিতে দুই সন্ন্যাসী ভক্তিসহকারে যথাবিধি পূজা করে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সতীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি চারটি প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বপ্নাদেশ মতো অঙ্গুলি চারটিকে (মতান্তরে কেবল কনিষ্ঠ অঙ্গুলি) কালীমাতার বেদির অগ্নিকোণে গর্ভগৃহে স্থাপন করলেন। এখনও তা রুপোর বাক্সে কালীঘাটে রক্ষিত আছে।

কালীক্ষেত্রের কালীর কৃপালাভ করে জীয়া দম্পতি হালিশহর ফিরে এলেন। পদ্মাবতী প্রকৃতই সন্তানসম্ভবা হলেন। সন্তান প্রসবের দিনমাস আসন্ন হলে জীয়া দম্পতি পুনরায় কালীঘাটে এসে বসবাস শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় আত্মারাম ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কামদেব ব্রহ্মচারী নাম গ্রহণ করেছেন। একদিন তিনি একটি অলৌকিক স্বপ্নদর্শন করে কালীঘাটের কালীর অবস্থান কালীকুণ্ডের অপরদিকে আদিগঙ্গার নিকট স্থানান্তরিত করেন।

পদ্মাবতী পুত্রলাভ করবার পূর্বে কালীক্ষেত্রের কালীদেবীর ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে পরবর্তী অংশে কিছু আলোচনা করে নেওয়া উচিত মনে করছি।

সতীপীঠ কালীঘাট

কালীঘাট যে কালীক্ষেত্র তা আমরা ১২শ পুরুষ শিশু গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমাটির মহাপণ্ডিত শিশু গঙ্গোপাধ্যায়কে সেনবংশীয় রাজা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত উত্তরে (দক্ষিণেশ্বর) আর্য দ্বীপ থেকে দক্ষিণে বহুলাপুরী (বেহালা) পর্যন্ত "কালীক্ষেত্র" অঞ্চল দান করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যায়, অনেক পূর্বেই কালীক্ষেত্ররূপে কালীঘাটের খ্যাতি ছিল। আর কালীঘাটের কালীমাতার সাবর্ণবংশের আরাধ্য দেবী ছিলেন। আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীঘাট তখন ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলের মধ্যেই ছিল জাগ্রত কালীক্ষেত্র।

প্রাচীন কালীঘাটের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে 'পীঠমালা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

"দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী,
ধনুকাকার ক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয়সংখ্যকং।
তস্মাৎ ত্রিকোণাকারঃ ক্রোশমাত্রব্যবস্থিত,
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকারো ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকং,
মধ্যে চ কালিকাদেবী মহাকালী প্রকীর্তিতা।
ভৈরবনকুলেশ্বরো যত্র গঙ্গা বিরাজিতা,
ততঃ ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং দেবানামপি দুর্লভং।
কালীক্ষেত্রে কাশীক্ষেত্রে অতোদোঽপি,
কীটোঽপি মরণে মুক্তঃ কিং পুনঃ মহেশ্বর মানবাদয়ঃ।
ভৈরবী বগলা বিদ্যা মাতঙ্গী কমলা তথা,
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডী চাষ্টশক্তিঃ বসেৎ যদা।"

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দক্ষিণেশ্বর থেকে বহুলাপুরী অর্থাৎ বেহালা পর্যন্ত ধনুকাকার দু-যোজন অর্থাৎ (২×৪) ক্রোশব্যাপী এলাকাই কালীক্ষেত্র। এর মধ্যে এক ক্রোশ পরিমিত ত্রিকোণাকার ক্ষেত্রের মধ্যে কালিকাদেবী বিরাজমানা। এই ত্রিকোণাকার ক্ষেত্রের এক কোণে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, আর-এক কোণে বিষ্ণু এবং অন্য কোণে শিব অবস্থান করছেন। মধ্যস্থলে মহাকালীর বেদী। নকুলেশ্বর ভৈরব এবং গঙ্গা এক্ষেত্রে পাশাপাশি থাকার কারণে এই ক্ষেত্র মহাপুণ্য স্থান বা মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। কাশীক্ষেত্র আর এই কালীক্ষেত্রের মধ্যে প্রভেদ নেই। এই মহাপুণ্যস্থানে ভৈরবী, বগলা, বিদ্যা, মাতঙ্গী, কমলা,

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, চণ্ডী এই অষ্ট শক্তি বিরাজমানা। সেজন্য এই ক্ষেত্রে মানব কেন কীটপতঙ্গ মরলেও মুক্ত হবে। এই কালীক্ষেত্র কালীঘাটের মাহাত্ম্যই এমন।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে গুপ্তরাজাদের আমলেই কালীঘাট পুণ্যস্থান রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। কালীঘাটের মাটির নীচে গুপ্তযুগের মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

আবার "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে" কালীঘাট সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"চলিল দক্ষিণদেশে
বালি ছাড়া অবশেষে।
উপনীত যথা কালীঘাট
দেখেন অপূর্ব স্থান
পূজা হল বলিদান।
দ্বিজগণ করে চণ্ডীপাঠ।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে "চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের" 'বণিক খণ্ডে' ও কালীঘাটের বর্ণনা প্রসঙ্গে কালীঘাটকে পুণ্যস্থান বলে উল্লেখ করেছেন।

আরও অতীতে আমরা যদি যাই তাহলে দেখতে পাব খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি রচিত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনায় বর্তমান কালীঘাট অঞ্চলকে "কালীগ্রাম" নামক এক জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আনুমানিক দু-হাজার বৎসর পূর্বের "ভবিষ্যপুরাণেও" গোবিন্দপুর গ্রামের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে কালিকাদেবীর অবস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে।

"তাম্রলিপ্তে প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুরপ্রান্তে চ কালী সুরধনী তটে।"

মগধ এবং বঙ্গদেশের বৌদ্ধরাজাদের রাজত্বকালে বণিকগণ জলপথকেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির কাজে ব্যবহার করতেন। কারণ বঙ্গদেশ ছিল নদীমাতৃক ভূমি। ভাগীরথীতে বর্তমানে জাহাজ চলছে। তখন পাল তুলে বড়ো বড়ো বাণিজ্যতরী ছুটত পার্শ্ববর্তী দ্বীপ ও দেশে ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্যে। কালীক্ষেত্রের পাশ দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গার বুকে এইসব বাণিজ্যতরী, বজরা ভেসে যেত। কারণ তখন এই আদিগঙ্গাই বিভিন্ন ঘাট ও বন্দরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জয়নগর-মজিলপুরের পথ ধরে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছিল। হিন্দু বণিক ব্যবসায়ীগণ বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে গিয়ে পৌঁছোত সিংহল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে। চলত তাদের বাণিজ্য। বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার সময় বণিকগণ গঙ্গাতীরে যেসব দেবদেবীর মন্দির দেখতেন সেখানে ব্যাবসার উন্নতি আর পথের নিরাপত্তার কামনায় পূজা দিতেন।

আদিগঙ্গার তীরে কালীপীঠের দক্ষিণা কালীর পূজা দিতে বণিকগণ, মাঝিমল্লারগণ

কখনোই ভুলতেন না। যাতায়াতের সময়ে তাঁরা অবশ্যই দেবী দর্শন করতেন। অন্তরের কামনা দেবীর নিকট নিবেদন করতেন।

দক্ষিণাকালীর এই ঘাটটি ছিল তখন জঙ্গলে ঢাকা। জঙ্গলাকীর্ণ দেবীর এই ঘাটের নাম ছিল 'কালীদেবীর ঘাট'—'কালীর ঘাট'। বর্তমানে আমরা স্থানটিকে 'কালীঘাট' নামে চিনি।

এই 'কালীরঘাটের' দক্ষিণাকালী দেবীই একান্ন সতীপীঠের একচল্লিশতম পীঠস্থান। তখন পর্ণকুটিরে ভীষণা দর্শনা করাল মূর্তি লোলজিহ্বা দক্ষিণাকালীর পূজারী ছিলেন কয়েকজন তান্ত্রিক সাধু। আশপাশে তখনও তেমন লোকবসতি গড়ে ওঠেনি।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ব্রহ্মানন্দগিরি নামক একজন তান্ত্রিক তপস্বী দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতে একটি প্রস্তরখণ্ড দেখেন। তিনি সেই প্রস্তরখণ্ডটিকে দক্ষিণাকালীর প্রতিভূ বিশেষ জ্ঞানে পূজা-অর্চনা করতে থাকেন। এমন সময় সুতানুটির পাশে 'ছোটো নগর' গ্রামের অধিবাসী আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামের আরেক তপস্বী নীলগিরি পর্বতের সেই নির্জন সাধন স্থানে উপনীত হন। আত্মারাম ব্রহ্মচারী প্রস্তরখণ্ডটিকে কালীক্ষেত্র কালীঘাটের দক্ষিণাকালীর পর্ণকুটিরে আনবার প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে ব্রহ্মানন্দ এবং আত্মারাম উভয় সাধক প্রস্তরখণ্ডটিকে জলপথে কালীক্ষেত্রে আনেন। তারপর প্রস্তরখণ্ডের ওপর দক্ষিণাকালীর মুখমণ্ডল নিজেদের ধ্যান-জ্ঞান অনুসারে খোদাই করে কালীক্ষেত্রের পর্ণকুটিরের মধ্যে ব্রহ্মাদেবীর ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে দেবীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধাতু দ্বারা নির্মিত হয়। বর্তমানে দেবীর চারটি হাত সোনার তৈরি। জিহ্বাটিও সোনার। গলায় একশো আটটি সোনার মুণ্ডমালা শোভা পাচ্ছে।

কালীক্ষেত্রের এই শক্তিপীঠের অন্তরালে কেবল ইতিহাস কেন—পৌরাণিক কাহিনিও আছে। এখন সংক্ষেপে সেই পৌরাণিক কাহিনিটির উল্লেখ করছি।

পুরাণের দক্ষযজ্ঞ কাহিনি প্রায় সকল হিন্দুই কমবেশি জানেন। পড়া না থাকলেও উৎসব-অনুষ্ঠানে যাত্রা-পালাগানে "দক্ষযজ্ঞ" পালা অনেকেই দেখেছেন। 'দক্ষযজ্ঞ' উপাখ্যানটি কেবল একটি কাহিনি বা বিবরণ নয়,—এটি একটি নীতি উপদেশ এবং ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গও বটে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সমস্ত ধর্মীয় উপাখ্যানের অন্তরালে একটি সর্বকালীন সনাতন এবং অবশ্যপালনীয় নীতি-উপদেশ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে।

দক্ষযজ্ঞের এই উপাখ্যান একদিকে পাতিব্রত্যের চরম স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত উপাখ্যান—অপরদিকে এতে দম্ভ, ক্রোধ প্রতিহিংসার চরম নিপাতের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

পুরুষ আর প্রকৃতি সৃষ্টিতত্ত্বের একটি নিরবিচ্ছিন্ন যুগল। এই যুগলমিলন ঘটেছিল দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে প্রকৃতির প্রথম শক্তি সতীর। মহাদেব সর্বশক্তিমান হয়েও

নিরহংকার, আত্মভোলা, উদাসীন ছিলেন। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, ভস্মমাখা শরীর। সাপ তাঁর আভরণ। তিনি শ্মশানে, পাহাড়-পর্বতে নিরালায় ভ্রমণ করেন। জটাজটধারী সিদ্ধিখোর দেবতা। জটার মধ্যে গঙ্গাদেবী আবদ্ধা। এহেন মহাদেব সতীকে পত্নীর মর্যাদা বা তাঁর শরীরে অলংকার কিছুই দিতেন না। পতিব্রতা সতী স্বামীর ইচ্ছানুসারেই জীবনযাপন করতেন। অথচ তিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা—অর্থাৎ রাজকন্যা। প্রজাপতি দক্ষ সমগ্র পৃথিবীকে বশীভূত করবার জন্য এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। স্বর্গের সমস্ত দেবতাই আমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু বাদ পড়লেন দেবাদিদেব মহাদেব। ভাঙড়ভোলা, নিঃস্ব, নিরাভরণ জামাতাকে রাজা দক্ষ উপেক্ষা করতেন। তাই তাঁকে আমন্ত্রণ জানাননি। কিন্তু সতী পিতা দক্ষের এই মহাযজ্ঞে বিনা আমন্ত্রণেই গেলেন। জননীর কাছে দুঃখের সহিত সতী অভিযোগ জানালেন। বললেন—তাঁর স্বামী মহাদেবকে আমন্ত্রণ না জানানোর জন্য তিনি দুঃখিত এবং অপমানিত বোধ করছেন। উত্তরে মাতা মহাদেবের বাউণ্ডুলে চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করলেন। এই মহাযজ্ঞে, মহা সমাবেশে শিবের মতো দরিদ্র, উদাসীন উলঙ্গপ্রায় দেবতা বড়োই অশোভন। পিতাও মাতার মতো উপেক্ষা প্রদর্শন করলেন। সতী এইসব পতি নিন্দা উপেক্ষা করতে পারলেন না। শিবহীন যজ্ঞবাসরেই তাঁর আত্মা দেহবিমুক্ত হল। সতী প্রাণত্যাগ করলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের কানে এই অপমানজনক ঘটনার কথা পৌঁছোল। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করায় মহাদেব উন্মাদপ্রায় হয়ে যজ্ঞবাসরে ছুটলেন। সঙ্গে নন্দি, ভৃঙ্গি, ভূত-প্রেত প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গ। মহাদেব সতীর আত্মাবিমুক্ত দেহ স্কন্ধে তুলে নিয়ে মহারোষে প্রলয় নৃত্য শুরু করলেন। সৃষ্টি বিধ্বংসী তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে তখন পৃথিবী টলমল করছে। আর এদিকে মহাদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ দক্ষের যজ্ঞ লন্ডভন্ড করে দিল। যজ্ঞ সমাপ্ত হল না। যজ্ঞবাসরে আমন্ত্রিত দেবতাগণ প্রাণভয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগলেন। তাঁরা পরিত্রাণের জন্য উপস্থিত হলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিকট। ব্রহ্মা দেবতাগণকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁদের রক্ষা করার জন্য বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। একমাত্র বিষ্ণুই পারেন মহাদেবের এই ক্রোধবহ্নির উপশম করতে। বিষ্ণু সমস্ত অবগত হয়ে উপলব্ধি করলেন যে যতক্ষণ সতীর আত্মাবিমুক্ত দেহ মহাদেবের স্কন্ধে শায়িত থাকবে ততক্ষণ মহাপ্রেমিক মহাদেবের ক্রোধবহ্নি নির্বাপিত হবে না। তখন বিষ্ণু তাঁর মহা শক্তিশালী সুদর্শন চক্র হস্তে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্যরত মহাদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে অন্তরীক্ষে গমন করে সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করতে লাগলেন। দক্ষের রাজধানী কন্‌খল্ থেকে পূবের অবিভক্ত ভারতবর্ষের পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্য অংশে সতীঅঙ্গের খণ্ডিত একান্নটি অংশ ছড়িয়ে পড়ল। সেই একান্নটি স্থান শক্তিপীঠ বা সতীপীঠ নামে খ্যাত হল। এই সতীপীঠগুলি হিন্দুগণের মহাতীর্থস্থান।

কালীক্ষেত্র কালীঘাট সতীর দক্ষিণ পদের চারটি খণ্ডিত আঙুল পড়েছিল। তাই একান্নটি সতীপীঠ বা শক্তিপীঠের মধ্যে কালীঘাট একচল্লিশতম সতীপীঠ।

সতীর দক্ষিণপদের প্রস্তরাকৃতি চারটি আঙুল কীভাবে কালীঘাটের কালীকুণ্ডে পাওয়া গিয়েছিল পূর্ববর্তী অংশে তা উল্লেখ করেছি।

এখানে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করতে পারেন,—আঙুল প্রস্তরাকৃতি হল কেন? তাঁদের বলি—মহাশূন্যের উল্কাপাতের অগ্নি মর্তের মাটিতে প্রস্তরীভূতই হয়। তা ছাড়া, ধর্মীয় তথ্য এবং তত্ত্ব সব ধর্মের ধার্মিক বা ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ নির্বিচারেই স্বীকার করে নেন। আর তা স্বীকার করে নেন বলেই ধর্মকথা এবং ধর্মপ্রবর্তকগণের ব্যাখ্যা আজও অম্লান এবং সত্য বলে পরিগণিত হচ্ছে।

তবে আরও একটা কথা বলা যায়, দাম্ভিক রাজা দক্ষের রাজত্ব মহাদেবের পরাক্রমে হয়তো একান্নটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। তবে এটি রূপকধর্মীয় কাহিনি বলেই আমাদের মেনে নিতে হবে।

কালীক্ষেত্র কালীঘাটের কালীমাতা ব্যতীত তখন বর্তমান চিৎপুর অঞ্চলে চিত্ত বা চিতে ডাকাতের একটি দেবীমন্দির ছিল। ওই ডাকাত দেবীর পূজা করে ডাকাতি করতে যেত। ওই দেবীর সম্মুখে নরবলিও দেওয়া হত। ওই ডাকাতের নাম অনুসারে দেবীর নাম "চিত্তেশ্বরী দেবী"। তখন চিৎপুর গভীর জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল। দেবীর মন্দিরের নিকট থেকে একটি সংকীর্ণ কাঁচাপথ কালীঘাটের মন্দির পর্যন্ত ছিল। তখন ওই পথকে "তীর্থযাত্রার পথ" বলা হত। পূর্বের সেই সংকীর্ণপথ গোবিন্দপুর ক্রীক বা খাল পর্যন্ত গিয়ে খাল পেরিয়ে খালের অপর পার থেকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওই পথ দক্ষিণে আরও গোবিন্দপুর কালীক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়েছিল। অর্থাৎ পূর্বের সেই পথ উত্তরে চিৎপুর রোড থেকে দক্ষিণে ভবানীপুরের ওপর দিয়ে কালীঘাটে এসে মিশেছিল।

চিৎপুরের ওই চিত্তেশ্বরী দেবীকে বহুদিন লোকে কালীমূর্তি বলেই জানতেন। কিন্তু বর্তমানে গবেষক রাধারমণ রায় এই দেবীমূর্তিকে দেবী দুর্গার মূর্তি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এই দেবী "চিতে ডাকাতের দুর্গাদেবী"—কালীদেবী নয়।

পরে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার কলিকাতার জমিদারি লাভ করলে এই ডাকাতে দুর্গাদেবীর মন্দির সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গে আসছি।

ব্রহ্মানন্দগিরি এবং আত্মারাম ব্রহ্মচারী মহামূল্যবান কষ্টিপাথরে দক্ষিণাকালী মাতার রূপদান করেছিলেন। ওই শিলার মধ্যেই দেবী-কালিকা আবদ্ধা আছেন। উচ্চমার্গের দুই তপস্বী—আত্মারাম ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মানন্দগিরি মানসচক্ষে ত্রিনয়নী মাতার মূর্তি ধ্যানে-

জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করেন। দেবী কালিকার নিত্য পূজা-অর্চনা করে চলেছেন। এরপর সতীর প্রস্তরীভূত পদাঙ্গুলি কালীকুণ্ডের জলতলে কীভাবে পাওয়া গেল তা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

কালীঘাট পুণ্য পীঠস্থানরূপে আত্মপ্রকাশের মূলে রয়েছেন মহাতপস্বী দুই সাধক আত্মারাম ব্রহ্মচারী আর ব্রহ্মানন্দ গিরি। আর রয়েছেন কামদেব এবং পদ্মাবতীর সাধনা ও স্বপ্নাদেশ। সেই সঙ্গে ক্ষণজন্মা পুরুষ রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীর জন্মরহস্য।

আত্মারাম ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মানন্দগিরি উভয়ের তিরোধান ঘটলে পরবর্তী সন্ন্যাসীরাই মন্দিরের পূজাপাঠ এবং পরিচালনা করতেন। একসময় আনন্দগিরি নামক এক তপস্বী কালীঘাটের এই দেবীর মন্দিরে প্রধান মোহান্ত হন। তিনি দেহরক্ষা করবার পর তাঁর প্রধান শিষ্য ভুবনেশ্বরগিরি চল্লিশ বছর বয়সে কালীঘাটের মন্দিরের দায়িত্বলাভ করেন। ভুবনেশ্বরগিরি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে তিনি যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই কালীঘাট মন্দিরে সাধারণ মানুষের দেবীদর্শনের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। রাজা প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায় ভুবনেশ্বরগিরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শোনা যায়, এরপর বসন্ত রায় কালীমাতার জন্য একটি দেবগৃহ নির্মাণ করে দেন। সেই সময় তাঁর রাজধানী ছিল বেহালার নিকট সরশুনায়। সরশুনার দিঘি বসন্ত রায়ের নামানুসারে "রায়দিঘি" নামে পরিচিত।

একদিন এক গরিব বিধবা ব্রাহ্মণী মন্দিরে দেবীদর্শনে আসেন। সঙ্গে অষ্টাদশী অবিবাহিত কন্যা। নাম যোগমায়া। ভুবনেশ্বরগিরি এই কন্যার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভৈরবী রূপে গ্রহণ করলেন। তন্ত্রে ভৈরবী রাখার নির্দেশ আছে। কিছুদিন পরে যোগমায়া এক কন্যার জন্ম দিলেন। নবজাতা শিশুকন্যার নাম রাখলেন 'উমা'। দু-মাস পরে রক্তস্বল্পতা রোগে যোগমায়া মারা গেলেন। তখন এই শিশুকন্যা যোগমায়ার মাতার অর্থাৎ দিদিমার নিকট লালিত-পালিত হতে লাগল।

উমা যখন মাত্র দু-বছরের তখন তার দিদিমাও মারা গেলেন। ভুবনেশ্বরগিরির ব্যবস্থায় আশ্রমের হৈমবতী নাম্নী রমণীর নিকট উমা মানুষ হতে লাগল। উমা বিবাহযোগ্যা হলে ভুবনেশ্বরগিরি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে চিন্তিত হলেন।

একদিন ভুবনেশ্বরগিরি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অদ্ভুত দৈববাণী শ্রবণ করলেন—"বৎস ভুবনেশ্বর, এবার উমার বিয়ে দিয়ে আমার পূজার প্রচার কর। সন্ন্যাসীদের রেহাই দিয়ে সংসারীর হাতে আমায় তুলে দে।"

ভুবনেশ্বরগিরির ধ্যানভগ্ন হল। একি শুনলেন তিনি? দেবী কালিকার একি খেলা? কালীঘাটের কালীমাতার বিষয়ে এমন অনেক অদ্ভুত কথাকাহিনি, দৈববাণী প্রায়ই ঘটে চলেছে,—যার ব্যাখ্যা নেই।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার—সে সময় সুদূর যশোর জেলার খনিয়ান গ্রাম থেকে কাশ্যপ গোত্রীয় ভবানী দাস চক্রবর্তী পিতার সন্ধানে কালীঘাটে উপস্থিত হলেন। তাঁর পিতা পৃথ্বীধর (শ্রীনাথ নামে পরিচিত) হঠাৎ একদিন সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। পৃথ্বীধরের পিতা স্বর্গত চণ্ডীবর তপস্বী (চক্রবর্তী)। পৃথ্বীধর পিতার মতো কালীভক্ত। সেজন্য ভবানীদাস মনে করলেন তাঁর কালীভক্ত পিতা পৃথ্বীধর হয়তো কালীঘাটে অবস্থান করছেন। ভবানীদাস যশোরের খনিয়ান গ্রামে তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে রেখে এসেছেন। ভবানীদাস পিতার মতো শাক্ত নন,—বৈষ্ণব। তিনি নিরামিষাহারী। গৃহদেবতা বাসুদেবই তাঁর আরাধ্য দেবতা।

ভুবনেশ্বরগিরির অনুরোধে ভবানীদাস কালীঘাটে থেকে গেলেন। এবারেও কালীমাতার আর এক খেলা। দেবীর স্বপ্নাদেশে ভবানীদাস উমার পাণিগ্রহণ করেন। আর দেবীর পূর্বের নির্দেশমতো ভুবনেশ্বরগিরি বৈষ্ণব ভবানীদাসের ওপর দক্ষিণা কালিকার পূজা-আরতির ভার দিলেন।

এখান থেকেই শুরু হল গৃহীভক্তের হাতে কালীমাতার পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা। সন্ন্যাসী ভুবনেশ্বরগিরিই কালীঘাটের শেষ মোহান্ত। অতঃপর কালীমন্দিরের জন্য বহুকালের প্রচলিত শিষ্য বা চেলা রাখার বিধি উঠে গেল।

ভুবনেশ্বরগিরির গুরু আনন্দগিরির সময় থেকেই এখানে কাপালিক এবং অঘোরপন্থী বামাচারী যোগীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে এখানে তাঁরা ধর্মের নামে মাঝেমধ্যে নরবলিও দিতেন। গৃহী ভবানীদাস চক্রবর্তীর হাতে মন্দিরের দায়িত্ব চলে যাওয়ায় সেইসব যোগীগণ অসন্তুষ্ট হলেন। তবে ভুবনেশ্বরগিরির ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিপত্তির কারণে তাঁরা নীরবে সরে পড়লেন। কেউ কেউ মন্দিরের অদূরে কুঁড়ে তৈরি করে জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরী, কালভৈরব প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজাপাঠ করতে লাগলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পাললেন, ভুবনেশ্বরগিরির অবর্তমানে তাঁর জামাতা ভবানীদাস চক্রবর্তীই কালীমন্দিরের প্রধান কর্তা হবেন।

ভবানীদাস ভক্ত, নিষ্ঠাবান। তিনি বৈষ্ণব থেকে শাক্ত। শাক্ত মতে বিচরণ করতে শুরু করেছেন। মন-প্রাণ দিয়ে তাই কালীমাতার পূজার্চনা-আরতি করেন। স্বহস্তে দেবীর ভোগ রাঁধেন। ভক্ত জনসাধারণের সমাগম ক্রমশ বাড়তে লাগল। মন্দিরের অন্যান্য কাজকর্মও বাড়ছে বৈ কমছে না। এমন সময় ভবানীদাস একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। পুত্রের নাম রাখলেন রাঘবেন্দ্র। সংসারে উমারও কাজ বেড়ে গেল। এখন ভবানীদাস সব কাজ আর একা সামলাতে পারেন না। বাধ্য হয়ে ভবানীদাস সুদূর খনিয়ান গ্রামে গিয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আর দুই পুত্রকে নিয়ে কালীঘাটে ফিরে এলেন। খনিয়ানের বাস্তুদেবতা বাসুদেবকে প্রতিবেশীর দায়িত্বে রেখে এলেন। কিন্তু আবার বিপত্তি। ভবানীদাস

একদিন স্বপ্নে জানলেন,—বাসুদেবের ঠিকমতো সেবা-পূজা হচ্ছে না। ভবানীদাস ব্যথিত হলেন।

ভক্ত ভবানীদাস পুনরায় ছুটলেন সেই খনিয়ান গ্রামে। কুলদেবতা বাসুদেবকে বুকে করে নিয়ে এলেন কালীঘাটে। বাসুদেবের ঠাঁই হল দেবীর মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালের কুলুঙ্গিতে।

কালীমাতার নৈবেদ্যর পাশাপাশি বাসুদেবেরও নৈবেদ্য হতে লাগল। পূজা-অর্চনার ত্রুটি করছে না ভবানীদাস। অন্নভোগের ক্ষেত্রে কালীমাতার আমিষ ভোগ। আর দরিদ্র নারায়ণের জন্য যে নিরামিষ ভোগ রান্না হয় সেই নিরামিষ অন্নভোগ বাসুদেবকে পূর্বে নিবেদন করা হতে লাগল। এই প্রথা আজও কালীঘাট মন্দিরে প্রচলিত আছে।

আবার স্বপ্ন। ভবানীদাস একদিন মাঝরাতে স্বপ্ন দেখলেন,—মা-কালী বাসুদেবের কাছে বৈষ্ণবীর বেশে থাকতে চান। তিনি বাসুদেবের মতো তিলক সেবা করবেন। বিস্মিত ভবানীদাস জেগে উঠে সাশ্রুনয়নে কেবল মা-কালী আর বাসুদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন। শ্যাম আর শ্যামার অভিন্ন রূপ তিনি মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন।

ভোর হতেই কালীকুণ্ড সরোবরে স্নান সেরে তিনি ছুটলেন মন্দিরে। কী দেখলেন? মা-কালীর কপালে, নাকে চন্দনের তিলক,—রসকলি আঁকা। কে যেন মাকে তাড়াতাড়ি করে তিলক পরিয়েছে। কুলুঙ্গিতে বাসুদেবও চন্দনের তিলক পরেছেন। সিঁদুর মেখেছেন। মেঝেতে সিঁদুর আর চন্দন মাখামাখি। যেন কোনো শিশু সিঁদুর আর চন্দন নিয়ে খেলা করেছে। ভবানীদাস "মা মা" বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তারপর মায়ের কপালে, নাসিকায় স্বহস্তে সযত্নে শ্বেতচন্দনের রসকলি এঁকে দিলেন। মা-কালী বৈষ্ণবীর নতুন সাজে মহাখুশি। মন্দিরে শ্যাম-শ্যামার অলৌকিক অস্তিত্ব ভবানীদাস উপলব্ধি করলেন। সেই থেকেই কালীঘাটের কালীমাতার কপালে এবং নাসিকায় বৈষ্ণবী তিলক আঁকা হয়ে আসছে। কালীর কপালে বৈষ্ণবীর রসকলি আর কোথাও দেখা যায় না। ভক্ত ভবানীদাস তাঁর পুত্রগণ এবং বংশধরদের কালীর কপালে ও নাসিকায় বৈষ্ণবীর তিলক এঁকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছলেন।

বহু বছর পরে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে সাবর্ণ রায় চৌধুরীর ২৭তম বংশধর রামদুলাল মেদিনীপুর জেলায় জমিদারি পেয়ে বসবাস করার কালে সেখানে খেপুত গ্রামে গৃহদেবতা রঘুনাথ জীউর মন্দিরে কার্তিক মাসেব অমাবস্যায় ইষ্টদেবী দক্ষিণাকালীর পূজা প্রবর্তন করেন। তিনি কালীঘাটের কালীমাতার অনুকরণে দক্ষিণাকালীর কপালে এবং নাসিকায় রসকলি আঁকার প্রথাও চালু করেন। এছাড়া কালীমাতার বৈষ্ণবীরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সন্ধ্যায় কালীপূজার

দিন কালীঘাটে কালীমাতার পূজা হয় না। হয় দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা। বৎসরের অন্যান্য অমাবস্যায় কালীমাতার পূজা হয়। কিন্তু কার্তিক মাসের অমাবস্যা সবথেকে ঘন অন্ধকারময়। এই সময় সূর্যদেব পৃথিবীর সবথেকে নিকটে থাকেন। সেজন্য এই অমাবস্যাতেই সর্বত্র শ্যামা পূজা হয়। জীবনের অন্ধকার, দুঃখ, দরিদ্র দূর করেন শ্যামা মাতা। কিন্তু ভবানীদাস কার্তিক মাসের অমাবস্যায় প্রচলন করলেন শ্যামালক্ষ্মী পূজা। তবে এই লক্ষ্মীপূজার বিধি একটু পৃথক। কালীপূজার দিন সূর্যাস্তের সময় অমাবস্যা থাকা চাই। সন্ধ্যার চব্বিশ মিনিটের মধ্যে অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজা সম্পন্ন করতে হবে। যদি কোনো বছর অমাবস্যা সন্ধ্যার অনেক দেরিতে পড়ে তাহলে সেই অমাবস্যায় কালীপূজা হবে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজা হবে না। পরদিন সন্ধ্যায় অমাবস্যা থাকতে থাকতে লক্ষ্মীপূজায় বসতে হবে। এই লক্ষ্মীপূজার পূর্বে অলক্ষ্মী বিদায় করার নিয়ম আছে। গোবর আর আতপ চাল বাটা পিটুলি দ্বারা অলক্ষ্মীর পুতুল গড়া হয়। সেই পুতুলটি মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে সিঁড়ির নীচে রাখা থাকে। সন্ধ্যা হলেই কালীমাতার সেবায়েতগণ অলক্ষ্মীরূপী পুতুলটি নিয়ে পেঁকাঠি (পাটকাঠি) জ্বালিয়ে তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ করার সময় ঘনঘন ভাঙা কুলো বাজানো হয়।

ব্যক্তিগত পরিবারে এই লক্ষ্মীপূজার জন্য ঘটস্থাপন এবং লক্ষ্মী পাতার স্থানীয় নিয়ম-বিধি আছে। কিন্তু কালীঘাটের কালীমন্দিরে লক্ষ্মীপূজার জন্য ঘটস্থাপন হয় না। কালীমাতাকেই শ্যামালক্ষ্মী জ্ঞানে পূজা করা হয়। সন্ধ্যাবেলা অলক্ষ্মী বিদায়পর্ব শেষ করে সন্ধ্যাকালীন অমাবস্যা তিথিতে এই দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা হয়। পূর্ব থেকে কুলোয় আঠাশটি দীপ সাজিয়ে রাখা থাকে। তারপর পূজার সময় সেগুলি জ্বেলে মন্দিরের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়।

কালীমন্দিরে দক্ষিণাকালীসহ অন্যান্য দেবতাদের নিত্য পূজা যথারীতি এদিন হয়। কিন্তু সন্ধ্যায় দীপান্বিতা শ্যামালক্ষ্মী পূজার ক্ষেত্রে দিনটিকে পুণ্যময়, মঙ্গলময় এবং সৌভাগ্যময় করার জন্য স্বস্তিবাচন করা হয়। সংকল্পও করা হয়। শ্যামালক্ষ্মী পূজা নিত্যপূজা নয়। পূজা মূলত তিন প্রকার—নিত্যপূজা, কাম্যপূজা এবং নৈমিত্তিক পূজা। এই দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা বা শ্যামালক্ষ্মীপূজা কাম্যপূজা। ভক্তের সুখসমৃদ্ধি সৌভাগ্য শান্তি কামনা করেই এই পূজা। সেকারণে কোশাকুশি স্থাপনের ক্ষেত্রেও ভক্তি-কর্ম-জ্ঞান এই তিনের সমন্বয় কল্পনা করে কোশার নীচে ত্রিকোণ অঙ্কন করা হয় গঙ্গাজলের রেখা দিয়ে। এই ত্রিকোণকে বেষ্টন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকস্বরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কন করা হয়। তারপর এই বৃত্তকে ঘিরে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের দ্যোতক একটি চতুষ্কোণ অঙ্কন করা হয়। তারপর এই চতুষ্কোণের পূজা করে এই যন্ত্রের ওপর কোশাকুশি স্থাপন করা হয়।

এইদিন দক্ষিণাকালীকে লক্ষ্মীর ধ্যানে পূজা করা হয়।

"পাশাক্ষ মালিকাম্ভোজঃ শৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনাস্থাং ধায়েচ্চ শ্রিয়াং ত্রৈলোক্য মাতরম্ ....।"

মাতা পাশ-অক্ষ-মালিকা শোভিতা। তিনি পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা। তিনি ত্রিলোকের মাতা লক্ষ্মীদেবী ....।

কালীঘাটে এই দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজায় সাড়ে তিন ঘণ্টা মতো সময় লাগে। পূজার সময় কাঁসর-ঘণ্টা বাদ্য নিষেধ। এই পূজায় মায়ের জবাফুল নয়—চাঁপা এবং পদ্মফুলই প্রিয়। দক্ষিণাকালীর ভোগ নিবেদনের পর গর্ভগৃহের দ্বার কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। কিন্তু দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজায় ভোগ নিবেদন করে গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ করা হয় না।

দীপান্বিতা লক্ষ্মীর নৈবেদ্যে সমস্ত ফলমূল মিষ্টান্ন দেওয়ার বিধি আছে। কিন্তু ভোগে উচ্ছে বা করলা দেওয়ার বিধি নেই। ভোগ হবে নিরামিষ। তবে এই দিন কালীমাতার নিত্য পূজার ভোগ অবশ্যই আমিষ হয়। এমনকি দক্ষিণাকালীর ছাগবলি দেওয়ারও বিধি আছে। দীপান্বিতা লক্ষ্মীর ভোগ হয় পাঁচ কিলো চালের সাদা ভাত। পাঁচ কিলো চালের খিচুড়ি। পাঁচ কিলো দেরাদুন চালের ঘি-ভাত। পাঁচরকম ভাজা। ......অন্যান্য তরিতরকারি। কিসমিস বাতাসা দিয়ে পাঁচ কিলো দেরাদুন চালের পায়েস। এছাড়া রাজভোগ, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন উৎসর্গ করা হয়।

পূজা এবং অঞ্জলি পর্ব শেষ হলে ভোগ উৎসর্গ করা হয়। লক্ষ্মীর ভোগ উৎসর্গ করা হয় সম্পূর্ণ পৃথক মন্ত্রে। দক্ষিণাকালিকার মন্ত্রে নয়।

ভোগ উৎসর্গ করা হলে শেষ পর্বে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট ধরে আরতি হয়।

লক্ষ্মীর ভোগ উৎসর্গ করা হয়ে গেলে লক্ষ্মীকে পুনরায় পৃথক ভোগ উৎসর্গ করা হয় না। তবে বৈশিষ্ট্য হল,—দক্ষিণা কালিকায় প্রয়োজনবোধে আরতির পরেও বারবার ভোগ উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া দক্ষিণাকালিকার ভোগপ্রসাদ ভক্তসাধারণ চান বলে দক্ষিণাকালিকার ভোগের পরিমাণ প্রয়োজনমতো কমবেশিও হয়।

এইদিন ভক্তসাধারণ কালীঘাটের মন্দিরে একই মূর্তিতে কালী আর লক্ষ্মীর রূপ দর্শন করেন। ভাবানন্দে 'জয় মা কালী', 'জয় মা লক্ষ্মী' বলে শ্রীচরণে প্রণতি নিবেদন করেন। সেই সঙ্গে অনেকে প্রথম গৃহীসেবক ভবানীদাস চক্রবর্তীকেও স্মরণ করেন।

সাবর্ণ রায়চৌধুরীগণের আমল থেকে কালীঘাটের কালীমাতার সেবায়েত হয়েছেন হালদারগণ। 'সেবাভৃৎ' শব্দ থেকেই 'সেবায়েত' বা 'সেবাইত' কথাটি এসেছে। 'সেবাভৃৎ' শব্দের অর্থ সেবা করে ভরণপোষণ নির্বাহ করা। সুতরাং মায়ের সেবার মাধ্যমেই হালদারগণ নিজেদের ভরণপোষণ নির্বাহ করে আসছেন। কালীমাতার নিত্য পূজাকালে এখনও সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের নামে সংকল্প করা হয়।

"যতকালে কালীঘাটে কালিকার স্থিতি।
লক্ষ্মীনাথে কুলভঙ্গে সাবর্ণের মতি।।
লক্ষ্মীর আজ্ঞা সবে করে শিরে ধারণ।
যেথা মারণ উচাটন আর বশীকরণ।।
কালীঘাট কালী হল চৌধুরী সম্পত্তি।
হালদার পূজক—এই ত তার বৃত্তি।।"

[সম্বন্ধ নির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি]

কেশব রায় চৌধুরীর পুত্র ২৬তম পুরুষ সন্তোষ রায় চৌধুরী (শিবদেব) শেষ জীবনে কালীঘাটের কালীমাতার বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণকার্য শুরু করেন। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটলে তার উত্তরসূরি (ভ্রাতুষ্পুত্র) রাজীব লোচন রায় চৌধুরী ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। সেই সময় এই মন্দিরটি নির্মাণ করতে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। সাবর্ন রায় চৌধুরীরা বহু জমি দান করেছিলেন। এখন সেসব জমি অধিকাংশই বেহাত হয়ে গেছে। মাত্র ১৮ কাঠা জমি অবশিষ্ট আছে। কালীমাতার বর্তমান মন্দিরটি আট কাঠা জমির ওপর নির্মিত। এই মন্দিরের উচ্চতা ৯০ ফুট।

কালীঘাটের কালীমাতার প্রচুর অলংকারাদি তাঁর ভক্ত জনসাধারণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেসবের সিংহভাগের এখন আর হদিশ নেই। কলকাতার পাইকপাড়ার রাজা লালাবাবু মা-কালীর চারটি সোনার হাত তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক হাতে ১২০ ভরি সোনা ছিল। কোনো এক ভক্ত ১০৮ মন রুপোর একটি শিবমূর্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মায়ের সোনার মুকুট, মুক্তো বসানো সোনার নথ, ৫০ ভরির চারটি সোনার কঙ্কন, ১০টি সোনা বাঁধানো নোয়া ইত্যাদি কত অলংকার মায়ের ছিল। এছাড়া বছরের পর বছর ভক্তদের দেওয়া ছোটো-বড়ো কত অলংকার, বাসনপত্র কালীমন্দিরে এসে পৌঁছোয়। সে-সবের খোঁজ এখন আর পাওয়া যায় না। সেজন্য প্রহ্লাদ কুমার গোয়েঙ্কা নামক এক কালীভক্ত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে সি-বি-আই তদন্ত দাবি করেছেন।

কালীঘাটের মন্দিরের পরিচালনকার্যে বেশকিছু অব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে একদল সেবায়েত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণও চান এই অব্যবস্থার অবসান ঘটুক। এর জন্য তাঁদের

আবেদনক্রমে বিভিন্ন তদবিরের পর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট কালীঘাটের মন্দিরের দেখাশোনার জন্য তৎকালীন অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার জেলা জজ সাহেবের নেতৃত্বে মন্দির কমিটির মাধ্যমে মন্দিরের পরিচালন-ব্যবস্থার নির্দেশ দেন।

কালীঘাটের কালীমাতা

দ্বাবিংশ পুরুষ সাবর্ণ কুলসূর্য লক্ষ্মীকান্ত

[ক] জন্ম ও বাল্যকাল ঃ

পূর্বে উল্লেখ করেছি সন্তান প্রসবের দিনমাস উপস্থিত হলে জীয়া-দম্পতি পুনরায় কালীঘাটে ফিরে এসে সেই নির্দিষ্ট আশ্রয়ে বসবাস শুরু করেন। জীয়ার ব্রহ্মচারীর বেশ। সর্বদা ব্রহ্মতত্ত্বেরই ধ্যানজ্ঞান। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরম নিষ্ঠায় আর ধর্মচিন্তায় দিনযাপন করছেন। জীয়া কালীভক্ত। বর্তমানে 'কামদেব' নামে তিনি বেশি পরিচিত হয়েছেন। পদ্মাবতী সন্তান প্রসব করবার পূর্বে জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে কামদেব একদিন বংশের ইষ্টদেবী দক্ষিণাকালিকার পূজা করেন। মন্দিরের সেবায়েতগণ প্রত্যেকেই কামদেব আর পদ্মাবতীকে সম্মান প্রদর্শন করতেন।

১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ (৯৭৭ বঙ্গাব্দ)। আশ্বিন মাস। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন। পদ্মাবতী বিকাল ৪-১৫ মিনিটের সময় এক অলৌকিক পরিবেশে সুলক্ষণযুক্ত এক পুত্র-সন্তান প্রসব করলেন। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বলে জীয়া-দম্পতি পুত্রের নাম রাখলেন 'লক্ষ্মীকান্ত'। লক্ষ্মীকান্ত যেন স্থান-কাল-পাত্রের সমন্বয়ে এক দৈবশক্তির সৃষ্টি। তাঁর জন্মলাভ হয়েছে সম্পূর্ণ দৈব ইচ্ছার প্রভাবে। যাকে ইংরেজিতে বলে Man, Moment, Melieu-এর মহামিলনের সমাবেশ। এই সন্তান সম্বন্ধে দৈববাণী হয়েছিল যে এই জাতক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং পর্যাপ্ত সম্মান-সম্পত্তির অধীশ্বর হবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সন্তান প্রসব করার তিনদিন পরেই পদ্মাবতী পরলোকগমন করলেন। শোকার্ত জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় বড়োই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। হিন্দু ধর্মানুসারে পত্নীর অন্ত্যেষ্টি কর্মাদি সমাধা করলেন। তারপর শিশুপুত্রের জীবন-ভবিষ্যৎ ব্যাপারে চিন্তা করছেন—এমন সময় কুটিরমধ্যে টিকটিকির একটি ডিম্ব পতিত হয়ে ফেটে গেল। তার থেকে ক্ষুদ্র টিকটিকি শাবক বহির্গত হল। কিছুক্ষণ শাবকটি স্থিরভাবে পড়ে রইল। পরে একটি ছোট পিঁপড়ে তার নিকট এলে টিকটিকি শাবকটি তৎক্ষণাৎ তাকে আহার নিমিত্ত শিকার করে গলাধঃকরণ করল। জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় এসব দৃশ্য দেখলেন। এই ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের রাজত্বে জীবন ও জীবিকা-বিষয়ক একটি তত্ত্ব তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। মনে ভরসা পেলেন। ঈশ্বরের রাজত্বে টিকটিকি শাবকের যদি কিছু অসুবিধা না হয় তাহলে তাঁর শিশুপুত্রেরও অসুবিধা হবে না। তিনি এই মনোবল এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থাকে অবলম্বন করে সর্বজনবিদিত সংস্কৃত শ্লোকটি লিখলেন ঃ

"কাকঃ কৃষ্ণঃ কৃতো যেন হংসশ্চ ধবলোকৃতঃ।
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন তেন রক্ষা ভবিষ্যতি॥"

—কাককে যিনি কৃষ্ণবর্ণ করেছেন, হংসকে যিনি ধবল বর্ণ করেছেন,—এমনকি ময়ূরকে যিনি বিচিত্র বর্ণে শোভিত করেছেন—তিনিই তোমাকে (শিশুপুত্রকে) রক্ষা করবেন।

শ্লোকটি শিশুপুত্রের বুকের ওপর রেখে জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে কামদেব ব্রহ্মচারী মহাতপস্বীরূপে গৃহত্যাগ করলেন। তিনি ইতিমধ্যেই ব্রহ্মচারীর বেশ গ্রহণ করেছিলেন। এখন প্রকৃত গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারীরূপে শ্রীশ্রীকাশীধামে উপনীত হলেন। এখন তিনি জনসমাজে কামদেব ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত। তিনি কেবল কাশীধামেই আবদ্ধ রইলেন না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিব্রাজকের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ভারতদর্শন তাঁর সাধনার অঙ্গ হওয়ায় তিনি অচিরে মহাজ্ঞানী মহাসাধকরূপে পরিগণিত হলেন। অনেক উচ্চপদস্থ প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

এদিকে শিশুপুত্র কালীঘাটের ধর্মীয় পরিবেশে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। সেই সময় কালীঘাটের কালীমন্দিরের প্রধান সেবায়েত ছিলেন আত্মারাম ব্রহ্মচারী আর তাঁর শিষ্য আনন্দগিরি। পূর্ব থেকেই তাঁরা জীয়া দম্পতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফলে তাঁরা সহজেই তাঁদের শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপর একটি দুগ্ধবতী মাতার সন্ধান করে তাঁর দায়িত্বে শিশুপুত্র অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্তকে অর্পণ করলেন।

শিশু লক্ষ্মীকান্তর পিতা কামদেব (জীয়া) গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'কলিকাতা সেকালের-একালের' গ্রন্থে আর এক তথ্য সংযোজন করেছেন।

সেটি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

"বঙ্গদেশে গোঘাট-গোপালপুর গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি। শৈশবাবধি আমি আমার আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া, উপনয়নান্তে মন্ত্রগ্রহণপূর্বক বঙ্গোপসনার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া, সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ স্ত্রী পদ্মাবতী সমভিব্যাহারে ব্রহ্মচারী বেশ ধারণপূর্বক ইষ্টসাধনার্থ, পীঠমালা গ্রন্থে লিখিত 'বঙ্গদেশে চ কালিকা' অর্থাৎ আদি গঙ্গাতীরে যে স্থানে সতীঅঙ্গ পতিত হয়, তাহা নিরকরনার্থ ও বিশ্বকর্মা নির্মিত পাষাণ মূর্তিও তাঁহার রক্ষক যে অনাদিলিঙ্গ ভৈরব প্রকাশ আছেন, তাহা জানিবার জন্য মাগুরা পরগনার অন্তর্গত আদিগঙ্গাতীরে স্থাননির্ণয় পূর্বক অরণ্যমধ্যে একটি পর্ণকুটির নির্মাণপূর্বক তথায় স্ত্রী-পুরুষে ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন ছিলাম। প্রতি পর্বনিশিতে যথানিয়মে দেবীর অর্চ্চনা করিতাম। একদা আমি পরমতত্ত্ব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় পত্নী পদ্মাবতী কহিলেন, "একি আশ্চর্য! এতদিন এখানে বাস করিতেছি, এরূপ আশ্চর্য্য অলৌকিক দৃশ্য কখনও নয়নগোচর হয় নাই।" এই কথা বলিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "প্রভো! রাত্রি কি শেষ হইয়াছে? পূর্বদিকে অরুণোদয়ের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কি পদার্থ দেখিতেছি? আপনি ঐ দেখুন।" এই কথা আমার কর্ণগোচর

হইবামাত্র আমি কুটিরদ্বার হইতে পূর্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু ঐ ব্যাপার আমার নয়নগোচর হইল না। "কৈ কী দেখিলে?" বলিয়া প্রশ্ন করায়, বণিতা বারম্বার "ঐ দেখ ঐ দেখ" বলিতে লাগিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই নয়নগোচর হইল না। আমি তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যায় পতিত হইয়া অনশনব্রতে জগদম্বার আরাধনা করায়, তৃতীয় দিবসান্তে ঐরূপ নিশাকালে দৈববাণী হইল, "তুমি জন্মান্তরে আমার দর্শনলাভ করিবে, আর পদ্মাবতী দেহান্তে আমাতে লীন হইবে। তোমার ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে এক অতি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সেই পুত্র এ প্রদেশের ভূম্যাধিকারী ও অতুল ঐশ্বর্যশালী হইবে এবং তাহার বংশ হইতে আমার সেবাদি প্রকাশ হইবেক।" তদন্তর কিয়ৎ দিবস মধ্যে পদ্মাবতী গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিয়াই স্বর্গারোহণ করিলে আমি তাহার যথারীতি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, ঐ নবপ্রসূত পুত্রের জীবিকার্থ চিন্তা করিতেছি, ইতিমধ্যে পর্ণকুটিরের চাল হইতে একটি জেষ্ঠীর ডিম্ব পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ অন্ত-নিহিত শাবক ক্রমশঃ সবল হইলে, একটি পিপীলিকা হঠাৎ উহার সম্মুখবর্তী হইবামাত্র সে অনায়াসে ধরিয়া ভক্ষণ করিল। আমি মহামায়ার মায়া বুঝিতে পারিয়া জগদীশ্বরীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, "মাতঃ! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী! তোমার সৃজিত জীব, তোমারই পালনাধীনে থাকিল।" এই বলিয়া অপত্যমায়া পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক, শ্রীশ্রী৺কাশীধামে অবস্থান করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া দৈববাণী সকল প্রকাশ করণার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ইতি

সাবর্ণমুণির সন্তান—
শ্রীকামদেব গঙ্গোপাধ্যায়"

লক্ষ্মীকান্ত অতঃপর কালীঘাটে আত্মারাম ব্রহ্মচারী, অন্নদাগিরি প্রভৃতি সেবায়েতগণের ব্যবস্থাপনায় বড়ো হতে লাগলেন। লোকে তাঁকে কেউ কেউ 'লক্ষ্মীনারায়ণ' নামেও ডাকতেন। পাঁচ বছর বয়সে হালিশহরের নির্দেশে লক্ষ্মীকান্তর হাতেখড়ি অনুষ্ঠিত হল। সেই সঙ্গে শুরু হল বিদ্যাশিক্ষা। তেরো বছর বয়সে যথারীতি লক্ষ্মীকান্তর উপনয়ন দেওয়া হল। তারপর থেকেই চলল প্রকৃত শিক্ষা। পনেরো বছরের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র—এমনকি আরবি, ফারসি সাহিত্যেও বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। তারপর পিতৃগুরু আত্মারাম ব্রহ্মচারীর নিকট শক্তি পূজা ও আরাধনার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

নিয়মিত দেহচর্চার জন্য লক্ষ্মীকান্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ চেহারার অধিকারী হলেন। অস্ত্রবিদ্যাও শিখলেন। তবে প্রপিতামহ পাঁচুশক্তি খানের মতো বীর হতে পারেননি। লক্ষ্মীকান্ত বাল্যকাল থেকেই অতি তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন উদার চরিত্রের মানুষ হয়ে বড়ো হতে লাগলেন।

গুরু আত্মারাম ব্রহ্মচারী একদিন কিশোর লক্ষ্মীকান্তর পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, তাঁদের স্বপ্নদর্শন, মাতার মৃত্যু এবং পিতার সন্ন্যাস গ্রহণ ও শ্রীকাশীধামে গমন সম্বন্ধে সমস্ত কথা ব্যক্ত করলেন। লক্ষ্মীকান্তর সম্বন্ধে দৈববাণীও প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না।

কিশোর লক্ষ্মীকান্ত তখন পিতাকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হলেন। গুরুদেব আত্মারাম ব্রহ্মাচারীর নিকট জেনেছেন তাঁর পিতা তখন ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত করে কাশীধামেই অবস্থান করছেন। তিনি উচ্চমার্গীয় সন্ন্যাসী। কিন্তু কিশোর লক্ষ্মীকান্তর পক্ষে তখন একা শ্রীকাশীধাম পৌঁছোনো সম্ভব ছিল না। তাই তিনি আত্মারাম ব্রহ্মচারীর সাহায্যের অপেক্ষায় রইলেন।

[খ] কর্মধারা ও সৌভাগ্যলাভ (জমিদারি লাভ) ঃ

যৌবনের প্রাক্কালেই লক্ষ্মীকান্ত সৎ, সাহসী, ভাষাবিদ এবং কর্মদক্ষ যুবক হিসেবে পরিগণিত হলেন। বারো ভুঁইয়া বিক্রমাদিত্যের অধীনে তিনি সপ্তগ্রাম সরকারের (সাতগাঁ) রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী নিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। লক্ষ্মীকান্ত এই সুযোগটিকে প্রথমে পিতৃদর্শনের কার্যে ব্যবহার করলেন। কাশীধামে পিতাকে দর্শন করে তিনি পুনরায় সাতগাঁয়ে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে এলেন।

বিক্রমাদিত্য তখন সপ্তগ্রাম সরকারের কানুনগো। তাঁর কাজ ছিল দক্ষিণবঙ্গের সমতট জমি জরিপ করা এবং রাজস্ব আদায়ের হিসাব রাখা এবং পরীক্ষা করা। লক্ষ্মীকান্ত তাঁর অধীনেই রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী। বিক্রমাদিত্য লক্ষ্মীকান্তকে বেশ পছন্দ করতেন এবং ভালোবাসতেন।

পাঠান আমলে বারোটি অঞ্চলের বারো ভুঁইয়াগণ রাজস্ব আদায় না দিয়ে স্বাধীন রাজার মতো আচরণ করতেন। মুঘল আমলেও প্রায় একই চেষ্টা করতেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য সাধারণ জমিদারগণও রাজস্ব আদায় দিতে অস্বীকার করতেন। ফলে বাংলায় একটা অরাজকতা, খুন, লুট, ডাকাতি ইত্যাদি লেগেই থাকত। তখন রাজস্ব আদায় হত তিন খাতে—(১) জমির ফসলের ওপর, (২) শিল্পবাণিজ্য এবং অরণ্য-সম্পদের ওপর আর, (৩) বাদশাহের সৈন্যবিভাগের আনুপাতিক খরচের নিমিত্ত।

জমিদারগণ রাজস্ব আদায় না দেওয়ায় বিক্রমাদিত্যের পক্ষে দিল্লির বাদশাহকে রাজস্ব প্রদান করা মুশকিল হয়ে পড়ল। সেই সময় অপদার্থ শের খাঁ সৈন্য দিয়েও এ ব্যাপারে বিক্রমাদিত্যকে তেমন সাহায্য করতেন না। ফলে বিক্রমাদিত্য কানুনগো কাজ

থেকে অবসর নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে দাউদ খাঁ প্রদত্ত জায়গির নিয়ে চলে এলেন। জায়গিরদার বিক্রমাদিত্য 'রাজা' উপাধিও লাভ করলেন।

তখন প্রতাপাদিত্য পিতার কানুনগো কাজে নিযুক্ত হলেন। লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপাদিত্যের সমবয়সি। তিনি প্রতাপাদিত্যকে আপ্রাণ সাহায্য করতে লাগলেন। ফলে প্রতাপাদিত্য সৈন্য সামন্ত দিয়ে আক্রমণ করে জমিদার এবং অন্যান্য বারো ভুঁইয়াদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায়ে সফল হলেন। পিতা বিক্রমাদিত্য যা পারেননি, পুত্র প্রতাপাদিত্য লক্ষ্মীকান্তের সহায়তায় তা পারলেন। লক্ষ্মীকান্তের বুদ্ধি, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় প্রতাপ মুগ্ধ হতে লাগলেন।

বহুদিন পরে বিক্রমাদিত্য মারা গেলে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতাপাদিত্য পিতার জায়গির লাভ করেন। তখন তিনি লক্ষ্মীকান্তকে উক্ত জায়গিরের অধীন দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। প্রতাপাদিত্য এবং লক্ষ্মীকান্ত উভয়ে প্রবল প্রচেষ্টায় জমিদার, সামন্তবর্গ, বারো ভুঁইয়াদের নিকট থেকে বকেয়া ও বর্তমানের সকল খাজনা-রাজস্ব আদায় করলেন। প্রতাপাদিত্য দিল্লিতে মুঘল দরবারে বাদশাহের নিকট সেসব অর্থ জমা দিলেন। বাদশাহ আকবর এই প্রচেষ্টায় মহাখুশি হয়ে তিনি প্রতাপাদিত্যকে 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করলেন।

বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভাই বসন্ত রায় তখন দক্ষিণবঙ্গের সমতটে যশোহর নগর প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতাপ এই যশোহর নগরকে কেন্দ্রস্থলরূপে স্থির করে আপন রাজশক্তি বৃদ্ধির প্রতি ঝুঁকলেন। অপদার্থ শের খাঁকে রাজস্ব না দিয়ে সরাসরি দিল্লির বাদশাহকে রাজস্ব দিতে শুরু করলেন। তখন শের খাঁ প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। প্রতাপ পোর্তুগিজ জলদস্যু রোডার (Rodda) সাহায্যে শের খাঁকে দারুণভাবে পরাজিত করেন। দিল্লির বাদশাহ এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর নিযুক্ত শেঁর খা পরাজিত হওয়ায় দিল্লির বাদশাহ আকবর প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দক্ষিণবঙ্গের নদীনালা এবং ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপে আক্রান্ত হওয়ায় মুঘলসেনা বারবার আক্রমণ করেও প্রতাপাদিত্যের নিকট পরাজিত হতে লাগলেন। সাত বছর এই যুদ্ধ চলল। বার বার যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রতাপাদিত্য অতিরিক্ত উল্লাসে এবার তাঁর বিজয়ী বাঙালি সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজমহল অধিকার করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

লক্ষ্মীকান্ত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের এই ঔদ্ধত্য পছন্দ করলেন না। যতদিন প্রতাপাদিত্য সমাজের অরাজকতা দমন, শের খাঁয়ের অত্যাচারের প্রতিবাদ, বারো ভুঁইয়াদের পরাভূত করে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যে তাঁর রাজশক্তি ব্যবহার করেছিলেন, লক্ষ্মীকান্ত ততদিন তাঁকে বুদ্ধি ও সহযোগিতা দান করেছেন। সমর্থনও করেছেন। কিন্তু রাজমহল আক্রমণ লক্ষ্মীকান্তের নীতির পরিপন্থী। তা ছাড়া রাজমহল

অধিকার করার মতো উপযুক্ত শক্তিও প্রতাপাদিত্যের ছিল না। প্রতাপাদিত্য আর-একটি মহা ঔদ্ধত্যের কাজ করলেন। তিনি কাকা বসন্ত রায়কে সরশুনায় রায়দিঘির নিকট হত্যা করলেন। এতে লক্ষ্মীকান্ত চরম মর্মাহত হলেন। এই অন্যায় তিনি কোনোক্রমে মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর পিতৃসম জ্যাঠামশায়কে অনৈতিক এবং অধর্মীয় পথে হত্যা করায় লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপাদিত্যের সংস্রব ত্যাগ করলেন। ধর্মপ্রাণ লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের গভীর মতপার্থক্য ঘটল। লক্ষ্মীকান্ত যশোহরের রাজসম্পর্ক এবং রাজকর্ম পরিত্যাগ করে কালীঘাটে ফিরে এসে ধর্মকর্ম এবং নিজ কর্মে মনোনিবেশ করলেন।

বাদশাহ আকবরের সেনাপতি আজিম খাঁ আর ইব্রাহিম খাঁ আবার প্রতাপাদিত্যের নিকট পরাজিত হলেন। দক্ষিণবঙ্গের জলদোষে আন্ত্রিক রোগে আর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বাংলা ত্যাগ করলেন।

তখন আকবর প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করার জন্য দিল্লি থেকে তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় পাঠালেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। লক্ষ্মীকান্তের পিতা কামদেব ব্রহ্মচারী তখন একজন ভারতবিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু। মানসিংহ তাঁর শিষ্য। মানসিংহ বাংলায় গমন করার পূর্বে কাশীতে গুরুদর্শনে গেলেন এবং প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

কামদেব ব্রহ্মচারী তাঁকে আশীর্বাদ করে পুত্রের সন্ধান করতে আদেশ দিলেন। সেটিই হবে তাঁর গুরুদক্ষিণা। তিনি আরও বললেন, তাঁর পুত্রের নাম লক্ষ্মীকান্ত। সে একুশ বছর বয়সে একবার কাশীতে এসে পিতৃদর্শন করে গেছে। তারপর তিনি আর পুত্রের সংবাদ পাননি।

কামদেব বাংলাদেশের জলাজঙ্গলাকীর্ণ পথঘাট, ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক রোগ ইত্যাদি বিষয়ে মানসিংহকে সতর্ক করে দিলেন। সেই সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রানুসারে নিত্য কোন্ পাচন সেবন করা প্রয়োজন তাও বলে দিলেন।

মানসিংহ গুরুদেবের নির্দেশমতো সৈন্যদলে বাংলা থেকে বৈদ্য সংগ্রহ করে তাঁবুতে তাঁদের নিয়োগ করলেন।

যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের নিকট পরাজিত এবং বন্দি হলেন।

এবার মানসিংহ গুরুদেবের আদেশ অনুসারে তাঁর পুত্র লক্ষ্মীকান্তের সন্ধানে ব্যস্ত হলেন। সপ্তগ্রাম সরকারের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী থাকার সময় একুশ বছর বয়সে লক্ষ্মীকান্ত কাশীধামে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বংশবাটির (বাঁশবেড়িয়া) ছোটো জমিদার জয়ানন্দ শূদ্রমনিকে মানসিংহ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন। এই জমিদার মানসিংহকে বললেন যে লক্ষ্মীকান্ত বর্তমানে কালীক্ষেত্র

কালীঘাটে অবস্থান করছেন। কালীঘাটে লক্ষ্মীকান্তকে দেখে মানসিংহ অভিভূত হলেন। লক্ষ্মীকান্তের সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ। শিক্ষা ভাষাজ্ঞান সততা আত্মমর্যাদাবোধ এবং প্রশাসন দক্ষতার পরিচয় পেয়ে মানসিংহ মুগ্ধ হলেন। যেহেতু লক্ষ্মীকান্ত ইতিপূর্বে রাজস্ব বিভাগে কর্মরত ছিলেন, সেজন্য মানসিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁকে 'মজুমদার' পদবি অর্পণ করলেন। 'মজুঅন্' অর্থ দলিল রক্ষক। অনেকের মতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বলাভ করে যাঁরা অঞ্চলকে শাসন করার 'অধিকার' বা 'মজুমা' পেতেন বাদশাহ্ তাঁদের 'মজুমদার' উপাধি প্রদান করতেন। লক্ষ্মীকান্ত এবং কৃষ্ণনগরের ভবানন্দ উভয়েই 'মজুমদার' উপাধি পেয়েছিলেন। তবে ভবানন্দ রাজা হয়েছিলেন।

প্রতাপাদিত্য পরাজিত এবং বন্দি হওয়ায় তখন মানসিংহ বাংলার সর্বেসর্বা। তিনি লক্ষ্মীকান্তকে তাঁর ইচ্ছা এবং অভিলাষের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সেইসঙ্গে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তিনি লক্ষ্মীকান্তকে সামন্তরাজা করতে চাইলেন। কিন্তু নির্লোভ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লক্ষ্মীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে সম্মান-মর্যাদা ব্যতীত বাঁচা যায় না। তবে তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান। বৈদিক নিয়ম অনুসারে তিনি রাজা হতে পারেন না। সেই সঙ্গে যশোহরের সম্পত্তিতেও তাঁর লোভ নেই। তখন মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে প্রতাপাদিত্যের পদাধিকারী করলেন। ভবানন্দ মজুমদারই কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লির তৎকালীন বাদশাহ্ আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের সিলমোহর ও স্বাক্ষর সম্বলিত সনন্দের বলে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তকে সমতটের বিশাল জঙ্গলমহলের নিষ্কর জায়গিরদারি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দান করলেন। তখন লক্ষ্মীকান্তের বয়স মাত্র আটত্রিশ বছর। এই সংবাদ শুনে এবং অধার্মিক প্রতাপ শাস্তি পাওয়াতে কামদেব ব্রহ্মচারী মানসিংহকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত অতঃপর মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা পাইকান, আনোয়ারপুর, আমিরাবাদ, হাতিয়াগড়, হাভেলিশহর এই আটটি পরগনার জায়গিরদার হলেন। উক্ত পরগনাগুলির মধ্যে আনোয়ারপুর ২৪ পরগনার মধ্যে ছিল না। এমনকি হাভেলিশহর বা হালিশহরও তখন স্বতন্ত্র তালুক হিসেবে খ্যাত ছিল। বিশেষ অবগতির জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব মিরজাফর খাঁয়ের নিকট পরে যে চব্বিশটি পরগনা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর জমিদারিস্বরূপ পান তা উল্লেখ করছি।

ইংরেজ সেরেস্তায় ব্যবহৃত বানান ও উচ্চারণ অনুসারে পরগনাগুলির নাম উল্লেখ করা হল।

(১) মাগুরা (Mugra), (২) খাসপুর (Khasspoor), (৩) মেদম্মল (Muden Mull), (৪) ইক্তিয়ারপুর (Ekhte-arpoor), (৫) বারিদহাটি (Barjutty), (৬) আজিমাবাদ (Azimabad), (৭) মুড়াগাছা (Moodagacha), (৮) সাহাপুর (Sahapoor), (৯)

পেঁচকুলি (Patchkollu), (১০) সাহানগর (Sahanagar), (১১) কিস্‌মৎগড় (Kismatghur), (১২) খাড়ি পুড়ি (Karee Jurree), (১৩) দক্ষিণসাগর (Daccan Sangur), (১৪) কলিকাতা (Calcutta), (১৫) পাইকান (Paikan), (১৬) মানপুর (Munpoor), (১৭) আমিরাবাদ (Ameerabad), (১৮) মহম্মদ আমিনপুর (Mohamed Awlipoor), (১৯) মঙ্গলিমহল (Mellang Mahal), (২০) হাতিয়াগড় (Hatteagur), (২১) ময়দা (Meida), (২২) আকবরপুর (Akbarpoor), (২৩) বেলিয়া (Bellia), (২৪) বসন্দরী (Bussinarry)।

পূর্বে উল্লিখিত যে আটটি পরগনা বা অঞ্চলের জায়গির লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার লাভ করলেন তার মধ্যে লক্ষ করলে দেখা যাবে ছ-টি ২৪ পরগনার মধ্যে ছিল। আনোয়ারপুরের নাম ২৪ পরগনার মধ্যে নেই। তবে ১০৯০ হিজরি অব্দে অর্থাৎ ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে বংশবাটির (বাঁশবেড়িয়া) তৎকালীন রাজা বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেবের নিকট যে মহলের জমিদারি পান তার মধ্যে আনোয়ারপুরের নামের উল্লেখ আছে। তা ছাড়া, সরকার সপ্তগ্রামের মহলের মধ্যেও আনোয়ারপুরের নাম পাওয়া যায়। তার বার্ষিক রাজস্ব তখন ছিল ২৪৬৯৫০ তৎকালীন মুদ্রা।

আর হাভেলিশহর মূলত পাঁচুশক্তি খানের সময়ে কাঞ্চনপল্লি, নবহট্ট, কুমারহট্ট, ভট্টপল্লি প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে উঠেছিল।

অবশিষ্ট ছ-টি পরগণা ২৪ পরগনার মধ্যে ছিল।

১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত সনন্দের বলে লক্ষ্মীকান্ত দক্ষিণবঙ্গের যে বিশাল ভূখণ্ডের জায়গির পেলেন, বিগত একশো বছর পূর্বেও তা জঙ্গল ও জলাভূমি নামে পরিচিত ছিল। লক্ষ্মীকান্ত মূলত সপ্তগ্রামের অধীন আনোয়ারপুর, বর্তমান হাভেলিশহর, ব্যারাকপুর থেকে দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদার হন। তিনি প্রথমে হুগলি জেলার গোহট্ট গোপালপুর এবং পরে হালিশহর থেকে জমিদারি তত্ত্বাবধান করতেন।

লক্ষ্মীকান্ত এবং ভবানন্দ উভয়ে 'মজুমদার' উপাধি দ্বারা প্রথমে ভূষিত হয়েছিলেন। মানসিংহের নির্দেশে লক্ষ্মীকান্তের জমি হল 'নিষ্কর'। আর মানসিংহ্ তাঁকে বর্তমানে "রায়" ও "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করলেন। "রায়" অর্থে বিত্ত ও সৌভাগ্য আর "চৌধুরী" অর্থে ভূসম্পত্তি ও জমিদারি।

এসব উপাধি লাভ করেও লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় গোত্রের মর্যাদা দিয়ে এখন থেকে পরিচিত হতে লাগলেন "সাবর্ণ রায় চৌধুরী"। নাম রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী। তাঁর বংশধরগণ "সাবর্ণ রায় চৌধুরী" শাখারূপে অভিহিত হতে থাকেন।

"বাংলার সমাজ দর্পণে" মানসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। এই সমাজ দর্পণ সমসাময়িক কুলাচার্য বা ঘটক সম্প্রদায় লিখে রেখে গেছলেন। লালমোহন বিদ্যানিধিমশায় তাঁর 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থে সেসব তথ্য উল্লেখ করেছেন।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা হল।

জীয়া সর্ব শাস্ত্রবিধ পাণ্ডিত্য অসীম।
তা দেখি মানসিংহ করে ভক্তি অনুপম॥
তাই মানসিংহ তাঁর অতিশয় ভক্ত।
তাঁর দীক্ষা শিক্ষায় ত্রিতাপে অনাসক্ত॥
গুরুর আশীষে শিষ্য মানবে সিংহ।
ভারত জয়ী হল যে রাজা মানসিংহ॥
কি কাজে গুরুর তোষ? ইঙ্গিতে তা শুনি।
তব ভ্রাতৃ অন্বেষণ কর যাদুমণি॥
মানসিংহ গুরুপুত্র করে অন্বেষণ।
কালীঘাটে দেখা নাম লক্ষ্মীনারায়ণ॥
শিষ্ট শান্ত সুবুদ্ধি তেজিয়ান অতি।
বালক হলেও বিজ্ঞ আছিল সুমতি॥
রাজা জিজ্ঞাসিল ভাই মাতৃচরণ কই।
চরণামৃত দেও গুরুঋণ মুক্ত হই॥
লক্ষ্মীনারায়ণ কহে মাতৃ আজ্ঞা শুন।
মর্যাদাহীন জীবনে নাই কাজ পুনঃ॥
নৃপ বলে প্রতিজ্ঞা মম জান স্থির।
গুরুর আদেশ রক্ষায় আছে এ শরীর॥
আজি হতে তব ইচ্ছা যত লও ভূমি।
কুলীনে ধরুক ছাতা অন্নদাতা তুমি॥

ভবানন্দ সহচর কানুনগো ভার।
ইচ্ছামত তব রাজ্য হবে যে বিস্তার॥
উত্তররাঢ়ী কায়স্থ দ্বিজ ভক্ত এক।
লক্ষ্মীর সন্ধানে ক্লেশ পায় সে কতেক॥
ক্ষুদ্র ভূমিপ বটে দেব দ্বিজে সুমতি।

মানসিংহের আজ্ঞায় রাজস্বে নিষ্কৃতি॥

....

....

লক্ষ্মীর অতুল বিত্ত রায়চৌধুরী খ্যাতি।
কন্যাদানে কুলনাশে কুলের দুর্গতি॥

....

....

কালীঘাটে কালী হল চৌধুরী সম্পত্তি।
হালদার পূজক এই ত তার বৃত্তি॥

....

....

জানুক না জানুক অস্ত্রের কেহ বিদ্যা।
সৈন্যের রক্ষণে পটু চৌধুরী অনবদ্যা॥
ভূসম্পত্তি যার, তার নাম তালুকদার।
জমিদার চৌধুরী, হাজারীতে হাজার॥

....

....

ওপরের উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে সহজেই জানা যায়—মানসিংহ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ লক্ষ্মীকান্তকে বিশাল নিষ্কর ভূসম্পত্তির অধীশ্বর করেছিলেন। শুধু 'মজুমদার' নয়, 'রায় চৌধুরী' উপাধি দ্বারাও ভূষিত করেছিলেন।

পিতা কামদেব ব্রহ্মচারীকে ভগ্ন কুলীন বলে ঘোষণা করায় প্রতিবাদস্বরূপ লক্ষ্মীকান্ত কন্যাদানের মাধ্যমে দুর্নীতিযুক্ত কুলীন প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন।

কালীঘাটের কালী সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের সম্পত্তি। আর হালদারগণ কেবল পুরোহিত মাত্র।

অস্ত্রবিদ্যা না জানলেও সৈন্য রক্ষায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশ দক্ষ।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার কেবলমাত্র অল্প আয়ের তালুকদার মাত্র ছিলেন না। হাজার হাজার টাকা তাঁদের জমিদারির রাজস্বের আয় ছিল।

অবশ্য এগুলি সম্পূর্ণ সঠিক। লক্ষ্মীকান্ত তাঁর অধ্যবসায় নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের দ্বারা তাঁর জলা-জঙ্গলাকীর্ণ জমিদারিকে নতুন করে সাজিয়ে তুললেন। তাঁর জীবনেই তাঁর জমিদারির বাৎসরিক আয় বারো লক্ষাধিক সিক্কায় উপনীত হয়েছিল। এর বর্তমান অর্থমূল্য হিসেবে ৬০ কোটি টাকার মতো।

লক্ষ্মীকান্ত বঙ্গদেশে প্রধান ভুঁইয়া রূপেও পরিগণিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জমিদারি ছিল বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী।

হুগলি জেলার গোহট্ট-গোপালপুরে লক্ষ্মীকান্তের বসতবাটি ছিল। ওই বসতবাটি পরিখাবেষ্টিত। কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত জমিদারির কাজকর্মের সুবিধার জন্য হালিশহরে বাড়ি তৈরি করে সেখানেই বসবাস করেন। কাছারি বাড়ি তৈরি হয় বড়িশায়।

লক্ষ্মীকান্তের জমিদারি ভাগীরথীর উভয়তীরেই বিস্তৃত ছিল। পূর্বতীরে আলিপুরের অধীন গার্ডেনরীচ, খিদিরপুর, চেতলা, বেহালা-বড়িশা, কালীঘাট, কলিকাতার অধীন বারাকপুর নিমতা, দমদম, বরানগর, আগরপাড়া, খড়দহ, বেলঘরিয়া, বারাসাত; ডায়মন্ড-হারবারের অধীন মথুরাপুর, রসা, রামনগর, বেলেপুকুরিয়া, বাঁশতলা, লক্ষ্মীকান্তপুর প্রভৃতি জায়গা এবং হাভেলিশহরের অধীন এলাকাগুলি তাঁর জমিদারির মধ্যে ছিল। আর ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে সালকিয়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি জায়গাসহ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি প্রভৃতি এলাকাও তাঁর জমিদারির অন্তর্গত ছিল।

দক্ষিণের তৎকালীন শেষ সীমানার গ্রামটি তাঁর নাম অনুসরে বর্তমানে 'লক্ষ্মীকান্তপুর' নামে পরিচিত।

কালীঘাটের কালীমন্দির তিনি কেবল তাঁর জমিদারির মধ্যেই রাখলেন না,—দেবীর মন্দির সংস্কার করে পূজা-অর্চনার নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "কালীক্ষেত্র দেবীপিকা" এবং উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "কালীঘাট ইতিবৃত্ত" গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় রাজা মানসিংহ তাঁর গুরুদেব কামদেব ব্রহ্মচারীর নির্দেশেই নিষ্কর জমি এবং দেবীর মন্দিরের সংস্কারের জন্য ১৫০০ টাকার একটি তহবিল (তৎকালীন মূল্যে) দান করেছিলেন। ওই নিষ্কর জমি লক্ষ্মীকান্তের খাসপুর পরগনার অন্তর্গত ছিল। ফলে লক্ষ্মীকান্ত কালীদেবীর সেবায়েতগণকে ৫৯৫ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। এই দানপত্র কালীঘাটের কালীদেবীর জনৈক সেবায়েতের নিকট আজও রক্ষিত আছে বলে জানা যায়।

লক্ষ্মীকান্ত সন্তানদের আদেশ দিয়েছিলেন যে এই কালিকাদেবী সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের ইষ্টদেবী এবং গৃহদেবতারূপে পূজিত হবেন।

শুধু কালীঘাট নয়,—কলিকাতা, আমাটি, গোঘাটেও তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিজমা দান করেন। হালিশহরে দোলমঞ্চের পশ্চিমদিকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে একটি আটচালা এবং কোঠাবাড়ি নির্মাণ করেন। ওই বৎসরেই তিনি হালিশহরে প্রথম সবাহন পরিবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করেন। তারপর বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বড়িশার কাছারিবাড়িতে ওইরূপ সপরিবার-

সবাহন দুর্গাপূজা শুরু করেন। সেই দুর্গাপূজা বড়িশায় আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে বাংলায় অন্যত্র দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলেও লক্ষ্মীকান্তই বাংলায় প্রথম সপরিবার-সবাহন দুর্গাপূজা—অর্থাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশসহ দশভুজা দুর্গার পূজা শুরু করেন।

রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী অধ্যবসায়ে পাণ্ডিত্যে, পরোপকারে, সমাজপ্রতিষ্ঠায় ও সংস্কারে, প্রশাসনিক নৈপুণ্যে ও বিচক্ষণতায় এবং ধর্মাচরণে এক বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন।

[গ] প্রজাপালন ও প্রশাসন ঃ

প্রজাপালন এবং প্রশাসনে লক্ষ্মীকান্ত তাঁর প্রপিতামহ ঊনবিংশ পুরুষ পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় অর্থাৎ পাঁচু শক্তি খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। হালিশহরে পাঁচু শক্তি খান যেখানে বাস্তুভিটা রচনা করেছিলেন, লক্ষ্মীকান্ত তারই পাশে নিজ বসবাসের নিমিত্ত বিরাট পাকাবাড়ি নির্মাণ করলেন। প্রথমে তিনি এখান থেকেই জমিদারি দেখাশোনা শুরু করলেন।

লক্ষ্মীকান্তের জমিদারির প্রায় আশি শতাংশই জলাভূমি। কেবল ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে সালকিয়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া এবং মেদিনীপুরের কাঁথি এলাকা জলাভূমি নয়।

লক্ষ্মীকান্ত জলাভূমি ভর্তি করে, জঙ্গল কেটে বসতি রচনা করলেন। জমিকে চাষের উপযোগী করে তুললেন। সমাজ রচনা করার ব্যাপারে বুদ্ধিমান দূরদর্শী লক্ষ্মীকান্ত যথেষ্ট সচেষ্ট হলেন। প্রজাবৎসল লক্ষ্মীকান্ত কলিকাতাসহ তাঁর সমগ্র জমিদারিকে আধুনিক বাসযোগ্য করার জন্য সমতল ভূমিতে পরিণত করলেন। ভাগীরথীর উভয় তীরে নতুন নগর গড়ে তুলতে লাগলেন। শেঠ বসাকদের মতো ব্যবসায়ীদের পাওয়ার ফলে তিনিই কলিকাতায় প্রথম নগরের রূপদান করলেন। জমিদারির কাজকর্মের জন্য বর্তমান লালদিঘির ধারে প্রথম তৈরি হল লম্বা বাড়ি।

শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তিনি কাজের জোগান দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। শিল্প ও কৃষির জন্য বৈশ্য বর্ণের মানুষের বসতি স্থাপন করতে লাগলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য শিক্ষিত উচ্চবর্ণের কর্মসংস্থান শুরু করলেন। লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর জমি দেবার্চনা এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণদের দান করলেন। চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের জমি দিলেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য হালিশহর, কাঞ্চনপল্লি (কাঁচরাপাড়া), ভট্টপল্লি (ভাটপাড়া), গড়ফা প্রভৃতি অঞ্চলে যোগ্য 'সমাজ' রচনাকল্পে

লক্ষ্মীকান্ত ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের বসতির ব্যবস্থা করতে কুণ্ঠিত হলেন না। মিত্র, দত্ত, বসু প্রভৃতি কুলীন কায়স্থ বংশ তাঁর জমিদারিতে বাসস্থান লাভ করলেন।

ইতিমধ্যেই লক্ষ্মীকান্তের গুণমুগ্ধ অনেক কৃতজ্ঞ প্রজা ছিলেন। তাদের যোগ্যতা বিচার করে বিভিন্ন কার্যে তাদের নিযুক্ত করলেন। প্রজাদের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ বৈদ্য পরিবারের বসতির ব্যবস্থা করে তাদের জমিজমা প্রদান করলেন। সমতটে শিল্পের বিস্তার ঘটানোর জন্য লক্ষ্মীকান্ত সচেষ্ট হলেন। প্রপিতামহ পাঁচু শক্তি খান এ কাজটা শুরু করে গেছলেন। লক্ষ্মীকান্ত এখন সে কাজের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াসী হলেন। তখন কেবল খুলনা যশোহর জেলায় তুলোর চাষ হচ্ছিল। সেই সুতো থেকে ঢাকায় শান্তিপুরে সুতো কাটা হত। কাপড় বোনাও হত সেখানে। হালিশহরের কালিকাতলা থেকে যশোহরের ভূষণা পর্যন্ত যে সড়ক ছিল—সেই সড়ক ধরে যশোহর-খুলনার তুলো এসে পৌঁছোতে লাগল লক্ষ্মীকান্তের বিশাল জমিদারিতে। পরে পরে তিনি জমিদারিতে কার্পাস তুলোর চাষের উদ্যোগ নিলেন। সুতোর বড় হাট বসতে শুরু হল সুতানুটিতে। মেদিনীপুর থেকে বারুই এনে তাঁর জমিদারিতে পান চাষের ব্যবস্থা করলেন। মনে হয়—বর্তমানের বারুইপুর পূর্বে বারুইজীবীদের প্রধান বসতি ছিল। লক্ষ্মীকান্তের জমিদারি জলাভূমি, নদীনালা প্রধান হওয়ায় মৎস্যজীবীদের গ্রাম বা বসতি নদীর ধারে ধারে এবং জলাভূমির আশপাশে গড়ে উঠল। এইসব অঞ্চল নোনা মাটির। তাই সুপারি ও নারকেল চাষের পক্ষে জমি বেশ উর্বর। প্রচুর নারকেল, সুপারি চাষ হতে লাগল। এতে পান-সুপারির ব্যাবসা যেমন বাড়ল, তেমনি নারকেল ছোবড়া থেকে দড়ি বা কাতা তৈরি হতে লাগল। ওই দড়ি বা কাতার প্রধান খদ্দের নৌকাজীবী আর মৎস্যজীবীগণ। নদী-সমুদ্রের তীরে, দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল প্রচুর ঝিনুক পাওয়া যেত। ঝিনুক কুড়িয়ে তাকে পোড়ালে তখন একপ্রকার কলিচুন তৈরি হত। ফলে লক্ষ্মীকান্তের জমিদারির মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত ধনী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ওই কলিচুন এবং নারকেলকাতা দড়ির প্রধান ব্যাবসা গড়ে উঠল। অনেকের অনুমান,—কলিচুন আর কাতার বাজারের স্থানটিকে তখন "কলিকাতা" বলা হত। কেউ বলেন—কালীক্ষেত্র শব্দ থেকে "কলিকাতা" নামের উৎপত্তি। অবশ্য এই দেশজ শব্দটির সঠিক ব্যুৎপত্তি আজও ধোঁয়াটে।

লক্ষ্মীকান্ত তখন সমগ্র বাংলায় ব্রাহ্মণ জমিদারগণের মধ্যে সবচেয়ে ধনশালী, ব্যক্তিত্বপরায়ণ বিচক্ষণ জমিদার। দ্বিতীয় পুরুষ বীর রাঘব বা ঊনবিংশ পুরুষ পাঁচ শক্তি খানের মতো লক্ষ্মীকান্ত অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ছিলেন না বটে কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সাহচর্যে সৈন্য পরিচালনার বিষয়ে তাঁর পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। সাবর্ণ বংশের জ্যোতিষ্মান পুরুষ হওয়ার মতো সমস্ত গুণ তাঁর ছিল। জমিদারি রক্ষা করার জন্য দক্ষ যোদ্ধাবাহিনী তিনি তৈরি করলেন। এই বাহিনী প্রয়োজনে মুঘল বাহিনীকেও সাহায্য করত। বিরাট জমিদারি

রক্ষা করার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীকান্ত একাধারে সুযোগ্য শাসক এবং সুযোগ্য বিচক্ষণ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন।

লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

জানুক না জানুক অস্ত্রের কেহ বিদ্যা।
সৈন্যের রক্ষণে পটু চৌধুরী-অনবদ্যা॥

....

....

এইরূপ করগ্রাহী মাত্রায় চৌধুরী।
সৈন্যাধ্যক্ষ রসদ দাতা যা হে বাহাদুরী॥

....

....

হালিশহরে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীকান্ত প্রথম দুর্গাপূজা করলেও ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বড়িশার কাছারিবাড়িতে নিয়মিত দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। দুর্গার মেড়ে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ—তার পাশে কলাবউ। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের দশভুজা দুর্গা অতসীবর্ণা বা শিউলি ফুলের বৃন্তের বর্ণা। "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" পুঁথি অনুসারে দেবীর পূজা হয়। সপরিবার মহিষমর্দিণী দুর্গাপূজা লক্ষ্মীকান্তই বঙ্গদেশে প্রথম শুরু করেন। যদিও এর পূর্বে আহেরপুরে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল,—কিন্তু সে দুর্গাদেবী সপরিবারে পূজিত হননি।

বড়িশায় উঁচু উঁচু কতকগুলি থামের মাথায় সাঁজার আটচালার কাঠামোর ওপরে গোলপাতার ছাউনি। সেজন্য এই আটচালার নাম সাঁঝার আটচালা বা সাঁঝের আটচালা। এখানেই লক্ষ্মীকান্ত প্রথম দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন। এই সাঁঝার আটচালার সামনে কাছারিবাড়ি। এই স্থানটি এখনও আভিজাত্য আর জীবন্ত ইতিহাসের এক মহান সাক্ষী হয়ে আছে। কাছাড়িবাড়ির কয়েকটি থাম আজও দেখা যায়। সাঁঝার কাঠামো নেই, গোলপাতার ছাউনিও নেই। অর্থাৎ নেই সেই পূর্বের 'আটচালা'।

বেহালা অঞ্চলের প্রাচীন নাম 'বহুলাপুরী'। অর্থাৎ অনেকগুলি পুর বা গ্রাম নিয়ে গঠিত বহুলাপুরী। ....বর্তমানে 'বেহালা'। অনেকে বলেন, মুসলমান যুগে পরগনাগুলিকে 'মহল' বলা হত। পাঠান আমলে বেহালা অঞ্চলের নাম ছিল 'বাঈমহল'। অর্থাৎ এই মহলের রাজস্ব মহিলাদের জন্য ব্যয়িত হত। ফলে এই মহলকে 'বাঈমহল' বলা হত। বাঈমহল > বাইমহল্লা > বাহাল্লা > বায়লা > বেহালা। এইভাবে 'বেহালা' নামকরণ হয়েছে।

এখানে নবাবি আমলের পড়ন্তবেলায় সরশুনার রায়গড় ছিল বসন্ত রায়ের রাজধানী। তার নাম অনুসারেই সরশুনার দিঘির নাম 'রায়দিঘি'। সরশুনার পাশে বড়িশার পথে তখন কেউ পা বাড়াত না। কিন্তু বড়িশা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীর কাছারিবাড়ি তৈরি হওয়ার পর থেকে। এই এলাকার রাজস্বের বড়ো হিষ্যা বা বড়ো ভাগ আদায় হত বলে অনেকে বলেন সেজন্য এই গ্রামের নাম হয় বড়হিষ্যা > বড়িষা। কিন্তু সুকুমার সেনের মতে—এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত জলাভূমি। জলাভূমিতে ভূমিপুত্ররা বঁড়শে দিয়ে মাছ ধরতেন। সেজন্য এই গ্রামের নাম বড়িশা (বঁড়শে > বড়িশা)।

লক্ষ্মীকান্ত এই বড়িশা থেকে হালিশহর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করেছিলেন। কারণ হালিশহরেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

কর্মব্যস্ত লক্ষ্মীকান্ত তাঁর বড়িশার কাছারিবাড়িতে প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা মন দিয়ে শুনতেন। তাঁদের সমস্যা দূরীকরণের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। রাজস্ব আদায়ে কোনো জুলুমি ব্যবস্থা গৃহীত হত না। প্রজাদের দারিদ্র্য-দুর্গতি বিবেচনা করে তিনি রাজস্ব অনেকক্ষেত্রে মকুব করে দিতেন। তিনি ছিলেন দরদি-প্রজাপালক জমিদার।

দুর্গাপূজার সময়েও লক্ষ্মীকান্তের পুত্র এবং তাঁর জায়গিরের দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য প্রজাসাধারণ বড়িশার কাছারিবাড়িতে আত্মীয়স্বজনের মতো পাঁচদিন উপস্থিত থাকতেন। আনন্দ করতেন। নির্বিকারে পূজার বিভিন্ন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে নিজেদের বাড়ির মতো নিঃসঙ্কোচে কাজকর্ম করতেন। এদের অনেককে 'টহলদার' বলা হত। দুর্গাদেবী বিসর্জিত হতেন সাবর্ণ রায় চৌধুরীর নিজস্ব সিরিটির গঙ্গাঘাটে। বিজয়া দশমীর দিন রামচন্দ্রপুরের টহলেরা কাঁধে করে সপরিবার দুর্গাদেবীকে সিরিটির গঙ্গাঘাটে ভাসান দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতেন। রামচন্দ্রপুর থেকেই পূজায় বলিদানের জন্য কামার আসতেন। পূজার দিনগুলিতে মোষ, ছাগ, আখ, চাল-কুমড়ো প্রভৃতি বলির প্রথা প্রচলিত হয়।

[ঘ] সমাজ সংস্কার ঃ

বল্লাল সেন যে কুলীনবিচার পদ্ধতি শুরু করেছিলেন, পরে পরে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সমাজে পরিলক্ষিত হতে লাগল। কুলাচার্য বা ঘটকগণ কুলীনবিচার প্রক্রিয়াটি ক্রমশ নিজেদের আয়ত্তে করে নিলেন। কুলীনের সমস্ত গুণের অভাব থাকলেও উৎকোচ্ আর অর্থলোভে ঘটকগণ তাঁকে কুলীন বলে স্বীকৃতি দিতে লাগলেন।

লক্ষ্মীকান্তের আমলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে মহাবিক্রমশালী দেবীবর নামক একজন কুলাচার্য বা ঘটক অতিরিক্ত উৎকোচলোভী এবং স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। তিনি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণকে বিভিন্ন 'মেল' বা 'সম্প্রদায়ে' বিভক্ত করলেন। এইগুলির মধ্যে

'ফুলিয়া মেল', 'খড়দহ মেল', 'বল্লভী মেল' এবং 'সর্বানন্দী মেল' প্রধান ছিল। অর্থলোভী দেবীবর বিধান দিলেন,—যে পরিবার একবার কুলীন হয়েছেন—সে-পরিবার বরাবর কুলীন থাকবেন। যেসব পরিবার 'কুলীন মেল' প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা চরিত্রহীন, মাতাল, চোর হলেও তাঁদের কৌলীন্যচ্যুতি ঘটবে না। তবে কুলীনে-কুলীনে মেল রক্ষা না করে পুত্র-কন্যার বিবাহাদি দিলে বা নিজেরা বিবাহ করলে কৌলীন্যচ্যুতি ঘটবে। ফলে সমাজে কুলীনের ঘরে বহুবিবাহ প্রথা চালু হল। অর্থলোভে বা সমাজে কৌলীন্য বজায় রাখতে পুরুষ শতাধিক বিবাহ করতেও পিছ্‌পা হতেন না। কুলীন পাত্রের অর্থলিপ্সা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বংশের কৌলীন্য রক্ষার জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা সর্বস্ব খুইয়ে অর্থসংগ্রহ করে কুলীন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হতেন। সে-পাত্র আশি বছরের বৃদ্ধ হলেও সমাজে অচল নয়। এর ফলে গরিব গৃহস্থের কন্যাগুলি দুঃখদুর্দশার শিকার হতে লাগলেন। আর পিতামাতা সর্বস্ব খুইয়ে কন্যার কুলীন ঘরে বিয়ে দিয়ে নিজের কৌলীন্য রক্ষা করতে গিয়ে পথের ভিখারি হতে লাগলেন।

আশি বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে আট বছরের বালিকার বিবাহ দেওয়ার দৃষ্টান্ত সমাজে ভুরি ভুরি মিলতে লাগল। ফলে নারীসমাজ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত এবং জীবন-সুখে বিড়ম্বিত হতে লাগলেন। সমাজ এক অন্ধকারময় নির্মম প্রথার মধ্যে চলতে লাগল।

লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ কুলীন প্রথার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু কৌলীন্যের নামে এই বদমায়েসির বিপক্ষে ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর পিতা কামদেব ব্রহ্মচারীর মতো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে কৌলীন্যচ্যুত করায় লক্ষ্মীকান্ত ইতিমধ্যে ক্ষুব্ধ ছিলেন। কুলীন বংশজাত না হওয়ার জন্য তাঁকেও নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কন্যার পাণিগ্রহণ করতে হয়েছিল। এইসব ব্যাপারে দেবীবরের প্রতি লক্ষ্মীকান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সমাজের এই দুর্নীতি এবং নারীজীবনের এই দুর্দশা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল। ব্রাহ্মণ সমাজের ধর্মীয় এবং নৈতিক অধঃপতন, বিধবা রমণীদের চোখের জল, তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা, অর্থলোভী ঘটকদের এই ভয়ংকর মাত্রাহীন অত্যাচার দেখে ন্যায়পরায়ণ, রুচিশীল মানবদরদি লক্ষ্মীকান্তের অন্তর সমাজের এই কুসংস্কার দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ এবং ঐশ্বর্যের জন্য লক্ষ্মীকান্ত অনেক শ্রেষ্ঠ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কৌলীন্য নামক এই চরম সামাজিক ব্যাধির নিরাময়কল্পে দেবীবরের গতিরোধ করার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হলেন।

তখন দেবীবর কুলীনসভায় যোগদান করতে গেলে বহু হাতি-ঘোড়া, উট, পালকি, লোকলস্কর তাঁর অনুগামী হত। কোনো রাজকীয় সমাবেশেও এরূপ চিত্র দেখা যেত না। যেসকল গ্রামের মধ্য দিয়ে দেবীবরের সাঙ্গোপাঙ্গগণ যেতেন, সেই গ্রামের ব্রাহ্মণ-

কায়স্থগণকে তাঁর সঙ্গের প্রত্যেককে উৎকৃষ্ট আহারাদি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আপ্যায়ণ ও আতিথেয়তা করতে হত।

লক্ষ্মীকান্ত তাঁর জমিদারির মধ্যে দেবীবরের শোভাযাত্রা বন্ধ করার প্রয়াসী হলেন। হালিশহরের নিকট কাঞ্চনপল্লি ছিল লক্ষ্মীকান্তের হাভেলি সরকারের অধীন। এই কাঞ্চনপল্লিতে দেবীবর সভা করতে এলে লক্ষ্মীকান্ত প্রবল বাধা দিয়ে বন্ধ করলেন।

দেবীবর ক্ষিপ্ত হয়ে বেদগর্ভের বংশের ঢাকা বিক্রমপুরের বেগের গাঙ্গুলী বংশের সন্তান চতুর্দশ পুরুষ রাঘবকে তাঁর বিবাহের সময় তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ কুলীনের' মর্যাদা দিলেন। রাঘব গঙ্গোপাধ্যায় নিজ গ্রামেই বর্ধিষ্ণু বটব্যাল পরিবারের ঘরজামাই হয়েও দেবীবর কর্তৃক প্রথম শ্রেণির কুলীন বলে ঘোষিত হলেন। রাঘব জ্ঞাতি হলেও এই বংশ লক্ষ্মীকান্তের প্রতি হিংসাপ্রবণ এবং শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। দেবীবর আরও ঘোষণা করলেন যে কোনো কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবার লক্ষ্মীকান্তের চার কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন না। লক্ষ্মীকান্তের পুত্রগণের বিবাহও কুলীন ঘরে হবে না।

লক্ষ্মীকান্তের নিকট এসব শাপে বর হল। লক্ষ্মীকান্ত মূলত চেয়েছিলেন সমাজের এই কুপ্রথা দূর হোক। কুলীন হওয়ার মোহ তাঁর ছিল না। তা থাকলে তিনি দেবীবরকে প্রভূত উৎকোচ প্রদান করে শ্রেষ্ঠ কৌলীন্যের খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন। সমাজ সংস্কার করাই যাঁর লক্ষ্য লোভ তাঁকে কখনোই গ্রাস করতে পারে না। বিচক্ষণ, ব্যক্তিত্ব পরায়ণ লক্ষ্মীকান্ত অর্থের লোভের নিরাময় করতে অর্থেরই লোভ দেখালেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো। তিনি তাঁর কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি আর নগদ অর্থ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তৎকালীন-ফুলিয়া মেল, খড়দহ মেল, বল্লভী মেল এবং সর্বানন্দী মেল—এই উৎকৃষ্ট চার মেলের ঘরে চার কন্যার বিবাহ দিলেন। কন্যাদের বিবাহ দিয়ে তিনি তালুক-মুলুক প্রদান করে জামাতাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। লক্ষ্মীকান্তের চার জামাতার মধ্যে কেউ আর দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।

তখন ঘটকবৃন্দ এবং সমাজ সংস্কারক লক্ষ্মীকান্ত ও তাঁর সমর্থকবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল। সর্বত্র লক্ষ্মীকান্তের পক্ষ নীতিগতভাবে সমাজে স্বীকৃত হল। দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা দুহাত তুলে লক্ষ্মীকান্তকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তাঁদের কন্যারা নীরবে গৃহকোণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন এবং লক্ষ্মীকান্তের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন।

লক্ষ্মীকান্ত তাঁর সাত পুত্রের বিবাহও সম্ভ্রান্ত উচ্চ কুলীন পরিবারে দিলেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর "সম্বন্ধ নির্ণয়" গ্রন্থে কুলনাশের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্তের সম্পর্কের বিষয় তিনি অনেক স্থানে অনেকভাবে প্রকাশ করেছেন। তার কয়েকটি ছত্র এখানে উল্লেখ করা যাক।—

লক্ষ্মীর অতুলবিত্ত রায়চৌধুরী খ্যাতি।
কন্যাদানে কুলনাশে কুলের দুর্গতি॥
ভাগিনেয় উপানৎ-বহ্ এই স্পর্দ্ধায়।
শ্রেষ্ঠ কুলচূর্ণ করে অবলীলায়॥
কুলীনের মাতামহ্ হয়ে কুলপতি।
কুলভঙ্গেও তবু গোষ্ঠীপতির খ্যাতি॥
যতকালে কালীঘাটে কালীকার স্থিতি।
লক্ষ্মীনাথে কুলভঙ্গে সাবর্ণের মতি॥

....

....

ক্রমে জ্ঞাতি কুটুম্বদের যতেক বৃত্ত।
কুলীনের কুলনাশে সব হল প্রবৃত্ত॥

....

....

দেবীবর প্রমুখ অর্থলোভী ভ্রষ্ট ঘটকদের অত্যাচারের একান্ত বিরুদ্ধে লক্ষ্মীকান্ত সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। 'মেল' ও 'কুলের' নামে তাঁরা বহুবিবাহ, জোর করে অর্থসংগ্রহ, অন্যায়ভাবে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের অবহেলা, বৈধব্য যন্ত্রণা ইত্যাদি অনাচারের তিনি প্রতিবাদ করতে লাগলেন। পরে পরে লক্ষ্মীকান্তের বংশধরগণ হালিশহর, নিমতা-বিরাটি, উত্তরপাড়া, গাঙ্গুড়, পানিহাটি, মেদিনীপুরের খেপুত প্রভৃতি স্থানে যিনি যেখানে গিয়ে বসবাস করেছেন—সেখানেই কুলীন ব্রাহ্মণদের বসতি গড়ে উঠেছে।

অবশেষে পরাজিত দেবীবর একটা সমঝোতায় এলেন। তিনি 'ভগ্নকুলীন' নামক একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন। ফলে লক্ষ্মীকাণ্ডের জামাতা বংশগুলি 'ভগ্নকুলীন' বলে গণ্য হলেন। 'ভগ্নকুলীন' পরিবারের সহিত বিবাহ্ সম্পর্ক গড়ে উঠলেও মুখ্য কুলীনদের কৌলীন্যচ্যুতি ঘটবে না। এছাড়া রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীকে সমাজের শিরোমণি এবং গোষ্ঠীপতি বলে ঘোষণা করা হল। সকল কুলীন পরিবার লক্ষ্মীকান্তকে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। এইভাবে সমাজের 'মেল প্রথা' নামক এই কুপ্রথার অবলুপ্তি ঘটায় সমাজসংস্কারক লক্ষ্মীকান্ত মহা খুশি হলেন।

আরও প্রায় দুশো বছর পরে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ্ প্রথা লোপ করে, বিদ্যাসাগর অক্ষতযোনি বাল্যবিবাহের বিবাহ্ প্রথা প্রবর্তন করে যে সমাজ সংস্কার করেছিলেন—সাবর্ণ বংশধর রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী ওইরকম সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তারও দুশো বছর পূর্বে সপ্তদশ শতকেই লড়াই শুরু করে গেছলেন। লক্ষ্মীকান্তই সেকারণে বঙ্গদেশের প্রথম সমাজসংস্কারক।

[ঙ] সন্তানগণ ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—লক্ষ্মীকান্তের সাতটি পুত্র এবং চারটি কন্যা। প্রত্যেক পুত্র এবং কন্যার তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন সম্ভ্রান্ত কুলীন পরিবারে। তাঁর জামাতাগণ প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং অর্থাদি পাওয়ার ফলে তখনকার কুলীনদের মতো অর্থলোভে তাঁরা আর একাধিক বিবাহ করেননি। পুত্রগণও পিতার নির্দেশে সৎচরিত্র এবং ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ হিসেবে জীবনযাপন করেছেন। লক্ষ্মীকান্তের প্রবর্তিত নীতি-নিয়ম, প্রজাবাৎসল্য, ধর্মাচরণ প্রভৃতি সামাজিক সৎগুণগুলি কেবল তাঁর পুত্রগণ নন, তাঁর 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী' বংশের প্রত্যেক বংশধর আজও ওইসব গুণাবলি নিজ নিজ চরিত্রে অনুসরণ করতে যেন বদ্ধপরিকর।

লক্ষ্মীকান্তের পরিবারের সহিত পুত্রকন্যাদের বিবাহ দিয়ে যেসব পরিবার 'ভঙ্গ কুলীন' হয়েছিলেন, লক্ষ্মীকান্ত সেইসব পরিবারকে দেবীবর কর্তৃক 'কুলীন' বলে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দেবীবর এবং তাঁর অনুচরবর্গ লক্ষ্মীকান্ত এবং তাঁর বংশধরগণকে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীপতি বা সমাজের নেতা হিসাবে সশ্রদ্ধ প্রণাম করতেন এবং সম্মান জানাতেন। লক্ষ্মীকান্তের দৌহিত্রবর্গ নিমতা, বিরাটি, বড়িশা, হালিশহর, উত্তরপাড়া, পানিহাটি প্রভৃতি স্থানে "সাবর্ণ রায় চৌধুরী দৌহিত্র" বংশজাত কুলীন ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হতে লাগলেন। দৌহিত্রগণের মধ্যে অনেকে ধনশালী হয়েছেন এবং পরে সামাজিক ও সরকারি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

একটা কথা প্রথমেই স্বীকার করছি—"সাবর্ণ রায় চৌধুরী" বংশের সমস্ত বংশধরের কুল পঞ্জিকা এখনও সংগৃহীত হয়নি। এমনকি অনেকের জীবনবৃত্তান্তও এ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। সেগুলি সংগ্রহ করার দায়িত্ব অবশ্যই থেকে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে লক্ষ্মীকান্তের যেসব বংশধর বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মালদহ, বসিরহাট, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে স্থিতি হয়ে বসবাস করছেন, তাদের কথাও উল্লেখ করা সম্ভব হল না। বর্তমানে 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী' পরিবারের বংশধর এবং দৌহিত্রগণ কেবল বাংলা বা ভারতে কেন—পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়ে বসবাস করছেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

গ্রন্থে যে কুলপঞ্জিকা সংযোজিত হয়েছে, তাতে বেদগর্ভের অধস্তন একবিংশ পুরুষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন করে বংশধরের নাম উল্লেখ করা আছে। এর অর্থ এই নয় যে তাঁদের প্রত্যেকের মাত্র একটি করে পুত্রসন্তান ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে একাধিকও ছিলেন। কিন্তু সঠিক বিবরণ ও তথ্য না পাওয়ায় যিনি উল্লেখযোগ্য এবং যাঁর তথ্য পাওয়া গেছে কেবল তাঁর নামই উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা কেবল কত পুরুষ এবং বংশধারা কীরূপ তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদগর্ভের অধস্তন অন্যান্য বংশধরের বিবরণ দেওয়ার দায়িত্ব উপেক্ষা করা যায় না।

জমিদারির কাজকর্ম শিখিয়ে দ্বাবিংশ পুরুষ রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী বিভিন্ন মৌজা-মহলের কাছারির ভার তাঁর পুত্রদের অর্পণ করলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৩তম পুরুষ রাম রায় (১৫৯০-১৬৫০) এবং তাঁর বংশধরগণ মূলত হালিশহরে বাস করতেন। দ্বিতীয় পুত্র গৌরীকান্ত (১৬০০-৬৯) এবং তাঁর পুত্রগণ বেশিরভাগ সময় বাস করতেন বিরাটিতে। তৃতীয় পুত্র গোপাল রায় এবং কনিষ্ঠ পুত্র মহাদেব রায় হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার জমিদারির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম রায় মাঝেমধ্যে তাঁদের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে এবং পরামর্শ দিতে আসতেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে গোপাল রায় উত্তরপাড়ায় একটি কাছারিবাড়ি নির্মাণ করেন।

লক্ষ্মীকান্তের চতুর্থ পুত্র বীরেশ্বর রায় পূর্ববঙ্গের বেগে (বেগাই) অঞ্চলে গিয়ে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'চক্রবর্তী' উপাধি পান। বর্তমানে শিলচরে বীরেশ্বর রায়ের (চক্রবর্তী) বংশের একটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম পুত্র কৃষ্ণকান্ত রায়ও অন্যত্র জমিদারি লাভ করে 'সিংহ' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। কৃষ্ণকান্ত রায়ের (সিংহ) বংশের এ পর্যন্ত তেমন কিছু তথ্য পাওয়া যায়নি। ষষ্ঠপুত্র গোপী রায় শিয়ালদহ, তেঘড়িয়া, বেলঘড়িয়া, বারাকপুর, বারাসাত প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারি দেখাশোনা করতে থাকেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি, কনিষ্ঠ বা সপ্তম পুত্র মহাদেব রায় তৃতীয় পুত্র গোপাল রায়ের সঙ্গে হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার জমিদারি দেখাশোনা করতেন।

২৫তম পুরুষ রামেশ্বর রায় (১৬৭৪-১৭৩৯) মালদহতে জমিদারি দেখাশোনা করতেন। রামেশ্বর রায় লক্ষ্মীকান্তের প্রপৌত্র এবং বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামেশ্বরের পুত্র শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী চাঁচোলের দোল-উৎসবের জন্য সুপরিচিত। তাঁর কন্যার সঙ্গে উত্তরপাড়ার মনোহর মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

লক্ষ্মীকান্ত তাঁর কোনো পুত্রকে জমিদারি ভাগ করে দেননি। প্রত্যেকেই একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছিলেন। আদায়ীকৃত রাজস্ব সকলেই পিতা লক্ষ্মীকান্তকে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় বড়িশার প্রধান কাছারিবাড়িতে জমা দিতেন। সেই সঙ্গে দুর্গোৎসবের আনন্দে এবং পূজা-অর্চনায় সকলে অংশগ্রহণ করতেন। সকলেই পিতামাতার প্রতি সমান ভক্তিশীল ছিলেন। ভ্রাতাদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন। প্রজাদের প্রতিও সকলে সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য কোনো জোরজুলুম বা মামলা করতে হত না। প্রজাগণ সদিচ্ছায় রাজস্ব আদায় দিতেন। কোনো কারণে প্রজারা অসুবিধায় পড়লে লক্ষ্মীকান্তের পুত্রগণ তাঁদের প্রতি ক্ষমাশীল ছিলেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি লক্ষ্মীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৩ম পুরুষ রামকান্ত কুমারহট্ট-হালিশহরে বসতি স্থাপন করেন। এখানে বাস করেই তিনি জমিদারি দেখাশোনা করতেন।

রামকান্তের পুত্র ২৪তম পুরুষ জগদীশ বেশ করিতকর্মা এবং ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যাধর হালিশহরের সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম।

২৫তম পুরুষ বিদ্যাধর রায় চৌধুরী (১৬৪০-১৭২০) হালিশহরে অনেকগুলি কর্ম-নিদর্শন রেখে গেছেন। তিনি এককথায় ধার্মিক এবং সমাজসেবী ছিলেন। স্থানীয় তালুকদাররূপে সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে তখন অক্ষুণ্ণ ছিল। রায় চৌধুরীদের গুণগাথা এবং কীর্তিকলাপ আজও হালিশহরের আকাশ-বাতাসে-মাটিতে মিশে আছে।

বিদ্যাধর রায় চৌধুরী হালিশহরে শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম-উপাসনার জন্য তিনটি দেবস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবের গলির মন্দিরে বুড়ো শিব, চৌধুরীপাড়ার শ্যামরাই এবং তাঁর মন্দির প্রাঙ্গণে দোল-উৎসবের সূচনা করেন। বাজারপাড়ায় ভাগীরথীর তীরে তিনি কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। কালিকাদেবীর নাম অনুসারে ওই এলাকা 'কালিকাতলা' নামে প্রসিদ্ধ। এই কালিকাদেবীই পরে বলিদাঘাটায় স্থানান্তরিতা হয়ে হালিশহরের সিদ্ধেশ্বরী দেবী নামে পূজিতা হয়ে আসছেন। দেবীর পূজা-অর্চনা এবং সবকিছু ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশ বলিদাঘাটার চট্টোপাধ্যায় পরিবারকে দেবত্র সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই বিদ্যাধর দয়ালু এবং দানশীল ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে গা থেকে গয়না খুলে কন্যার বিবাহ নির্বাহ করার জন্য দিয়েছিলেন। এই দানশীল, ধার্মিক, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ব্রাহ্মণের প্রতি প্রত্যেকেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রজারঞ্জক ভূস্বামী হিসেবে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল।

পূর্বে যে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কথা উল্লেখ করলাম, তাঁর মূর্তিনির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনি আছে।

বিদ্যাধর প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গায় স্নান করতেন এবং স্তব-স্তোত্র উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে করতে বাড়ি ফিরতেন। একদিন গঙ্গাস্নান করার সময় তিনি একটি শিলাখণ্ডের স্পর্শ শরীরে অনুভব করলেন। কোনো গুরুত্ব না দিয়ে তিনি স্নান সেরে যথারীতি বাড়ি ফিরে এলেন। তিনি একথা প্রায় ভুলেই গেছলেন। হঠাৎ দুদিন পরে দেবী সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যাধরকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন,—

"বিদ্যাধর, গঙ্গার মধ্যের ওই শিলা তুলে এনে মূর্তি তৈরি করে সিদ্ধেশ্বরী নামে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।"

পরদিন সকালে দৈবযোগে এক অন্ধ ভাস্কর এসে বললেন, "গঙ্গা থেকে পাথর তুলে আনুন। আমি সিদ্ধেশ্বরী মাতার মূর্তি তৈরি করব।"

বিস্মিত বিদ্যাধর প্রশ্ন করলেন, "তুমি সেই শিলাখণ্ডের কথা জানলে কী করে? আর তুমি তো অন্ধ, তুমি কীভাবে মাতৃমূর্তি নির্মাণ করবে?

অন্ধ ভাস্কর সহাস্যবদনে বললেন,—"মা আমায় স্বপ্নে বলেছেন। দেখা দিয়েছেন। আমি সেইমতো মায়ের মূর্তি গড়ব।"

অতঃপর গঙ্গা থেকে সেই শিলাখণ্ড তুলে আনা হল। সেটি উন্নতমানের অমূল্য কষ্টিপাথর। কালোপাথরে সিদ্ধেশ্বরী মাতার অপরূপ মূর্তি গঠিত হল। দেবীর সে কি নয়নভোলানো জ্যোতি! শ্বেতপাথরের শিবের ওপর সিদ্ধেশ্বরী দেবী দণ্ডায়মানা। উদ্বৃত্ত কষ্টিপাথর থেকে বিদ্যাধর ওই অন্ধ ভাস্করের দ্বারাই একটি কৃষ্ণমূর্তি এবং একটি শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে হালিশহরে প্রতিষ্ঠা করলেন। হালিশহরে এইভাবে শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয় ঘটল। কুমারহট্ট-হালিশহরের সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশধরগণ শাক্ত ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তাঁরা যে বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্মের প্রতিও প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ—বিদ্যাধর রায় চৌধুরী তা প্রমাণ করলেন।

বিদ্যাধর রায় চৌধুরী ছিলেন দিল্লির মুঘল সম্রাট আরঙ্গজেবের সমসাময়িক।

বিদ্যাধরের কালে সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের একটি মহা বিপর্যয় ঘটে গেল। সংক্ষেপে সে প্রসঙ্গ আলোচনা করছি।

১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারী জোব চার্নক পারা রোগে কলকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তারপর জন গোল্ড সব্রো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তা নিযুক্ত হলেন। তিনিও অল্প সময়ের মধ্যেই মারা গেলেন। তখন ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে জোব চার্নকের জামাতা চার্লস্ আয়ার কোম্পানীর কর্তৃত্বপদ লাভ করেন। তাঁর সময়ে বাংলার শাসক আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্-উস্-সান্। আর হুগলির তৎকালীন শাসনকর্তা ছিলেন জৈনুদ্দীন খাঁ ওরফে জুতি খাঁ।

সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের আমলে বর্ধিষ্ণু কলিকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুরের প্রতি ইংরেজ কোম্পানি বহুদিন ধরে ব্যবসায়িক স্বার্থে আকৃষ্ট হয়ে আসছিল। কিন্তু এইসব স্থানে পা রাখার সুযোগ পাচ্ছিল না। এখন তাঁরা অর্থলোভী জুতি খাঁর মাধ্যমে ষোলো হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে শাহজাদা আজিম-উস-সানের বা আজিমুদ্দিনের নিকট থেকে গোবিন্দপুর, কলিকাতা এবং সুতানুটি গ্রাম তিনটির প্রজাস্বত্ব ক্রয় করার অনুমতিপত্র আদায় করে আনলেন।

শাহজাদা আজিম্-উস্-সান ইংরেজ কোম্পানিকে গোবিন্দপুর, কলিকাতা এবং সুতানুটির প্রজাস্বত্ব বিক্রি করার ফরমান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোগল দরবার থেকে বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর নিকট এক গোপন নির্দেশ মারফৎ উক্ত তিনটি গ্রাম ইংরেজদের হস্তান্তর না করার পরামর্শ এল।

সাবর্ণ চৌধুরীগণ মহা সঙ্কটে পড়লেন। একদিকে শাহজাদার ফরমান, অপরদিকে

মোগল দরবারের নবাবের নিষেধের পরোয়ানা। সাবর্ণ চৌধুরীগণ ওই গ্রাম তিনটির জমিদার। তাঁরা কেবল রাজস্ব আদায়কারী এবং জমির স্বত্বভোগাধিকারী। ফলে তাঁরা প্রকৃত মালিক নন। বাংলার নবাবও গ্রাম তিনটি বিক্রয় করতে সম্মত নন। এসব কারণে হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রায় একবছরকাল অতিবাহিত হল, সাবর্ণ বংশধরগণও ইংরেজদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। অবশেষে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁরা এক মোক্ষম মতলব আঁটলেন। গোপন বৈঠকে ঠিক হল—এমনভাবে দলিল রচনা করা হবে যা সইসাবুদ হবে যাতে ইংরেজরা ভাববে তাঁরা প্রজাস্বত্ব পেলেন, অথচ আইনত তা হবে ত্রুটিপূর্ণ।

সাবর্ণ চৌধুরীগণের এই মতলব কার্যকারী করতে আইনত কোনো বাস্তব অসুবিধা দেখা গেল না। কারণ তখন সাবর্ণ চৌধুরীগণ উক্ত এলাকার শুধু 'হর্তা-কর্তা-বিধাতা' নন, তাঁরা একাধারে বিক্রি কোবালার রেজিস্টার বা নিবন্ধক. তহশিলদার, মজুমদার, কাজি-ইমাম অর্থাৎ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। ফলে নাবালক ও নবীনদের দ্বারা গোবিন্দপুর, কলিকাতা, সুতানুটি হস্তান্তরের কোনো বাস্তব অসুবিধা দেখা গেল না।

১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর তারিখে গোবিন্দপুর, কলিকাতা, সুতানুটি—অর্থাৎ ডিহি কলিকাতার (সমষ্টিগত কলিকাতার) প্রজাস্বত্ব (Right to Rent) বিক্রি কোবালা হয়ে গেল মাত্র তেরোশো টাকায়। এটা একপ্রকার ইজারা বা Lease। এইভাবে সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার দুকূলই রক্ষা করলেন।

এই বিক্রি কোবালার দলিল হালিশহরেই লেখা হয়েছিল,—এরূপ শোনা যায়। অবশ্য সম্পাদন এবং স্বাক্ষর দান হয়েছিল বড়িশার সাঁঝের আটচালায়। সেজন্য এই সাঁঝের আটচালা একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান। উক্ত দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন রাম রায় এবং গৌরী রায়ের পাঁচ বংশধর।

তাঁরা হলেন—

(১) রাম চাঁদ—[রাম রায় → জগদীশ → বিদ্যাধর → রামচাঁদ।]

(২) মনোহর রায়—[রাম রায় → জগদীশ → রঘুদেব → বাসুদেব→ মনোহর।]

(৩) রাম ভদ্র— [গৌরী রায় → শ্রীমন্ত → কেশব রাম → রামদেব → রাম ভদ্র।]

(৪) প্রাণ— [গৌরী রায় → কুলেশ্বর → প্রাণ।]

(৫) মনোহর সিংহ— [গৌরী রায় → গন্ধর্ব → মনোহর সিংহ।]

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ৩৯ নম্বর ডকুমেন্টের ২৪০৩৯ সংখ্যার পাণ্ডুলিপিতে উক্ত বিক্রি কোবালা রক্ষিত আছে।

নীচে ওই বিক্রির কোবালার ফারসি, ইংরেজি এবং বাংলা অনুলিপি উল্লেখ করা হল।

ফারসি ভাষায় লেখা দলিল
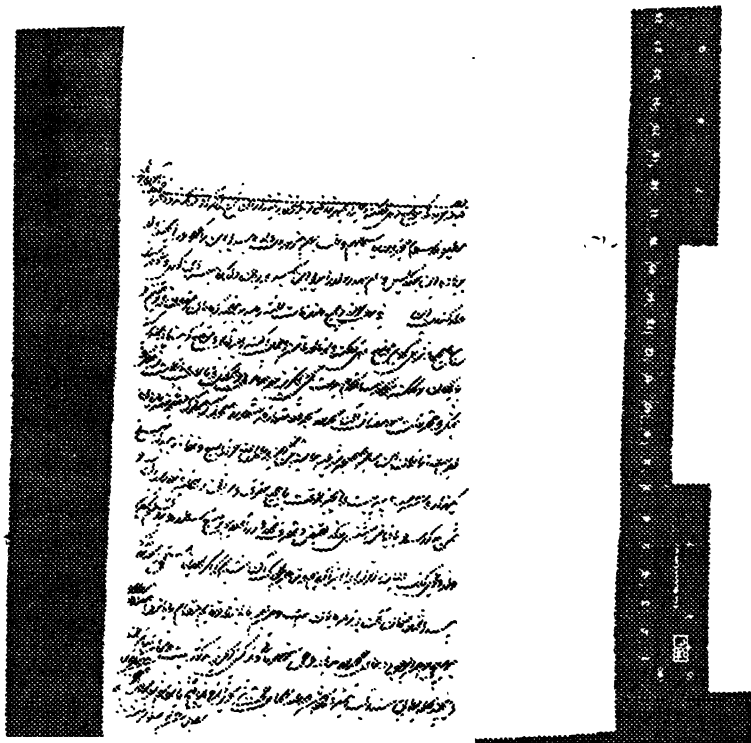
ইংরেজি ভাষায় লেখা উক্ত দলিল

"We submissive to Islam, declaring our names and descent (viz.) Manohar Ray, son of Basdeo, the son of Raghu and Ramchand, the son of Bidyadhar, son of Jagdis, and Ram Bhadra, the son of Ram Deo, son of Kesu; and Pran, the son of Kulesar, the son of Gauri; and Manohar Singh, the son of Gandarb, the son ditto, "being in a state of legal capacity and in enjoyment of all the rights given by law; avow and declare upon this wise; that we conjointly have sold and made a true and legal conveyance of the village Dihi Kalikatah and

Sutanuti within the jurisdiction of Parganah Amirabad and village Govindpur under the jurisdiction of Parganahs Paegan and Kalikatah, to the English Company with rents and uncultivated land and ponds and groves and rights over fishing and woodlands and dues from residents artisans, together with the lands oppertaining thereto bounded by the accustomed notorious and usual boundaries, the same being owned and possessed by us (up to this time) the thing sold being in fact and in law free from adverse rights on litigation forming a prohibition to a valid sale and transfer in exchange for the sum of one thousand and three hundred rupees, coin of this time, including all rights and appurtenances thereof internal and external; and the said purchase money has been transferred to our possession from the possession of the said purchaser and we have made over the aforesaid purchased thing to him and have excluded from this agreement all false claims, and we have become absolute guarantors that if by chance any person entitled to the aforesaid boundaries should come forward, the defence thereof is incumbent upon us and henceforth neither we nor our representatives absolutely and entirely, no manner whatsoever, shall lay claim to the aforesaid boundaries, nor shall the charge of any litigation fall upon the English Company. For these reasons we have caused to be written and have delivered these few sentences that when need arises they may be made evidence. Written on the 15th of the month Jamadial in Hijri year 1110, equivalent to 44th year of the reign full of glory and prosperity. The date is the 10th November 1698 O.S."

উক্ত দলিলের বঙ্গানুবাদ :

'ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে আমাদের নাম ও পরিচয় জানিয়ে (যথাক্রমে মনোহর রায়, পিতা রঘুপুত্র বাসুদেব রায়, রামচাঁদ পিতা জগদীশ পুত্র বিদ্যাধর; এবং রামভদ্র পিতা কেশব পুত্র রামদেব, প্রাণ পিতা গৌরীপুত্র কুলেশ্বর, মনোহর সিং, পিতা গৌরীপুত্র গন্ধর্ব) জানাই আইন অনুযায়ী আমরা যে বিষয়ের অধিকার ও ভোগদাখিলা পেয়েছি তারই মোতাবেক আমরা শপথ করে ঘোষণা করছি, আমরা সম্মেলকভাবে আমিরাবাদ পরগনার ডিহি কলিকাতা ও ডিহি সুতানুটি এবং কলিকাতা-পৈকান পরগনার

গোবিন্দপুর গ্রাম সঠিক কানুনমাফিক স্বাক্ষর পত্র রচনা করে ইংরেজ কোম্পানিকে বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে বিক্রি করে সেখানকার পুকুর, অনাবাদি-আবাদি জমি, বাগবাগিচা সমেত হস্তান্তর করছি। এই এলাকার ভেড়ি, জঙ্গল, শিল্পীমহল্লার কর, জমি যার চৌহদ্দি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত,—তা বিক্রয়ের পূর্ববর্তীকালে আমরা ভোগদখল করে এসেছি। ১৩০০ সিক্কা টাকার পরিবর্তে এই এলাকার স্বত্ব সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায়, যেমন আছে তেমন ভাবে, সব সমেত বিক্রেতার কাছে হস্তান্তর করছি। যদি ভবিষ্যতে অপর কেউ এই মহল্লার দাবিদার হয়ে দাঁড়ায় তবে সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আমরা জামিনদার হতে স্বীকৃত হলাম; এবং সেই দাবির মোকাবিলা করা যে আমাদেরই কর্তব্য তা সুস্পষ্টভাবে জানাই। এই মুহূর্ত থেকে কোনো অবস্থাতেই এই মহল্লার কোনোকিছুর উপর আমাদের অধিকার সাব্যস্ত হবে না। ইংরেজ কোম্পানি, এই বাবাজুত কোনো মামলার সম্মুখীন হলে, তার খরচ-খরচা দিতে বাধ্য হবে না। এই কারণে আমরা আরও লিখি যে প্রয়োজন হলে আমাদের এই লিখিত বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে বিক্রেতা পেশ করতে পারে। —ইতি হিজরি ১১১০, জামাদি মাসের ১৫ তারিখ অথবা মহামান্য দিল্লি সম্রাটের ৪৪ তম শাসনকাল, ইংরেজি ১০ই নভেম্বর, ১৬৯৮ সাল।"

লক্ষ্মীকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রাম রায়ের বংশধরগণ তখন হালিশহরে থাকতেন। কিন্তু গৌরী রায়ের বংশধরগণ নিমতা-বড়িশা অঞ্চলে থাকতেন। বড়িশা অঞ্চলে তখন কেউ কেউ বাস শুরু করেছেন মাত্র। ফলে ইংরেজ কোম্পানির খাজনার পরিবর্তে ডিহি (সমষ্টিগত) কলিকাতা অর্থাৎ গোবিন্দপুর, কলিকাতার এবং সুতানুটি গ্রামগুলির যে মেয়াদি বন্দোবস্ত বা পাট্টা বিক্রয় করা হয়েছিল—সেই বিক্রেতাগণের দলে কেবলমাত্র বড়িশাবাসী সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণ ছিলেন না,—হালিশহরের সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণও ছিলেন।

যা হোক, ইংরেজরা কিন্তু উক্ত গ্রাম তিনটি নিঃশর্তে অধিকারী হলেন না। কারণ নিঃশর্তে বিক্রির পরিবর্তে পাট্টা বা লিজ দেওয়া হল। ইংরেজরা গ্রাম তিনটির পাট্টাদার মালিক। কারণ তাঁরা কেবল মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে প্রজাদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করবেন। ফলে সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের প্রবীণ শরিকগণকে তাঁদের বার্ষিক খাজনা ১২৮১ টাকা ১৪ আনা আদায় দিতে হত।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে তৎকালীন বাংলার নবাব সিরাজকে পরাজিত করার পর ইংরেজরা খাজনা আদায় দেওয়া বন্ধ করেন। অবশ্য মামলা করে সাবর্ণ চৌধুরীগণ তাঁদের খাজনা বুঝে নিয়েছিলেন—

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি—গোবিন্দপুর, কলিকাতা, সুতানুটি মৌজাগুলির জন্য জায়গিরদার সাবর্ণ চৌধুরীগণকে যে বার্ষিক খাজনা আদায় দিয়ে গেছেন—Consultation Book-এর তারিখ অনুযায়ী তার একটা হিসেব প্রদান করা হল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটি মৌজাগুলির জন্য জায়গিরদার সাবর্ণ চৌধুরীকে আদায় দেওয়া খাজনার তালিকা।

(Consultation Book-এর তারিখ অনুযায়ী)

১৭০৩ খ্রি.

তারিখ		প্রাপক	টাকা	আনা	পাই
১৭০৪, ফেব্রুয়ারি ১২	প্রাপক	রাজার জায়গিরদারকে	৯০	০	০
১৭০৪, সেপ্টেম্বর ৪	”	জিৎমল করোরি রাজার জায়গিরদার (Jetmal Karori the Prince's Jagerdar)	৩০	০	০
১৭১২ খ্রি.					
১৭১৩, জুলাই ৬	”				
		লক্ষ্মীনারায়ণ (পি.৩)	৭০	০	০
		১৭১৩ খ্রি.			
এপ্রিল ২৮	”	শিউ প্রসাদ (এ.১)	—	—	—
এপ্রিল	”	লক্ষ্মীনারায়ণ (পি.১)	—	—	—
		১৭১৭ খ্রি.			
১৭১৮, মার্চ ২৪	”	রত্নেশ্বর (সি.৩)	৩০	০	০
এপ্রিল ১০	”	শুকদেব (এ.১)	৩২৫	০	০
এপ্রিল ২৪	”	রত্নেশ্বর (সি.১)	৩৩	০	০
মে ১২	”	মহাদেব (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ১১	”	শুকদেব (এ.২)	৩২০	৮	০
আগস্ট ১৮	”	বিনোদরাম (সি.২)	৩৭	৬	০
অক্টোবর ৯	”	মহাদেব (পি.২)	৭১	০	০
ডিসেম্বর ৮	”	শুকদেব রায় (এ.৩)	৩২৫	০	০
১৭১৯, জানুয়ারি ৫	”	বিনোদরাম (সি. ৩)	৩০	০	০
		” (পি. ৩)	৭০	০	০
		মোট	১২৮১	১৪	০

			টাকা	আনা	পাই
১৭১৯, এপ্রিল ৯	প্রাপক	শুকদেব রায় (এ.১)	৩২০	০	০
মে ৭	”	বিনোদরাম (সি.১)	৩৩	০	০
”	”	বিনোদরাম (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ১৩	”	শুকদেব (এ.২)	৩২০	৮	০
সেপ্টেম্বর ১০	”	রামচাঁদ (পি.২)	৩৩	০	০
”	”	রামচাঁদ (সি.২)	৭১	০	০
ডিসেম্বর ৮	”	শুকদেব (এ.৩)	৩২৫	০	০
”	”	শুকদেব (পি.৩)	৭০	০	০
১৭২০, ফেব্রুয়ারি ৯	”	রামচাঁদ (সি.৩)	৩০	০	০
		মোট	১২৭২	৮	০

১৭২০ খ্রি.

			টাকা	আনা	পাই
১৭২০, এপ্রিল ৪	”	শুকদেব (এ.১)	৩২৫	০	০
জুলাই ২৫	”	রামচাঁদ (সি.১)	৩৩	০	০
”	”	রামচাঁদ (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ১১	”	শুকদেব (এ.২)	৩২০	৮	০
”	”	যুগলকিশোর (পি.২)	৭১	০	০
অক্টোবর ২৪	”	কৃষ্ণরাম (সি.২)	৩৭	৬	০
ডিসেম্বর ১	”	শুকদেব (এ.৩)	৩২৫	০	০
”	”	কৃপারাম (সি.৩)	৩০	০	০
১৭২১, ফেব্রুয়ারি ৪	”	কেশব (পি.৩)	৭০	০	০
		মোট	১২৮১	১৪	০

১৭২১ খ্রি.

			টাকা	আনা	পাই
১৭২১, এপ্রিল ১	”	শুকদেব রায় (এ.১)	৩২৫	০	০
এপ্রিল	”	নিমু রায় (সি.১)	৩০	০	০
”	”	” (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ২১	”	রঘুদেব রায় (এ.২)	৩২০	৮	০
আগস্ট ২৮	”	হুগলি গভর্নমেন্ট (সি.২)	৩৭	৬	০
”	”	হুগলি গভর্নমেন্ট (পি.২)	৭১	০	০
ডিসেম্বর ৯	”	হুগলি গভর্নমেন্ট (এ.৩)	৩২৫	০	০

			টাকা	আনা	পাই
ডিসেম্বর ২১	প্রাপক	হুগলি গভর্নমেন্ট (সি.৩)	৩০	০	০
,,	,,	,, (পি.২)	৭০	০	০
		মোট	১২৭৮	১৪	০

১৭২২ খ্রি.

			টাকা	আনা	পাই
১৭২২, এপ্রিল ১৬	,,	রঘু রায় (এ.১)	৩২৫	০	০
,,	,,	নন্দলাল (সি.১)	৩০	০	০
,,	,,	নন্দলাল (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ২০	,,	হুগলি গভর্নমেন্ট (সি.২)	৩৭	৬	০
আগস্ট ২০	,,	হুগলি গভর্নমেন্ট (পি.২)	৭০	০	০
,, ২৩	,,	হুগলি গভর্নমেন্ট (এ.২)	৩২০	৮	৯
ডিসেম্বর ২০	,,	ব্রজ মল্লিক (এ.৩)	৩২৫	০	০
,, ৩১	,,	হুগলি গভর্নমেন্ট (সি.৩)	৩০	০	০
,,	,,	হুগলি গভর্নমেন্ট (পি.৩)	৭০	০	০
		মোট	১২৭৭	১৪	৯

১৭২৩ খ্রি.

			টাকা	আনা	পাই
১৭২৩, এপ্রিল ২৯	,,	ব্রজবল্লভ (এ.১)	৩২৫	০	০
,,	,,	কৃষ্ণরাম (সি.১)	৩০	০	০
,,	,,	কৃষ্ণরাম (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ২৬	,,	ব্রজবল্লভ (এ.২)	৩২০	৮	৯
সেপ্টেম্বর ১৯	,,	হুগলি গভর্নমেন্ট (সি.২)	৩৭	৬	০
,,	,,	হুগলি গভর্নমেন্ট (পি.২)	৭১	০	০

১৭২৪

			টাকা	আনা	পাই
১৭২৪, জানুয়ারি ৯	,,	ব্রজবল্লভ (এ.৩)	৩২৫	০	০
,,	,,	ব্রজবল্লভ (সি.৩)	৩০	০	০
,,	,,	ব্রজবল্লভ (পি.৩)	৭০	০	০
		মোট	১২৭৮	১৪	৯
মে ১১	,,	The Rivori (রিভোরি)? (এ.১)	৩২৫	০	০
জুন ৮	,,	ব্রজবল্লভ (সি.১)	৩৩	০	০
,,	,,	ব্রজবল্লভ (পি.১)	৭০	০	০

				টাকা	আনা	পাই
	আগস্ট ২৪	প্রাপক	ব্রজবল্লভ (এ.২)	৩২০	৮	৯
	সেপ্টেম্বর ৭	”	ব্রজবল্লভ (সি.২)	৩৭	০	০
	”	”	ব্রজবল্লভ (পি.২)	৭১	০	০
	ডিসেম্বর ১৪	”	ব্রজবল্লভ (এ.৩)	৩২৫	০	০
		”	ব্রজবল্লভ (সি.৩)	৩০	০	০
	”	”	ব্রজবল্লভ (পি.৩)	৭০	০	০
			মোট	১২৮১	৮	৯

১৭২৫ খ্রি.

				টাকা	আনা	পাই
১৭২৫,	এপ্রিল ২৯	”	ব্রজবল্লভ (এ.১)	৩২৫	০	০
	”	”	ব্রজবল্লভ (সি.১)	৩৩	০	০
	”	”	ব্রজবল্লভ (পি.১)	৭০	০	০
	আগস্ট ১৬	”	কৃষ্ণরাম (এ.২)	৩২০	৭	০
	সেপ্টেম্বর ১৮	”	কৃষ্ণরাম (সি.২)	৩৭	৬	০
	”	”	কৃষ্ণরাম (পি.২)	৭১	০	০
	ডিসেম্বর ১৩	”	রাম গোপাল (এ.৩)	৩২৫	০	০
১৭২৬,	জানুয়ারি ৩	”	শুকদেব রায় (সি.৩)	৩০	০	০
	”	”	শুকদেব রায় (পি.৩)	৭০	০	০
			মোট	১২৮১	১৩	০

১৭২৬ খ্রি.

				টাকা	আনা	পাই
১৭২৬,	এপ্রিল ১১	”	রামগোপাল রায় (এ.১)	৩২৫	০	০
	” ২৩	”	শুকদেব রায় (সি.১)	৩০	০	০
	”	”	শুকদেব রায় (পি.১)	৭০	০	০
	আগস্ট ১৫	”	রামদেব রায় (এ.২)	৩২০	০	০
	” ২২	”	শুকদেব রায় (সি.২)	৩৭	০	০
	” ”	”	শুকদেব রায় (পি.২)	৭০	০	০
	ডিসেম্বর ৮	”	রবি রায় (এ.৩)	৩২৫	০	০
	ডিসেম্বর ২৯	”	শুকদেব রায় (সি.৩)	৩০	০	০
১৭২৭,	মে ৮	”	জয়রাম (পি.৩)	৭০	০	০
			মোট	১২৭৭	০	০

			টাকা	আনা	পাই
		১৯২৭ খ্রি.			
১৭২৭, মে ৮	প্রাপক	শুকদেব রায় (এ.১)	৩২৫	০	০
	,,	শুকদেব রায় (সি.১)	৩০	০	০
মে ৮	,,	জয়রাম (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ২১	,,	শুকদেব রায় (এ.২)	৩২০	৭	৯
আগস্ট ২৮	,,	শুকদেব রায় (সি.২)	৩৩	০	০
সেপ্টেম্বর ৪	,,	বাগারুপ রায় (পি.২)	৭০	০	০
ডিসেম্বর ২৮	,,	সেখ আবদুল কালদুদ (এ.৩)	৩২৫	০	০
ডিসেম্বর ,,	,,	সেখ আবদুল কালদুদ (সি.৩)	৩০	০	০
ডিসেম্বর ,,	,,	সেখ আবদুল কালদুদ (পি.৩)	৭০	০	০
		মোট	**১২৭৩**	**৭**	**৯**
		১৭২৮খ্রি.			
১৭২৮, এপ্রিল ২২	,,	সেখ আবুল কুদ্দুস (এ.১)	৩২৫	০	০
এপ্রিল	,,	সেখ আবুল কুদ্দুস (সি.১)	৩৩	০	০
এপ্রিল	,,	সেখ আবুল কুদ্দুস (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ১২	,,	পীর খাঁ (এ.২)	৩২০	০	০
আগস্ট	,,	পীর খাঁ (হুগলি ফৌজদার) (সি.২)	৩৩	০	০
আগস্ট	,,	পীর খাঁ (হুগলি ফৌজদার) (পি.২)	৭০	০	০
ডিসেম্বর ২৪	,,	পীর খাঁ (হুগলি ফৌজদার) (এ.৩)	৩২৫	০	০
ডিসেম্বর	,,	পীর খাঁ (হুগলি ফৌজদার) (সি.৩)	৩০	০	০
ডিসেম্বর	,,	পীর খাঁ (হুগলি ফৌজদার) (পি.৩)	৭০	০	০
		মোট	**১২৭৬**	**০**	**০**
		১৭২৯খ্রি.			
১৭২৯, এপ্রিল ২৮	,,	কৃষ্ণচাঁদ (এ.১)	৩২৫	০	০
,,	,,	রামেশ্বর (সি.১)	৩৩	০	০
,,	,,	রামেশ্বর (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ২১	,,	কৃষ্ণচাঁদ (এ.২)	৩২০	০	০
,,	,,	রামেশ্বর রায় (সি.২)	৩৩	০	০
,,	,,	রামেশ্বর রায় (পি.২)	৭০	০	০

			টাকা	আনা	পাই
ডিসেম্বর ২৯	প্রাপক	কৃষ্ণচাঁদ (এ.৩)	৩২৫	০	০
,,	,,	রামেশ্বর রায় (সি.৩)	৩০	০	০
,,	,,	রামেশ্বর রায় (পি.৩)	৭০	০	০
		মোট	১২৭৬	০	০
		১৭৩০ খ্রি.			
১৭৩০, মে ৪	,,	মানদেব (এ.১)	৩২৬	০	০
মে ২৫	,,	রামেশ্বর রায় (সি.১)	৩৩	০	০
মে	,,	রামেশ্বর রায় (পি.১)	৭০	০	০
আগস্ট ৩১	,,	মামদান সিং (এ.২)	৩২০	০	০
,,	,,	রামেশ্বর রায় (সি.২)	৩৩	০	০
,,	,,	রামেশ্বর রায় (পি.২)	৭০	০	০
		মোট	৮৫৩	০	০
		১৭৫৩ খ্রি.			
১৭৫৩, এপ্রিল ৩০	,,	হুগলি গভর্নমেন্ট (এ.১)	৩২৫	০	০
	,,	(সি.১)	৩৩	০	০
,,	,,	(পি.১)	৭০	০	০

ওপরের হিসাবের তালিকা থেকে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয় যে উক্ত খাজনা কেবলমাত্র রাম রায় এবং গৌরী রায়ের বংশধরগণকেই দেওয়া হয়েছিল।

আরও লক্ষ করা যায়, ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলি কোর্টে জায়গিরদারদের অর্থাৎ সাবর্ণ চৌধুরীদের আর খাজনা আদায় দিচ্ছেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের সঙ্গে সাবর্ণ চৌধুরীগণের মামলা শুরু হয়। মামলার রায় অনুসারে ইংরেজরা পুনরায় কোর্টে খাজনা দিতে শুরু করেন। তবে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের কাছে বাংলার তৎকালীন নবাব সিরাজ পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজদের হাতে অনেক অধিকার চলে যায়। তখন জায়গিরদার সাবর্ণ চৌধুরীগণ ইংরেজদের আর প্রজা বলে মনে করার মতো মানসিকতা হারিয়ে ফেলেন। তবে পরবর্তী বাংলার নবাব মিরজাফর, মিরকাশিমের সঙ্গে বিবাদ-মামলা করে সাবর্ণ চৌধুরীগণ তাঁদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার বাহ্যত চেষ্টা করে গেছেন।

পলাশির যুদ্ধে সিরাজ সিংহাসনচ্যুত হলে মিরজাফর বাংলাতে নবাব হলেন। তিনি লর্ড ক্লাইভকে খুশি করার জন্য ডিহি কলিকাতার আশপাশের যেসব জমি নিয়ে জমিদার

এবং ইংরেজ কুঠিয়ালদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ ও সংঘর্ষ লেগে থাকত সেইসব জমি জায়গির স্বরূপ ইংরেজদের দান করলেন। এই দান আইনসম্মত ছিল না। সেজন্য সাবর্ণ চৌধুরীগণ কোর্ট-অব-ডাইরেক্টার্সের নিকট আবেদন করলেন। অবশেষে দীর্ঘদিন পরে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশের পঞ্চবার্ষিকী-বন্দোবস্তে সাবর্ণ চৌধুরীগণ তাঁদের জমি ফিরে পান।

কিন্তু পুনরায় উলটো উৎপাত শুরু হল। ইংরেজ সরকার তাদের জায়গির প্রাপ্ত জমির ওপর খাজনা ধার্য করলেন। এতে সাবর্ণ চৌধুরীগণ কেউ কেউ (ই খাজনা মেনে নিলেও অধিকাংশ শরিক মেনে নিতে না পারায় পুনরায় অভ্যন্তরীণ বিবাদ শুরু হল। তাঁদের দাবি সাবর্ণ চৌধুরীগণের জমিদারি-সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিষ্কর অর্থাৎ 'বৃত্তি'। তাঁদের সম্পত্তি 'মাল' নয়। কারণ মাল জমির ওপর খাজনা ধার্য করা চলে। যাহোক, এই বিবাদকে কেন্দ্র করে সাবর্ণ চৌধুরীগণ দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। অন্যদিকে সাবর্ণ চৌধুরী ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারগণ ইংরেজদের তাঁবেদারি করে জমিদারি টিকিয়ে রাখলেন এবং নিজেদের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হলেন।

সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণের মধ্যে যাঁরা বড়িশায় বসবাস করতে লাগলেন—তাঁরা "রায় চৌধুরী" পদবি ব্যবহার করতে লাগলেন। এমনকি হুগলি জেলার উত্তরপাড়া, মেদিনীপুর জেলার খেপুত গ্রামে যে শাখা গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন তাঁরাও "রায় চৌধুরী" পদবি ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু অন্যত্র কেউ কেউ কেবল 'রায়' অথবা কেবল 'চৌধুরী',—এমনকি গাঙ্গুলী, চক্রবর্তী ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করতেও শুরু করেন।

এখানে উল্লেখ করা যায়,—লক্ষ্মীকান্তের চতুর্থ পুত্র বীরেশ্বর 'চক্রবর্তী' পদবি এবং পঞ্চম পুত্র কৃষ্ণ রায় 'সিংহ' পদবি অনেক পূর্ব থেকেই ব্যবহার করতেন। ফলে তাঁদের বংশধরগণ ওইসব পদবি দ্বারা পরিচিত হতে থাকেন।

বর্তমানে হালিশহর সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের চারটি পরিবার বসবাস করছেন। তাঁরা সকলেই বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর বংশধর। বিদ্যাধরের তিন পুত্র—রঘুদেব, সন্তোষ এবং দুর্গা রায়। মধ্যম পুত্র সন্তোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোহরের বংশধরগণই মূলত বর্তমানে হালিশহরে বসবাস করছেন।

মনোহরের ছয় পুত্র—দর্পনারায়ণ, উদয়নারায়ণ, রাজকিশোর, রামকানাই, বলাই এবং শ্রীদাম।

পূর্বে উল্লিখিত চারটি সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের মধ্যে দুটি পরিবার দর্পনারায়ণের বংশের, একটি পরিবার রামকানাইয়ের বংশের এবং অবশিষ্ট পরিবারটি বলাই-এর বংশের। প্রায় একশো বছর পূর্বেও হালিশহরে বাইশ ঘর সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার বসবাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের অনেকেই অন্যত্র উঠে গেছেন।

দর্পনারায়ণের বংশের দৌহিত্রগণ বর্তমানে হালিশহরে বাস করেন। তবে উমাচরণের পুত্র প্রথমনাথ হালিশহরের একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র—সুবোধ এবং সুবীর। তাঁদের সকলের বসবাস ছিল বর্তমানে রাধানাথ চৌধুরী লেনের দক্ষিণে।

আরেক বংশধর জিতেন্দ্রনাথ মূলত আইনজীবী ছিলেন। তিনি কিছুদিন হালিশহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। জিতেন্দ্রনাথের পিতার নাম ছিল কালীকমল।

সুবোধ রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—নীরদবরণ এবং অরুণকিরণ। সুবোধ রায় চৌধুরী রাধানাথ রায়চৌধুরী লেনের বাড়ি ও সম্পত্তি বিক্রি করে জি. পি. রোডের ওপর ঘোষাল গলির সংযোগস্থলে বসবাস করতে থাকেন। তিনি শ্রীশ্রীশ্যামরাই দেবতাকে তাঁর নতুন বাড়িতে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁর ছোটো ছেলে অরুণকিরণ রায় চৌধুরীর বাড়িতে শ্রীশ্রীশ্যামরাই আছেন।

মনোহরের পৌত্র বা বলাইয়ের পুত্র কীর্তিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ রায় চৌধুরী অপুত্রক ছিলেন। রাজলক্ষ্মী নামে কেবল তাঁর এক কন্যা ছিলেন। রাজলক্ষ্মী ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁঠালপাড়া নিবাসী সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হয়। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। ফলে রাজলক্ষ্মী ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। অপুত্রক গোবিন্দ রায় চৌধুরী তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সমুদয় সম্পত্তি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে পত্নী নৃত্যকালী দেবীর নামে উইল করে যান। সেই উইলে গোবিন্দ রায় চৌধুরী তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি যে ঋণ রেখে যাচ্ছেন তা পরিশোধ করার কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু জামাতা বঙ্কিমচন্দ্র নিজ অর্থে শ্বশুরের ঋণ শোধ করেন। তখন নৃত্যকালী দেবী তীর্থবাসে যাওয়ার পূর্বে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি জামাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দান করে যান।

সেই দানপত্রের মূল বক্তব্য ছিল—

"..............স্বামী মহাশয়ের দত্ত উইলের লিখিত সম্পত্তি যাহা বিক্রয়ের দ্বারা তাঁহার ঋণ পরিশোধের অনুমতি করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত দেনা তোমার সাহায্যে পরিশোধ হইয়াছে। উইলের লিখিত কোনো সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা পরিশোধ করিতে হয় নাই। এখানে কোনো তীর্থস্থানে বাস করিবার আমার নিতান্ত মানস হইয়াছে। তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ .... ও (তুমি) সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ। অতএব উপরোক্ত সমুদয় সম্পত্তি জমি-জেরাত, বাগ-বাগিচা, পুষ্করণি ইত্যাদি স্বামী মহাশয়ের স্বর্গার্থে তোমাকে দান করিয়া লিখিয়া দিতেছি যে তুমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অত্র দানপত্রের লিখিত সমুদয় সম্পত্তি ভোগদখল করিতে রহ ....।"

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ জামাতা ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম স্ত্রীর কোনো সন্তান ছিল না। দ্বিতীয় স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীও অপুত্রক ছিলেন। তাঁর তিন কন্যার মধ্যে মাত্র একটি কন্যা জীবিত ছিলেন। নাম শরৎকুমারী। কলিকাতার রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। শরৎকুমারী পরে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত হালিশহরের সম্পত্তি হুগলি জেলার সরাই গ্রাম নিবাসী/পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী) ক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বিক্রি করে দেন। অতঃপর ক্ষিতীশচন্দ্রের বংশধরগণ হালিশহরে বসবাস করতে থাকেন।

গোবিন্দ চন্দ্র রায় চৌধুরীর বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একটি রায় চৌধুরী পরিবারের বসতির নিদর্শন রয়েছে। ঠাকুর চরণ রায় চৌধুরীর ছয় পুত্র—জয়কৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিনয়কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, অতুলকৃষ্ণ এবং জীবনকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পুত্র বিজয়কৃষ্ণ হুগলি জেলা আদালতের আইনজীবী ছিলেন। পিতা ঠাকুরচরণ রায় চৌধুরীর বাড়ি সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী লেনের নিকটে।

পঞ্চম পুত্র অতুলকৃষ্ণ (১৮৫৮-১৯৩৫) মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হুগলি কলেজ থেকে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঈশান বৃত্তি প্রাপ্ত অতুলকৃষ্ণ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করেন। এরপর রাজশাহি র‍্যাভেনশ এবং বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (বি.সি.এস.) পাশ করে তিনি ভারত সরকারের কৃষি দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার পদে নিযুক্ত হন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সতীর্থ এবং সহকর্মী ছিলেন। অতুলকৃষ্ণ লন্ডনের রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি অব ইংল্যান্ডের সদস্য ছিলেন। কমিশনার থাকাকালে তিনি বহু পুরোনো নথিপত্র দেখার সুযোগ পান। তাঁর ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন এবং (১) 'গোবরা', (২) 'লক্ষ্মীকান্ত ঃ এ চ্যাপ্টার ইন দি সোসাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' এবং (৩) 'শর্ট হিস্ট্রি অব ক্যালকাটা' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হন। এইসব গ্রন্থ সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের নিকট অমূল্য দলিল স্বরূপ। দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় বেনারস সিটি থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি "রায় চৌধুরী" পদবির মধ্যে 'চৌধুরী' কথাটি বাদ দিয়ে কেবল "রায়' লিখতেন।

অতুলকৃষ্ণ দ্বিতীয় পক্ষে এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি প্রথমা স্ত্রীর কথা জানতে পারার পর বিবাহবিচ্ছেদ করেন। অতুলকৃষ্ণের বংশধরগণ বর্তমানে কলকাতায় বাস করছেন।

ঠাকুরচরণ রায় চৌধুরীর বংশের কেউ এখন হালিশহরে বাস করেন না।

একত্রিশতম পুরুষ অর্থাৎ বিদ্যাধরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ অপর এক জীবনকৃষ্ণ [বিদ্যাধর → রঘুদেব → কালীচরণ → রামশঙ্কর → রামচাঁদ → আনন্দ → জীবনকৃষ্ণ] হালিশহরে একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে হালিশহরে " জে. কে. রায় চৌধুরী লেন" নামে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটি চৌধুরীপাড়া লেনের সহিত বিজপুর রোডকে সংযুক্ত করেছে।

ফেলুনাথ বা গোপীনাথ রায় চৌধুরী হালিশহরের একজন উল্লেখযোগ্য জমিদার ছিলেন। তিনি দানশীল এবং দয়ালু ব্যক্তি হিসেবে প্রজাগণের নিকট পরিচিত ছিলেন।

ফেলুনাথের তিন পুত্র—রাধানাথ, কালীনাথ এবং যজ্ঞেশ্বর।

রাধানাথ রায় চৌধুরী (১৮৪০-১৯১৩) হালিশহরের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছাত্রাবস্থায় অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ হওয়ার পর তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে চুঁচুড়ার হুগলি ফিচার্চ ডাফ স্কুলে নৌকাযোগে ভাগীরথী পার হয়ে প্রতিদিন স্কুলে যেতেন। ওই বিদ্যালয় থেকে তিনি ১৮৭০/৭১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স্ একজামিনেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বাংলা ভাষা ছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

ভারত সরকারের অধীনে তিনি পি. ডব্লিউ. ডি. রোড অ্যান্ড ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হন। তৎকালীন নিয়মানুসারে ৫৫ বছরে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

হালিশহরের জনকল্যাণমূলক প্রভূত কর্মে রাধানাথের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি হালিশহর হিতৈষিণী সভা, পূর্ণিমা ব্রত সমিতি বা গুডউইল ফ্রেটারনিটির সদস্য ছিলেন। জনসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, পড়াশোনা বা সামাজিক কাজকর্মে অর্থসাহায্য করতে তিনি কখনোই কুণ্ঠিত ছিলেন না। কথিত আছে, ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে রাধানাথ রায় চৌধুরীকে মালাচন্দনসহকারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হত। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভায় এবং 'কুমারহট্ট হালিশহর গ্রন্থে' তাঁর আলোকচিত্র এখনও দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের ১৪৮ পৃষ্ঠায় 'পূর্ণিমা ব্রত সমিতি' বা 'হিতৈষিণী সভার' যে পরিবর্তন হয়েছিল তার মধ্যে রাধানাথ রায় চৌধুরীর নামের উল্লেখ রয়েছে।

রাধানাথ রায় চৌধুরীরস্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর নামে হালিশহরে 'রাধানাথ রায়চৌধুরী লেন' নামে একটি রাস্তা রয়েছে। এই লেন পূর্বদিকে চৌধুরীপাড়া শিবের গলি থেকে বের হয়ে পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী লেনে মিলিত হয়েছে। এই লেনের উত্তরদিকে রাধানাথ রায় চৌধুরীর পৈতৃক বসতবাড়ি।

রাধানাথ রায় চৌধুরীর পাঁচ পুত্র—চন্দ্রশেখর (বাল্যে মৃত), জানকীপ্রসাদ। জানকীপ্রসাদ কাঁচরাপাড়ায় পূর্ব রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি কলকাতার কালীঘাটে গিয়ে বসবাস করেন।

রাধানাথ রায় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী। হরপ্রসাদ রায় চৌধুরীও কাঁচরাপাড়ায় রেলওয়ে বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

হরপ্রসাদ রায় চৌধুরীর পাঁচ পুত্র—অনিলকুমার, অজিতকুমার, মনোরঞ্জন, বলরাম (বাল্যে মৃত) এবং সুকুমার। আর দুই কন্যা—পূর্ণশশী ও পারুল।

হরপ্রসাদের বংশধরগণ মোটামুটি হালিশহরে বাস করছেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী (ডাক নাম কেষ্ট) (জন্ম-১৯৩২) বেশ করিতকর্ম এবং উদ্যোগী পুরুষ। তিনি সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের খ্যাতি এবং উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট। ছোটোবেলায় ছাত্রজীবনে কাঁচরাপাড়ার পাঠশালায় পড়ার সময় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েকটি কথা এখনো তাঁর মনে ছবির মতো ভেসে ওঠে। পিতা হরপ্রসাদ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি সপরিবারে হালিশহরে চলে আসেন। তখন দারিদ্র্যের মধ্যেই মনোরঞ্জন হালিশহরে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করেন। কোনোক্রমে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় এবং পিতা হরপ্রসাদের তদ্বিরে হালিশহরের ডি.সি.ও. এস. অফিসে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীর পদে চাকরিতে নিযুক্ত হন। শুরু হয় চাকরিজীবন। চাকরিজীবনে তিনি একজন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় এবং দৌড়বিদ্ হিসেবে বেশ নাম করেন। অনেক স্পোর্টসে তিনি অংশগ্রহণ করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কৃত হন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—১৯৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে বার্ষিক স্পোর্টসে ১০,০০০ মিটার সাইকেল রেসে তৃতীয় স্থান, ১৯৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১০,০০০ মিটার, ৫০০০ মিটার এবং ৩০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এই বছর তিনি ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের নিকট একটি শংসাপত্রও লাভ করেন। এরপর তিনি পুনরায় পড়াশোনার জীবনে ফিরে এসে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনে মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি ঃ সি.ও.এস/বি.আই পদে কাজ করতে করতে ওই বছরেই এম.সি. হয়ে ট্রান্সফার হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সি.ও.পি.এস/পূর্ব ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতায় ক্লার্ক হয়ে ট্রান্সফার হন। এরপর তিনি হেড ক্লার্ক হয়ে সি-ও-পি-এস/জেনারেল সেকশনে পোস্টিং হন। ওই সেকশনে তিনি পাঁচ বছর হেড ক্লার্ক পদে চাকরি করেন। পরে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মনোরঞ্জন রায় চৌধুরীর অবসর গ্রহণের পূর্বে হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যমশায় "Laksmikanta–A chapter in the Social History of Bengal"—ইংরেজি গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন। কিন্তু অর্থাভাবে তিনি সেটি প্রকাশ করতে সক্ষম হননি। মনোরঞ্জন ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে উক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদটি কাঁচড়াপাড়ার রানি প্রেস থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়—তখন অবশ্য হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরলোকগমন করেছেন।

অনেক সমাজসেবামূলক কর্মে মনোরঞ্জন রায় চৌধুরীর গোপন এবং প্রকাশ্য দান/অবদান রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

(১) ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সতেরো হাজার টাকা ব্যয় করে দক্ষিণা কালীর মন্দিরের ছাদটি সংস্কার করে দেন।

(২) ২০০২ খ্রিস্টাব্দের কিরণশশী বালিকা বিদ্যালয়ের (গুরু-মা) উন্নতিকল্পে পনেরো হাজার টাকা দান করেন।

(৩) নাড়াপোরা তলার উন্নতিকল্পে এবং দত্তপাড়া এ্যাথলেটিক ক্লাবকে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে চোদ্দোশো টাকা সাহায্য করা হয়।

(৪) দোলতলা বারোয়ারী সংস্থা, হালিশহর-এর সংলগ্ন জমি ক্রয় করার জন্য ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ হাজার টাকা দান করেন।

মনোরঞ্জন রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—সুব্রত এবং রাজচন্দ্র। আর এক কন্যা—বন্দনা। বন্দনার বিবাহ হয় অরুণ কুমার গোস্বামীর সহিত।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সুব্রত রায় চৌধুরী শিক্ষালাভ করে ইস্টার্ণ রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে রেলওয়ে ড্রাইভারের কাজে নিযুক্ত। তাঁর পত্নী পাপড়ি রায় চৌধুরী একজন বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক মহিলা।

কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী বি.এস.সি এবং ডি.এম.ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাওড়ায় রেলওয়ে বিভাগে কর্মরত। তাঁর পত্নী মিতালী রায় চৌধুরী কলা বিভাগের স্নাতক মহিলা।

মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী হালিশহরের রাধানাথ রায় চৌধুরী লেনে পুত্র প্রভৃতিকে নিয়ে সপরিবারে বসবাস করছেন। তিনি সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।

হরপ্রসাদ রায় চৌধুরীর পঞ্চম পুত্র সুকুমার রায় চৌধুরীও বর্তমানে হালিশহরে পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করছেন।

পুনরায় পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসছি।—

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মূর্তি কুমারহট্ট হালিশহর থেকে বলিদাঘাটায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মূল্যবান কষ্টিপাথরের কেবল কালীমূর্তিটিকে চোরে চুরি করে নিয়ে

যায়। এখন সেখানে কেবল শায়িত শিবের সামনে সিদ্ধেশ্বরী কালীদেবীর ছবি রেখে পূজা করা হয়।

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরটি সাধারণ একটি 'চাঁদনি' মন্দির। কুমারহট্ট হালিশহরের দরিদ্র গৃহস্থের কন্যা রানি রাসমনি (১৭৯৩-১৮৬১) বিবাহের পর একদিন প্রকৃতই রাজরানি হলে সিদ্ধেশ্বরী কালীর মন্দিরটিকে সুন্দর ও সুরম্য রূপে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে সে অনুমতি প্রদান করেননি। যদি রানি রাসমনি সেদিন সে অনুমতি পেতেন তাহলে হয়তো দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির নির্মাণের পরিবর্তে হালিশহর—বলিদাঘাটায় ওইরূপ কালীক্ষেত্র রচিত হত।

রানি রাসমনির জীবনে বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর ধর্মপ্রাণের অনেকটাই প্রভাব পড়েছিল। বিদ্যাধর রায় চৌধুরী শ্যামরাইয়ের মূর্তিটি চৌধুরীপাড়ার দোলতলায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই দোলতলায় আজও দোল-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। "সপ্তম দোল" হিসেবে এই দোল-উৎসব প্রায় তিনশো বছর ধরে নিজ ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। বর্তমানে শ্যাম রাইয়ের মূর্তিটি হালিশহরের ডানলপ ঘাটের প্রতিষ্ঠাতা সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের অরুণ কিরণ রায় চৌধুরীর নিজ বাড়ির একটি নির্দিষ্ট কক্ষে অবস্থান করছেন।

বিদ্যাধরের প্রতিষ্ঠিত বুড়োশিব আজও বুড়ো শিবের গলিতে প্রাচীনত্বের ঐতিহ্য রক্ষা করে বিরাজ করছেন।

এই বংশে লক্ষ্মীকান্তের প্রপৌত্র পঁচিশতম পুরুষ রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (জন্ম ১৬৫২ খ্রি.) পরমসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ইনি লক্ষ্মীকান্তের দ্বিতীয় পুত্র গৌরীকান্তের পৌত্র [গৌরীকান্ত → গন্ধর্ব → রামকৃষ্ণ]

রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কুমারহট্ট হালিশহরে সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করা মোটেই সহজ কাজ নয়। এরজন্য পঞ্চবট, পঞ্চমুণ্ডের আসন স্থাপন করতে হয়। তারপর প্রয়োজনে লক্ষ বলিরও অনুষ্ঠান করতে হয়। কোটিবার মহাবিদ্যার বীজমন্ত্র জপ করা, কোটিবার হোমযজ্ঞ সম্পন্ন করা হলেই তবে আসনটি সিদ্ধ পীঠাসনে পরিণত হয়। শাক্ত তান্ত্রিক সাধক রামকৃষ্ণ অবশ্যই এই নিয়মেই সিদ্ধপীঠ রচনা করে নিজে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এই সিদ্ধপীঠটি 'রামকৃষ্ণ মণ্ডপ" আখ্যা লাভ করে। ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের (১০৯৬ বঙ্গাব্দে) নথিপত্র রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর অনেক দানপত্রের উল্লেখ রয়েছে।

রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর দুই পুত্র ছিল—শুকদেব এবং রাধাবল্লভ।

কুমারহট্ট হালিশহরে এরপর আরেকজন মহাসাধকের জন্ম হয়। তিনি প্রখ্যাত সাধক রামপ্রসাদ সেন (জন্ম ১৭২০)। রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ জন্মসূত্রে বৈদ্য। ফলে অদ্বিজ নন। বৈদ্য সম্প্রদায়ের উপনয়ন এবং গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার অনিবার্য বিধি আছে।

রামপ্রসাদ শাক্ত—তিনি কালীভক্ত সাধক ছিলেন। সঙ্গীতের কথা ও সুরের মাধ্যমে তিনি যেন কালীমাতার সঙ্গে সংলাপ করতেন। রামপ্রসাদ প্রথম জীবনে চাকরি করলেও পরবর্তীকালে কুমারহট্ট হালিশহরে তিনি পুরোপুরি সাধনায় মগ্ন হন। রামপ্রসাদের সাধনা ও কবিত্ব মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হালিশহরের সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ ১৭৫৪ থেকে ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ভক্ত সাধককে কৃষিযোগ্য জমি, বাস্তুভিটাসহ রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর সিদ্ধসাধনপীঠ দান করেন।

সাধক রামপ্রসাদ সেন যে সব ভূমি লাভ করেছিলেন তার বিবরণ দেওয়া হল।—

(ক) সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশীয় দর্পনারায়ণ, শ্রীরাম রায়, কালীচরণ রায়—তিন জনে একত্রে মোট ৮ বিঘা জমি দান করেন। তারিখ ২ এপ্রিল, ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ।

(খ) হালিশহরের সাধক রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সুভদ্রাদেবী (স্বামী শুকদেব) অপুত্রক থাকায় 'সবৃক্ষবাটি আন্দাজ ১ বিঘা জমি রামপ্রসাদকে বসবাস এবং সাধনার জন্য ''বৈদ্যত্তর মহাপ্রাণ'' দেন। তারিখ—১৫ এপ্রিল, ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

দানপত্রে বয়ানটি এখানে উল্লেখ করলাম।—

''...........আমার বসতবাটীর দক্ষীণাংশে শ্রীযুক্ত রামহরি চক্রবর্ত্তীর ভদ্রাশনের দক্ষীণ চতুসিম্য বৎছর্ষ সবৃক্ষা বাটী খারিজ জমা তোমাকে বসতি করিতে বৈদ্যত্তর মহাপ্রাণ দিলাম। ....পশ্চিমে রাম রায়ের মহল্লাবাটী ....।''

এই রাম রায় সুভদ্রাদেবীর দেবর।

(গ) সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশীয় দর্পনারায়ণ রায় এককভাবে ২ বিঘা জমি দান করেন। তারিখ—১ জুলাই, ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) এছাড়া নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৫১ বিঘা জমি দান করেন। তারিখ—২০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ।

উল্লেখ করতে হয়,—এইসব জমি বিভিন্ন মৌজায় ছিল এবং অনেক জমি কৃষিযোগ্য ছিল না। ফলে সাধক রামপ্রসাদের পক্ষে অর্থ খরচ করে চাষাবাদ করা সম্ভব হত না। সেজন্য দারিদ্র্য তাঁর শক্তিসাধনার নিত্যসঙ্গী ছিল।

অনেকের মতে সাধক রামপ্রসাদকে সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশ থেকেই ''কবিরঞ্জন'' উপাধি প্রদান করা হয়।

সাধক রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সুভদ্রাদেবী কর্তৃক তাঁর শ্বশুরের নামিত ''রামকৃষ্ণধাম'' রামপ্রসাদ সেন দানস্বরূপ ১৫ এপ্রিল, ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে পান।

''রামকৃষ্ণধাম'' দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত ছিল। পরবর্তীকালে সাধক রামপ্রসাদের পত্নী কালীমাতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্বামী রামপ্রসাদকে উক্ত সাধনপীঠে সাধনা করতে বলেন। রামপ্রসাদ ''রামকৃষ্ণধামে'' সাধনা করে বাঞ্ছিত ফল পান এবং সিদ্ধিলাভ করেন। উক্ত ধামের সেই পঞ্চ বটবৃক্ষ (সবৃক্ষবাটী) এবং পঞ্চমুণ্ডাসন আজও বর্তমান। এই পঞ্চবটী

সংলগ্ন স্থান রামপ্রসাদের তিরোধানের পরে প্রায় ষাট বছরকাল দৈবভীতি ও কুসংস্কারে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির উদ্যোগে বর্তমানে এই স্থানটি ভক্ত সাধক ও কবি রামপ্রসাদের ভিটা এবং দর্শনযোগ্য তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

"প্রসাদকালী জগদীশ্বরী" কালীমাতার মন্দিরের সম্মুখে সুরম্য নাটমন্দির,—তার পূর্বদিকে শিবমন্দির আর পঞ্চবটী বেদী—সব মিলিয়ে "রামকৃষ্ণধাম" এবং রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ ও সাধনার স্মৃতিবিজড়িত এক অপূর্ব অনবদ্য পবিত্র তীর্থস্থান।

স্থানটি জনসাধারণের নিকট "রামপ্রসাদের ভিটা" নামেই বিশেষ পরিচিত। হালিশহরের মাটির মাহাত্ম্যমণ্ডিত এক ভিটা।

হালিশহরের সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বহু বংশধর অন্যত্র উঠে গিয়ে বসবাস করেছেন। বর্তমানে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য প্রভৃতি পরিবার এখানে বসবাস করছেন। এঁরা প্রায় সকলেই সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের দৌহিত্র বংশ।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়—সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে কুমারহট্ট হালিশহর একটি উল্লেখযোগ্য শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়ের একটি মহাতীর্থ এবং ঐতিহ্যপূর্ণ জনপদ। এই জনপদ গঠনের মূলে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের বংশধরগণ। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এই জনপদ বঙ্গ সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।
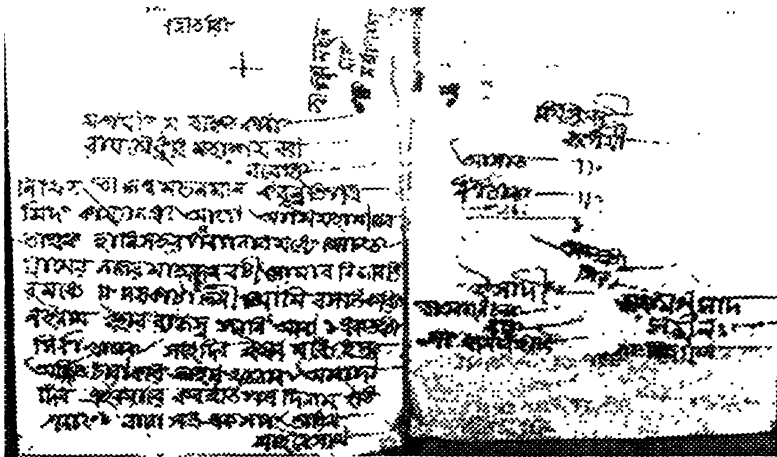
সাধক রামপ্রসাদের দস্তখৎ

১২০১ বঙ্গাব্দের, বৈশাখ মাসে (ইং এপ্রিল, ১৭৯৪) হালিশহরের সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের এক কবুলতি পত্রে ইসাদী হিসেবে সাধক শ্রী রামপ্রসাদের দস্তখৎ। রামপ্রসাদ সেন ওই সময় জীবিত ছিলেন।

সৌজন্যেঃ মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, রাধানাথ রায় চৌধুরী লেন, হালিশহর

সাবর্ণ বংশ তালিকা—১

মহর্ষি সাবর্ণ

(অন্যতম মনু)

↓

সৌভরী (স্বভরী) উপাধ্যায়
কান্যকুব্জের প্রখ্যাত বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং
সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের পণ্ডিত

↓

(১) বেদগর্ভ

খিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে
বঙ্গদেশের অধিবাসী হন

↓
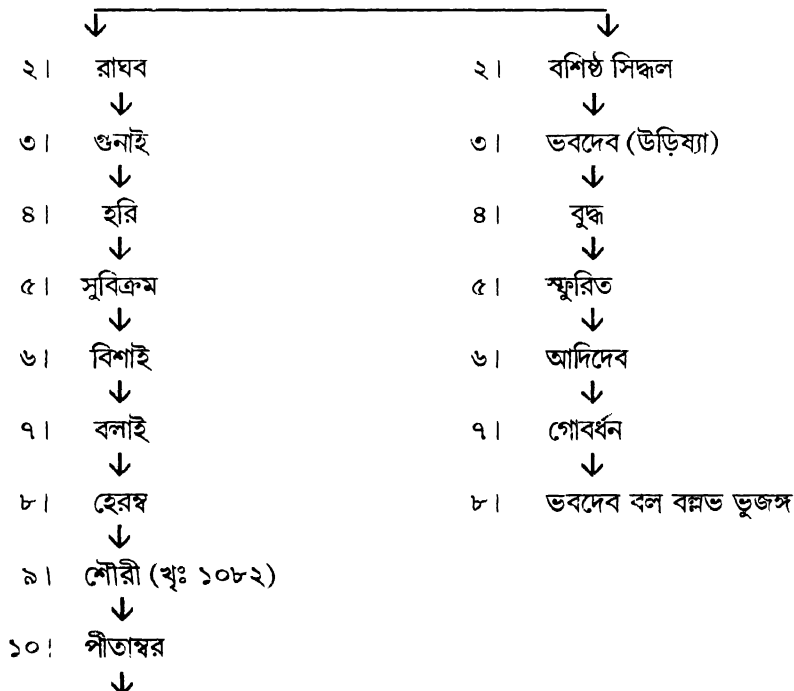
১১। কুলপতি (খৃঃ ১১৮২, আমাটির পণ্ডিত)
↓
১২। শিশু
↓
১৩। গদাধর
↓
১৪। হলধর (খৃঃ ১২৮২)
↓
১৫। আয়ুরাম
↓
১৬। বিনায়ক
↓
১৭। শিব (ওরফে জীব)—(খৃঃ ১৩৮২, আমাটিতে অবস্থান)

১৭। শিব

১৮। পরমেশ্বর (পুরাই)
↓
১৯। পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
↓
২০। শম্ভুপতি (খৃঃ ১৫০০)
↓
২১। কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় (ওরফে জীয়া) (খৃঃ ১৫৩৫/৪৮—১৬২০)
↓
২২। **লক্ষ্মীকান্ত**

১৮। মুরারি (বর্তমান বাংলাদেশ)
↓
১৯। ভৈরব
↓
২০। শ্রীধর
↓
২১। নীলকণ্ঠ
↓
২২। শ্রীপতি
↓
২৩। রামনাথ
↓
২৪। রাঘব
↓
২৫। রামচন্দ্র
↓
২৬। হরিহর

হালিশহর
বংশতালিকা—২
১৯। পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় (পাঁচুশক্তি খান)
২০। শম্ভুপতি
২১। কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় (ব্রহ্মচারী) (ওরফে জীয়া)
২২। লক্ষ্মীকান্ত (১৫৭০-১৬৪৮)
২৩। রামকান্ত (১৫৯০-১৬৫০)
গৌরীকান্ত (১৬০০-১৬৯০)
গোপাল
বীরেশ্বর (চক্রবর্তী)
কৃষ্ণ (সিংহ)
গোপী
মহাদেব (১৬৩৯(?)-১৭৩০)
২৪। রামবল্লভ
সুবুদ্ধি
জগদীশ (১৬২০-১৬৯০)
২৪। গন্ধব (১৬১৮)
২৪। জনার্দন (১৬২০)
২৪। শ্রীমন্ত (১৬২৫-৮১)
২৪। কুলেশ্বর
২৫। বিদ্যাধর (১৬৪০-১৭২০)
রঘুদেব (১৬৪২-১৭২২)
রত্নেশ্বর (১৬৭০-১৭২০) (উত্তরপাড়া)
রামেশ্বর (১৬৭৪-১৭৩)
২৫। রাধাকৃষ্ণ (১৬৫০)
২৫। কেশবরাম (১৬৫০-১৭২৬) (বড়িশা)
২৫। প্রান

২৫। বিদ্যাধর (১৬৪০-১৭২০)
২৬। রামচাঁদ
রঘুদেব (রাঘব)
সন্তোষ (ক)
দুর্গারাম (খ) (১৬৬৬-৯৬)
২৫। রাধাকৃষ্ণ (১৬৫০)
২৬। রামশঙ্কর (১৭৭৫) (বিরাটি)
২৭। কালীচরণ (১৬৭৬-১৭৬২)
২৮। রামজয়
রামশঙ্কর
গঙ্গানারায়ণ (১৭২১-৮৫) (গ)
রামহরি
রাধানাথ
রামনিধি
শম্ভু
বিশ্বেশ্বরী
জগন্নাথ
তারাপ্রসাদ
নবকৃষ্ণ
ভবানীপ্রসাদ
দ্বারিকানাথ
পার্বতী
হরিহর
লক্ষ্মীনারায়ণ
রামচাঁদ
আনন্দ
জীবনকৃষ্ণ
উপেন
রজনী
তুলসী
হরিধন
দীনবন্ধু
ভগবতী
অঘোরচন্দ্র
নবীনকৃষ্ণ
হরিপদ
সুধীর
অশোক
অসীম

(গ) গঙ্গানারায়ণ (১৭২১-৮৫)
ভৈরব (১৭৫৭-১৮৫০)
রামকমল
লোকনাথ
ঠাকুরচরণ
শ্যামাচরণ
জয়কৃষ্ণ
বিজয়কৃষ্ণ
বিনয়কৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ
অতুলকৃষ্ণ
জীবনকৃষ্ণ
বিভূতি
নীলু
শরৎ
অরবিন্দ
অরুণকৃষ্ণ
সুধীরকৃষ্ণ
হেমেন্দু
ইন্দু
গিরিজা
বিপিন
নৃপেন
লীনা
বরুণ
বীরেশ্বর
পৃথ্বীশ্বর
জগদীশ্বর
সুপ্রকাশ
সুপ্রভাত
সুপ্রতাপ
সুপ্রণব
প্রেমেন্দু
অমলেন্দু
সমরেন্দু
প্রতুলেন্দু
বিভোর
কিশোর
তপু
মনু
মৌসুমী
অলোক
সন্দীপ
সুদীপ্ত
স্নেহা
পানু
বিট্টু
মন্টু

- রামচাঁদ
- রঘুদেব (রাঘব)
- সন্তোষ (ক)
  - মনোহর
    - দর্পনারায়ণ
      - ভোলানাথ
        - চন্দ্র
          - হরি
          - অধর
            - তারাপদ
              - দেবব্রত
          - শ্রীশ
            - বিমল
            - শিবচন্দ্র
              - মলয়
              - মুকুল
            - ইন্দুভূষণ
      - বিনোদরাম
        - কৃষ্ণচরণ
          - উমাচরণ
            - প্রমথনাথ
              - সুবোধ
                - নিরোধ
                  - অলকেশ
                    - রাজশেখর
                  - পুলকেশ
                - অরুণ
                  - অসিত
              - সুধীর
          - শ্যামাচরণ
            - মন্মথ
              - সুরেন্দ্র
              - দুর্গাপদ
      - প্রাণহরি
        - নীলকমল
          - সুরেশচন্দ্র
            - শৈলেন্দ্র
              - শঙ্খ
            - উপেন্দ্র
              - অজিত
              - রণজিত
              - সুজিত
        - কালীকমল
          - হৃদয়নাথ
          - জীতেন্দ্রনাথ
            - শম্ভু
              - কমল
                - অজিত
                  - জয়দেব
                  - তারকনাথ
                - রঞ্জিত
                - সুজিত
              - সজল
              - উজ্জ্বল
            - বীরেন্দ্র
              - সুজয়
              - ইন্দ্রনীল
            - শঙ্কর
            - সুরেন্দ্র
        - রামকমল
    - উদয়নারায়ণ
      - রাজচন্দ্র
        - উমাপ্রসাদ
          - বেনীরায়
        - দুর্গাপ্রসাদ
          - ব্রজরায়
    - রাজকিশোর
      - জগৎচন্দ্র
        - হরিচরণ
          - ভূতনাথ
        - কাশীনাথ
          - শিবুনাথ
    - রামকানাই (ঘ)
    - বলাই (ঙ)
    - শ্রীদাম (চ)
  - রামরাম (ছ)
- দুর্গারাম (খ)

(ঘ) রামকানাই
সদাশিব
ফেলুনাথ (গোপীনাথ)
চন্ডী
রাধানাথ
কাশীনাথ
যোগেশ্বর
অশ্বিনী
চন্দ্রশেখর
জানকীপ্রসাদ
হরপ্রসাদ
গৌরীশঙ্কর
রামশঙ্কর
ব্যোমকেশ
হৃষিকেশ
উমাপদ
একটি পুত্র
শিবপদ
শক্তিপদ
দুর্গাপদ
শেখর
বাপী
তিন পুত্র
দীপঙ্কর
অর্ঘ
অনিতকুমার
অজিতকুমার
মনোরঞ্জন
বলরাম
সুকুমার
সুদীপ্ত
উত্তম
সমীরন
সুব্রত
রাজচন্দ্র
বিজয়কৃষ্ণ
শুভশ্রী
অনন্যা
রাজশ্রী
পল্লশ্রী

(ঙ) বলাই
কীর্তিচন্দ্র
নীলু
হরচন্দ্র
গোবিন্দ
রাজলক্ষ্মী
(সাহিত্যিক
বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নী)
প্রাণকৃষ্ণ
হরচন্দ্র
রামকৃষ্ণ
কালীপ্রসাদ
আনন্দ
যজ্ঞেশ্বর
(দত্তক পুত্র)
হরিপদ
দেবেন্দ্রনাথ
শান্তিনাথ
দুইপুত্র
প্রভাত
রাজকমল
অরুণ
সুশান্ত
ষষ্ঠী
আশুতোষ
ভবতোষ
পরিতোষ
সন্তোষ
সুশান্ত
সৈকত
মহীতোষ
প্রশান্ত
পিনাকী
স্বপন
প্রভাত
বাবাই
তপন
কল্যাণ
(চ) শ্রীদাম
গুরুপ্রসাদ
কালীমোহন
শশী
তারাপ্রসাদ
দীননাথ
মদন
দেবনাথ
কমল

(খ) দুর্গাচরণ (১৬৬৬-৯৬)
গোবিন্দ
ছোকা
শ্রীরাম
কিনু
যুগল রায় (১৭২০)
রামকুমার
প্রেমকৃষ্ণ
কালীবর
নবকুমার
চন্দ্রকান্ত
পঞ্চু
পুন্টা
মহেশ
গোপাল
উপেন
গোলক
(ছ) রামরাম
রামনাথ
গঙ্গাধর
বিশ্বম্ভর
শ্রীনাথ
সত্যচরণ
গোপীমোহন
হরিকুমার
কালীপ্রসন্ন
সাতকড়ি
দুলালচন্দ্র
নিতাই
দেবিকা
কেস্ট
বিস্টু
প্রদীপ
সুদীপ
নয়নদীপ
দীপক
দীপ
তৃপ্তি
অমরেশ
মলি

উত্তরপাড়া (হুগলি জেলা)

পূর্বে উল্লেখ করেছি রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র গোপাল রায় উত্তরপাড়ার দেখাশোনা করতেন। কনিষ্ঠপুত্র মহাদেব তাঁকে সাহায্য করতেন। আর জ্যেষ্ঠপুত্র রামরায় মাঝে-মধ্যে গিয়ে ওখানকার জমিদারি এবং কাগজপত্র দেখাশোনা করতেন। সময়টা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর তিন বা চার দশকের।

পরে **২৫তম পুরুষ রত্নেশ্বর রায়** (১৬৭০-১৭২০) উত্তরপাড়ার জমিদারি দেখাশোনার জন্য গাঁদি গ্রাম থেকে উত্তরপাড়ায় চলে আনেন। বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর তৃতীয় ভ্রাতা রত্নেশ্বর (লক্ষ্মীকান্ত - রাম রায় - জগদীশ - রত্নেশ্বর) ঠিক কত খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় আসেন তা জানা যায়নি। তবে অনুমান করা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন গাঁদি গ্রামে সেনানিবাসের পত্তন করে, তার কিছুকাল পরেই রত্নেশ্বর গাঁদি ত্যাগ করেন। কারন সেখানে সপরিবারে পালকি চড়ে গঙ্গাস্নান যাবার পথে গোরা সৈন্যদের অশ্লীল ইঙ্গিত রত্নেশ্বর রায় চৌধুরীর পছন্দ হত না।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তিনি উত্তরপাড়ায় চলে আসেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রত্নেশ্বর উত্তরপাড়াকে নতুন করে আদর্শ নগরী হিসেবে তৈরি করার জন্য সচেষ্ট হলেন। এ বিষয়ে তিনি পূর্বপুরুষ পাঁচু শক্তি খান এবং লক্ষ্মীকান্তকে আদর্শ পুরুষ হিসেবে মনে-মনে গ্রহণ করলেন।

লক্ষ্মীকান্ত হুগলি জেলার এই এলাকাকে 'উত্তরপাড়া' নামে উল্লেখ করে গেছেন। রত্নেশ্বরও 'উত্তরপাড়া' নাম বহাল রাখলেন। রত্নেশ্বর যে বসতবাটি নির্মাণ করেছিলেন, বর্তমানে তার অতি সামান্য ধ্বংসস্তূপ লক্ষ করা যায়। অবশ্য এই বাড়িতে আগে হাতি থাকত। অট্টালিকার তোরণটি শ্বেতপাথর দ্বারা নির্মিত ছিল।

রত্নেশ্বরের জামাতা বংশে কবি ভগবান মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যে রত্নেশ্বর সম্পর্কে লিখেছেন—

কুমারহট্ট বাস যার প্রভাতে স্মরণ তার
নইলে সেদিন যায় ভালো।
যে সভায় গমন হয় সভা উল্লসিত হয়
সে সভা করিয়া বসেন আলো।।

নাম বিদ্যাধর রায় কতগুণ কব তায়
মহাবিদ্যা উপাসনা বলে।
মর্যাদা পাইল মূল্য দ্বিতীয় নাহিক তুল্য
আকাশ বাতাস ভূমণ্ডলে।।
তাঁহার বংশের সার রত্নেশ্বর নাম তাঁর
এই স্থানে হইলা আগত।
মহারত্ন জন্মেছিল মহাশয় উপাধি পাইল
গোষ্ঠীপতিভুবন বিখ্যাত।।
সুরধনী পশ্চিমতটে গ্রামখানি আছে বটে
স্বর্গতুল্য সুপবিত্র স্থান।
সাবর্ণ চৌধুরী আদি আসিলেন হতে গাঁদি
গোষ্ঠীপতি বড়ই প্রধান।।
কুলীন সন্তান যত আসিলেন কত কত
বসতি করিলেন এই স্থানে।
বাটিঘর বৃত্তি দিয়া শ্রেণীমত বসাইয়া
চিরদিন নিযুক্ত পালনে।।

বর্ণনাটি রত্নেশ্বর তথা সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশকে বোঝার পক্ষে দারুণ কার্যকরী। পাঁচু শক্তি খান, লক্ষ্মীকান্ত, বিদ্যাধর প্রভৃতি সাবর্ণ জমিদারগণ যে প্রজারঞ্জক ছিলেন এবং নতুন নগর ও সমাজ গড়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন—তা এই কবিতা থেকে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়। সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের জমিদারির সর্বত্র প্রজারা রামরাজত্বে বাস করার মতো স্বাচ্ছন্দ্য জীবন উপলব্ধি করতেন।

ভাগীরথীর পশ্চিমপারে বংশবাটির (বংশবেড়িয়ার) প্রধান রাজপরিবারের সম্পত্তির অধীন উত্তরপাড়াসহ ভদ্রকালী, কোতরঙ, মাখলা প্রভৃতি গ্রামের ছয় আনা স্থাবর সম্পত্তির সহিত রত্নেশ্বর ভাগীরথীর পূর্বপারের গাঁতি বা গাঁদি গ্রামের জমিদারি বিনিময় করে নেন।

১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের শোভা সিংহের বিদ্রোহ শুরু হলে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের রাজার নামানুসারে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সূচনা করে। সম্ভবত রত্নেশ্বর রায় চৌধুরী ওই ঘটনার পর সপরিবারে উত্তরপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন।

রত্নেশ্বর প্রথমে উত্তরপাড়ার অর্থাৎ বালিগ্রামের উত্তরাংশের উন্নতিসাধনে এবং স্বাবলম্বী সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। অনুরূপ কার্য এর পূর্বে তাঁর বংশের পূর্বপুরুষগণ হালিশহর, নিমতা-বিরাটি-দমদম প্রভৃতি স্থানে করে এসেছেন। রত্নেশ্বর ডোবা-খানা প্রভৃতি জলাভূমি ভরিয়ে সমতল ভূমি গড়ে তুললেন। সপ্তগ্রামের (সাতগাঁয়ের)

অবনতির কারণে উত্তরপাড়া অল্প সময়েই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, কুমোর, তিলি-তামলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের বসতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

রত্নেশ্বরের পৈতৃক বাসস্থান কুমারহট্ট হালিশহর হলেও তিনি জমিদারির কাজকর্মের তাগিদে বারাকপুরের নিকট গাঁতি বা গাঁদি নামক স্থানে বাস করতেন। তিনি সেখানকার গোষ্ঠীপতিও ছিলেন। রত্নেশ্বর ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। উত্তরপাড়ায় নতুন বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধোপা-নাপিত, পুরোহিত প্রভৃতি মানুষের বসবাসের দিকেও নজর দিলেন। তিনি তাঁদের বসবাসের উপযোগী জমি-জায়গা দান করলেন এবং এরপর তিনি বংশের কন্যাদের কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহ দিয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। সেই সঙ্গে তাঁদের বসবাস করার ব্যবস্থা করলেন।

রত্নেশ্বরের চার পুত্র—রামজীবন, রাম রায়, রাজা রায় এবং নরেন্দ্র রায়। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামজীবনকে চার আনা পনেরো গন্ডা জমিদারির অংশ দান করলেন। অপর তিন পুত্র প্রত্যেকে তিন আনা পনেরো গণ্ডা হিসেবে অংশ পেলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামজীবনকে শ্যাম রায়ের দোল উৎসবের ব্যয় নির্বাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হল। এই উৎসবের খরচও বেশি। আর মেজো, সেজো এবং ছোট ছেলেদের ওপর যৌথ দায়িত্ব রইল রথযাত্রা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার। এই তিন ভাই উত্তরপাড়ার দক্ষিণদিকের সম্পত্তি পান। মধ্যভাগের সম্পত্তি থেকে পুরোহিতগণকে প্রচুর দেবোত্তর জমি দান করা হয়।

মুক্তকেশী কালীমাতার পুরোহিত ছিলেন মজুমদার পদবিধারী এক ব্রাহ্মণ। মুক্তকেশী কালীমাতার পুরোহিতকে পৃথক সম্পত্তি দান করা হয়।

এই মুক্তকেশী কালীমাতার সম্বন্ধে একটি কাহিনি আছে।

পূর্বে এই এলাকায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। ডাকাতি-দস্যুবৃত্তি তাঁদের জীবিকা ছিল। এই সম্প্রদায়ের রত্নাপাখি নামক এক ডাকাত এই কালীমাতাকে পূজা করে ডাকাতি করতে যেতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হত। ফলে রত্নাপাখির নিকট দেবী জাগ্রতা কালীমাতা রূপে পূজিতা হতেন। পরে এই অঞ্চলে সমাজ ও নগর গড়ে উঠলে অন্যান্য অনুন্নত অধিবাসগণের সহিত সেই রত্নাপাখি ডাকাতও এই স্থান ত্যাগ করে চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি কালীমাতাকে নিয়ে যাননি। রত্নেশ্বর রায় চৌধুরী তখন এই মুক্তকেশী কালীমাতার মন্দির নির্মাণ করে নিত্য পূজার জন্য পুরোহিত বন্দোবস্ত করেন। এই কালীমন্দিরের পাশে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ইনি ভদ্রকালী শিব নামে পরিচিত। ভদ্রকালী শিবের মন্দির বহু পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের কারুকার্য উল্লেখযোগ্য। যিনি বা যাঁরা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন—তাঁরা অবশ্যই রুচিশীল ছিলেন বলে মনে হয়।

ধীরে ধীরে রত্নেশ্বর বৃত্তি দান করে এবং বংশের কন্যাদের বিবাহ দিয়ে উত্তরপাড়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। পূর্বে যে এলাকায় মণ্ডলগণ বাস করতেন তিনি তাঁদের

নামানুসারে সেই এলাকার নামকরণ করলেন 'মণ্ডলপাড়া'। মণ্ডলগণ মূলত উত্তরপাড়ার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে তাঁদের নামে পাড়ার নামকরণ হওয়ায় তাঁরা নিজেদের মর্যাদা সম্পন্ন মনে করলেন। পরে ওই পাড়ায় 'মণ্ডল স্ট্রিট' নামে রাস্তাও হয়েছে। উত্তরপাড়ায় ধোপাপাড়া, চড়কডাঙ্গা রোড, কলেজ লেন নামক অনেক স্থান বা রাস্তার নামকরণ হয়েছে। চড়কমেলা থেকেই 'চড়কডাঙ্গা' নামকরণ হয়। উড়িষ্যা থেকে রায় চৌধুরী বংশ রান্নাবান্নার জন্য ব্রাহ্মণ বা 'ঠাকুর' আনেন। যে পাড়ায় ওই সব উড়িয়া ঠাকুরদের বসবাস করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল পরে সেই পাড়াটি 'উড়িয়া লাইন' নামে পরিচিত হয়।

এবার রত্নেশ্বর রায় চৌধুরীর চার পুত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

জ্যেষ্ঠপুত্র রামজীবনের তিন পুত্র—গঙ্গারাম, বিনোদরাম, রামচন্দ্র। আর একটি কন্যা। তাঁর বিবাহ হয় ভাগীরথীর পূর্বতীরে খড়দহ গ্রামে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত। বিবাহে তিনি প্রচুর সম্পত্তি যৌতুক পান।

দুর্গাচরণের দুই পুত্র—পঞ্চানন এবং রামশঙ্কর। রামশঙ্কর অকৃতদার অবস্থায় মারা যান। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার যৌতুক প্রাপ্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে পরে জমিদার হন এবং বিষয়সম্পত্তি এবং জমিদারির দেখাশোনার প্রয়োজনে উত্তরপাড়ায় এসে বসবাস করেন। পঞ্চানন ভাগীরথীর তীরে তিনটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। এই মন্দিরগুলির গঠনপ্রণালী প্রশংসনীয়। দৌহিত্র পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরগণ উত্তরপাড়ায় এ যাবৎকাল বসবাস করছেন।

রামজীবনের প্রপৌত্র রামহরি রায় চৌধুরী সংস্কৃত, ইংরেজি, পারসি ইত্যাদি ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং ইংরেজ দরবারে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। রামহরি রায় চৌধুরী 'চৌধুরী' পদবি ব্যবহার করতেন না। রামহরি রায় তৎকালীন সমাজে একজন বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাগান বাড়িতে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর বাসভবনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এইভাবে বহু গণ্যমান্য দেশি-বিদেশি ব্যক্তি রামহরি রায়ের বাসভবনে অথবা বাগানবাড়িতে আসতেন। তাঁর চেষ্টাতেই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডটি শ্রীরামপুর পর্যন্ত সেই সময় পিচঢালা রাস্তা হয়। বালিখালের ব্রিজও তাঁর তদারকিতে তৈরি হতে শুরু হয়। তবে ব্রিজটির কাজ তাঁর মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয়। রামহরি রায়ের দৌহিত্র বংশের জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ব্রিজটি সম্পূর্ণ করার জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন।

একটা কথা উল্লেখ করা উচিত যে রত্নেশ্বর রায় চৌধুরীর বংশের জামাতাগণ কুলীন ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কৌলীন্য প্রথানুসারে তাঁরা অনেকেই একাধিক বিবাহ করার ফলে উত্তরপাড়ায় দৌহিত্র বংশের বৃদ্ধি বেশি ঘটে।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ

দরবার থেকে 'রাজা' উপাধি পান। তাঁদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটে। তাঁদের বংশধরগণ সকলেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কর্মজীবনে উচ্চপদে নিযুক্ত হন। এই মুখোপাধ্যায় বংশের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায় এঁদের বংশধরগণ প্রত্যেকে রামহরি স্নায়ের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন এবং কৃতজ্ঞচিত্ত ছিলেন।

গঙ্গারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও ধর্মক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রেখে গেছেন। রামনারায়ণের 'সত্যনারায়ণ কথা' নামক গ্রন্থটি উত্তরপাড়ায় বিশেষ সমাদৃত ছিল। তাঁর গ্রন্থের বিবরণ থেকে অনেক কথাই জানা যায়। পূর্বে রামনারায়ণের ফটকের ওপরে ঘড়ি থাকত। সময়ে সময়ে টং টং করে ঘড়ির ঘণ্টা বাজত আর তার থেকে আশপাশের মানুষ সময় জানতে পারতেন। তা ছাড়া ফটকের দুধারে দুটি হাতি থাকত। সাবর্ণ রায় চৌধুরী জমিদারবাবুরা হাতি এবং ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতেন। পালকিও ব্যবহার করতেন।

রামনারায়ণের প্রপৌত্র জগবন্ধু বিশেষ গুণশালী এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন।

জগবন্ধুর অন্যান্য পৌত্রগণের মধ্যে শিবকৃষ্ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাল্যকালে তিনি আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়াশোনা করেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিসহ কৃতকার্য হন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। বি.এ. পরীক্ষার পূর্বে তাঁর পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে শিবকৃষ্ণের ওপর ন্যস্ত হয়। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে মেট্রোপলিটন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। পরে শিবকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে হুগলি জেলার জজ কোর্টের আইনজীবী হন। আইন ব্যবসায় সুনাম হওয়ায় শিবকৃষ্ণ পরে কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হন। শিবকৃষ্ণ উত্তরপাড়ার পৌরসভার কমিশনার পদেও মনোনীত হন। দ্বিতীয়বার পৌরসভার কমিশনার পদে মনোনীত হয়ে তিনি চেয়ারম্যান পদে আসীন হন। শিবকৃষ্ণ উত্তরপাড়ায় বহু জনহিতকর কাজ করে গেছেন।

রামনারায়ণের প্রথম পুত্র ভবানীশঙ্কর। ভবানীশঙ্করের পুত্র আনন্দচন্দ্র পূজানুষ্ঠানগুলি খুবই নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে সম্পন্ন করতেন। পূর্বপুরুষের দোল দুর্গোৎসব তিনি আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠান করতেন। তিনি প্রায় বারো মাসই পূজাপার্বণ করতেন এবং প্রতিবেশীগণের সহিত প্রীতি বিনিময় করতেন। ধনী-দরিদ্র সকলেই সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করে আনন্দ লাভ করতেন। আনন্দচন্দ্রের সময় পর্যন্তই উত্তরপাড়ায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের গৌরব উজ্জ্বলতর ছিল।

রত্নেশ্বরের প্রথম পুত্র রামজীবনের বংশধরগণ কর্তৃক উত্তরপাড়ার উত্তরাংশে এইভাবে দোল দুর্গোৎসব ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নির্বাহ হতে থাকে।

রত্নেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র রামরাম রায় চৌধুরী উত্তরপাড়ার দক্ষিণাংশে তিন আনা পনেরো গন্ডা জমিদারি নিয়ে বসবাস করতেন। অপর দুভাই—রাজারাম এবং নরেন্দ্ররাম

তাঁর পাশেই বাস করতেন। তাঁদের বসতবাটীর মধ্যেই মুক্তকেশী কালীমন্দির। অবশ্য কালীমাতার নিত্য পূজার নিমিত্ত মজুমদার পরিবারকে পূর্ব থেকেই নিয়োগ করা হয়েছিল। পিতা রত্নেশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে তিন ভাই রথযাত্রার উৎসবের ব্যয়নির্বাহ করতেন।

রামরাম রায় চৌধুরীর চারপুত্র—মনোহর, গোবিন্দরাম, শুকদেব এবং গণেশরাম। পিতার নির্দেশমতো চার ভাই-ই জমিদারি এবং উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পাদন করতেন। তবে গোবিন্দরাম ব্যতীত অপর তিন ভাইয়ের বংশধারা অচিরে স্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল মধ্যম ভ্রাতা গোবিন্দরামের বংশ স্থায়িত্বলাভ করে।

গোবিন্দরামের এক পুত্র নিমাইচরণ। নিমাই সাধারণভাবেই জীবনযাপন করতেন। তাঁর দুই পুত্র—গুরুপ্রসাদ এবং রামগোপাল। গুরুপ্রসাদের সম্বন্ধে বিশেষ জানা যায়নি। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক রামগোপালের একমাত্র পুত্র ক্ষেত্রমোহন বিশেষ সাধক শ্রেণির মানুষ ছিলেন। তিনি সম্ভবত ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা পিয়ারীমোহনের সমসাময়িক ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন সাবর্ণ বংশের সাধকভাবের যোগ্য উত্তরসূরি। অনেকে তাঁকে 'গুরুজী' বলে সম্বোধনও করতেন। ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী উত্তরপাড়ার ডাকবিভাগে চাকরি করতেন। এজন্য তিনি অনেকের নিকট 'ডাকমুনশি' নামেও পরিচিত ছিলেন। এমনকি তাঁর পরিবারের বসতবাড়িটিও ''ডাকমুনশির বাড়ি' বলে এলাকায় অভিহিত ছিল।

ক্ষেত্রমোহনের চার পুত্র। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুত্রও ডাকবিভাগে জি.পি.ওতে কর্মরত ছিলেন। চতুর্থ পুত্র ভুবনমোহনও ডাকমুনশি হন। কিন্তু প্রথম পুত্র যোগেন্দ্র পিতার মতো বাল্যকাল থেকেই ধর্মানুরাগী ছিলেন। সেজন্য পিতা তাঁর নামকরণ করেন 'যোগেন্দ্র'। যোগেন্দ্র ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। তিনি জগজ্জননী শ্রীসারদামাতার নিকট দীক্ষিত হন। এরপর তাঁর নাম হয় স্বামী যোগানন্দ। স্বামী যোগানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দ্বাদশ সাক্ষাৎ শিষ্যের অন্যতম ছিলেন স্বামী যোগানন্দ। ১৮৯৯ খ্রিসটাব্দের ২৮ মার্চ তিনি দেহত্যাগ করলে সারদাদেবীও শোকে অভিভূতা হয়ে চোখের জল ফেলেছিলেন।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের সাধন ও ধর্মভাবের যোগ্য পুরুষ যোগেন্দ্র পরবর্তী জীবনে স্বামী যোগানন্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করে সাবর্ণ বংশেরও মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

ভুবনমোহন রায় চৌধুরীর পাঁচটি পুত্র—প্রভাস, অমলকৃষ্ণ, অজিত, সত্যনারায়ণ এবং রাম নারায়ণ। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাস রায় চৌধুরী উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন। তিনি যোগবলে যোগাসনে থাকার সময় ভূমি থেকে প্রায় ৬ ইঞ্চি ওপরে উঠে পড়তেন। অনেকেই সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই বংশে ক্ষেত্রমোহনের পৌত্র (২য় পুত্র সাতকড়ি অথবা মনোমোহনের পুত্র)

তারকনাথ রায় চৌধুরীও উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন। তিনি সারাজীবন সাধকের মতো জীবনযাপন করতেন। তবে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিঃসন্তান থাকার জন্য বংশরক্ষার্থে তারকনাথ বিবাহ করেছিলেন। তারকনাথের প্রথমে কন্যাসন্তান হওয়ার পর একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেন। সন্তান যোগ্য হওয়ার পর তারকনাথ কয়লাগোলার গঙ্গার ধারে সাধনপীঠ তৈরি করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সেখানেই অবস্থান করে সাধনায় মগ্ন ছিলেন। নিজ পত্নীকে তিনি অতঃপর 'দেবী' সম্বোধন করতেন।

ভুবনমোহনের চতুর্থ পুত্র সত্যনারায়ণ রায় চৌধুরী। তিনিও ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ, সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন। গলায় ক্যানসার রোগ থাকলেও তিনি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মতো বিমর্ষ, ব্যথিত ছিলেন না। রোগকে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন।

রত্নেশ্বরের তৃতীয় পুত্র রাজারাম রায় চৌধুরীর বংশের অধিকাংশ বংশধর অন্যত্র গিয়ে বসবাস শুরু করেন। উত্তরপাড়ার কলেজ লেনে এখন মাত্র রাখাল রায়ের বাড়ি নামে পরিচিত এমন একটি পরিবার বাস করেন, রাখাল রায় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে ইংরেজ সরকারের অধীনে এগ্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি কলকাতায় থাকতেন। মাঝে মাঝে উত্তরপাড়ায় আসতেন।

রাখাল রায় চৌধুরীর চারপুত্র—পূর্ণশশী, মনোরঞ্জন, সুনীতিভূষণ ও সুধীর। মায়া এবং মমতা নামে তাঁর দুটি কন্যাসন্তানও ছিল। রাখাল রায়ের পুত্রগণ সুশিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

রত্নেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্ররামের সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানা যায়নি। তবে তাঁর অধস্তন বেচারাম রায় চৌধুরী ইংরেজ সরকারের অধীনে এ.আর.পিদের প্রশিক্ষক ছিলেন। এছাড়া তিনি পাড়ার ছেলেমেয়েদের ব্রতচারী শিক্ষাও দিতেন। বেচারাম রায় সুদর্শন, দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। অতি আমোদপ্রিয় এবং কর্মচঞ্চল মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। শেষ বয়সে তিনি ফিজিওথেরাপি বিদ্যার দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন। দীর্ঘায়ু এই ব্যক্তি তিরানব্বই বছর বয়সে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

বর্তমানে সত্যনারায়ণ রায় চৌধুরীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অরুণা রায় চৌধুরী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার পর ডক্টরেট করেন। বর্তমানে তিনি স্বামী ডা. সুজিত কুমার চক্রবর্তীর সহিত কানাডার এডমনটন শহরে থাকেন। তবু দেশের টানে তিনি বছরে দু'একবার উত্তরপাড়ায় আসেন। বর্তমান প্রজন্মে ড. অরুণা রায় চৌধুরী (চক্রবর্তী) উত্তরপাড়ার সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের একজন যোগ্যা দুহিতা। তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন।

অরুণা দেবী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সারদামাতার প্রতি পরম ভক্তিশীলা। তাঁদের আদর্শে দুঃস্থ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার কার্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। এই জনসেবামূলক কার্যে তাঁর স্বামী ডা. সুজিত চক্রবর্তীর সহায়তাও প্রশংসার দাবি রাখে।

উত্তরপাড়া (হুগলি)
বংশতালিকা—৩
২২। লক্ষ্মীকান্ত (১৫৭০-১৬৪৯) → ২৩। রামকান্ত—১ম পুত্র (১৫৯০-১৬৫০) →
২৪। জগদীশ—৩য় পুত্র (১৬২০-৯০) → ২৫। রত্নেশ্বর—৩য় পুত্র (১৬৭৪-১৭৩৯)
রামজীবন
রামরাম
রাজারাম
নরেন্দ্ররাম
মধুসূদন
মনোহর গোবিন্দরাম শুকদেব গনেশরাম
রামকৃষ্ণ
দর্পনারায়ণ
গঙ্গারাম বিনোদরাম রামচন্দ্র কন্যা
নিমাইচরণ
দুর্গাপ্রসাদ
উমাচরন
ঠাকুরদাস
তিনকড়ি
রামনারায়ণ রামহরি
গুরুপ্রসাদ রামগোপাল কন্যা
যদুনাথ
বেচারাম
ক্ষেত্রমোহন
ভবানীশঙ্কর
চণ্ডীচরন
আনন্দচন্দ্র
(?)
যোগীন সাতকড়ি নগেন্দ্র ভুবনমোহন
(স্বামী যোগীন মহারাজ)
জগবন্ধু (পৌত্র)
প্রভাস অমলকৃষ্ণ অজিত সত্যনারায়ণ রামনারায়ণ
(?)
অশোক অনন্ত ঝর্না পুষ্প সীমা
অরুণা অর্চণা শিবনারায়ণ
শিবকৃষ্ণ (পৌত্র)
সোমদত্তা সৌম্যপ্রিয়
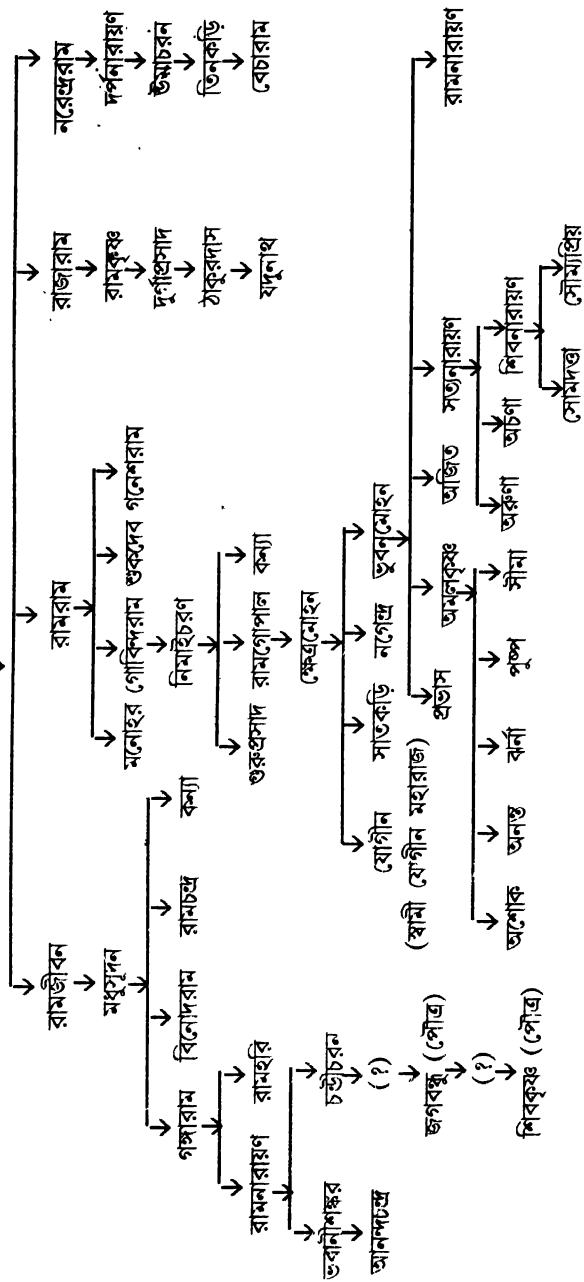
নিমতা-বিরাটি (দমদম)

১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বাবিংশ পুরুষ রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী উনআশি বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দ্বিতীয় পুত্র গৌরীকান্তকে জমিদারির দায়িত্ব দিয়ে যান। তখন বারাকপুর থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জমিদারি দেখাশোনার সুবিধার জন্য গৌরীকান্ত ১৬৪৯ বা ৫০ খ্রিস্টাব্দে নিমতা-বিরাটি এলাকায় চলে আসেন এবং জমিদারির কাছারিবাড়ি করেন দমদমে। কাছারিবাড়ি বা রাজধানীকে সুরক্ষিত করতে তিনি কয়েকটি দুর্গ তৈরি করেন। সেগুলির মধ্যে কাছারিবাড়ির সামনের গড়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সামনে গড়' কথা থেকে বর্তমানে স্থানটির নাম 'শ্যামনগর' হয়েছে।

জলপথে কোনো আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার জন্য কাশীপুরেও একটি দুর্গ ছিল। দক্ষিণদ্বারের বাঁদিকে (বর্তমানে লবণহ্রদের দিকে) নৌসেনা ও যুদ্ধের জন্য নৌকা তৈরি থাকত। ওই দক্ষিণদ্বারকে বর্তমানে 'দক্ষিণদাড়ি' বলা হয়। যে স্থানে পাইক-বরকন্দাজদের ছাউনি ছিল সেই স্থানটিকে বলা হত 'পাইক পাড়া' আর অস্ত্র বা হাতিয়ার থাকত যেখানে সে-জায়গার নাম হয় 'হাতিয়াড়া'। চৌধুরী রাজারা হাট বসিয়েছিলেন যে স্থানে সেই হাটের নাম 'রাজারহাট'। দমদমে (নিমতায়) রাজধানী স্থাপনের প্রায় পঁচিশ বছর পরে দমদম-নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাস তখনকার অর্থাৎ ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে দমদমের বিবরণ প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

'গ্রাম নিমতা গঙ্গার পূর্বকূল।
সাবর্ণ চৌধুরী সব যাহাতে অতুল।।
গো-মহিষ পশুপক্ষী বৃক্ষপর টাট।
রম্য সরোবর তীর সান বান্ধা ঘাট।।
নগর রাজার হাট দেখিতে সুন্দর।
কৈলাস শিখরে যেন দেব পুরন্দর।।
ভগবতী দাস নাম তথায় বসতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিত তাহার সন্ততি।।'

দমদম-নিমতার ভাগ্যে রাজধানীর সম্মান মাত্র ৬৬ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এখানে

গৌরীকান্ত কর্তৃক রাজধানী স্থাপিত হয় ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে। আর ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চবিংশ পুরুষ কেশবরাম রায় দমদম থেকে রাজসরকার তুলে নিয়ে বড়িশায় পত্তন করেন।

বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গদেশ জয় করার পূর্বে বঙ্গদেশ প্রধানত পাঁচ বিভাগে বিভক্ত ছিল—রাঢ়, বাগ্‌ড়ি, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং মিথিলা। এছাড়া বাংলার আবার তিনটি উপবিভাগ ছিল—লক্ষ্মণাবতী (গৌড়), সপ্তগ্রাম এবং সুবর্ণগ্রাম। মুসলমান রাজত্বকালে মূল পাঁচ বিভাগের উনিশটি খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে 'সরকার' বলা হত। একটি পুরোনো তথ্যমূলক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরি'তে ওই উনিশটি সরকারের মধ্যে সরকার সপ্তগ্রামের (সাতগাঁও-এর) মধ্যে দমদম ছিল প্রধান স্থান। সেজন্য দমদম থেকেই রাজস্ব আদায়ের নজির পাওয়া যায়। প্রাচীন দমদমের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থল ছিল বরানগর।

বরানগরে বহু তন্তুবণিক বাস করতেন। গিরিধারী শ্রেষ্ঠী নামক এক ব্যক্তি তন্তুবায়দের সুতো দাদন দিয়ে নানাপ্রকার বস্ত্রাদি তৈরি করে বিদেশি বণিকগণকে সরবরাহ করতেন। বরানগর তখন মোটা মসলিন বা বাপ্তা কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।

১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রামের পতনের পর তন্তুবায়গণ গোবিন্দপুর এলাকায় বসবাস করতে শুরু করেন। সুতরাং সপ্তগ্রামের পতনের আগে দমদমের বরানগরে কাপড় তৈরি ও বিক্রি হত। গোবিন্দপুরের বিখ্যাত শেঠ, বসাক, দত্ত, মল্লিকগণ তখন দমদম-বরানগর অঞ্চলে বসবাস করতেন। দমদমে বেশি রাজস্ব আদায় হত বলেই দমদম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেই কারণেই সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের গৌরীকান্ত দমদমে রাজধানী পত্তন করেন। তিনি দমদম থেকে রাজস্ব আদায় করা এবং জমিদারি দেখাশোনার কাজ সহজ হবে বলে মনে করেন। নিমতা-বিরাটিতে তাঁর বসবাসের এটাই অন্যতম প্রধান কারণ।

দমদমে সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণের ৬৬ বছরের রাজধানী কালে বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ী এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—বরানগর থেকে বি.টি. রোড, দমদম এবং যশোর রোড হয়ে দমদম হাউস যা বর্তমানে ক্লাইভ হাউস নামে পরিচিত তার দুধারে বহু বসবাস এবং ব্যাবসা কেন্দ্র ছড়ানো আছে।

গৌরীকান্ত সুদক্ষ বিচক্ষণ জায়গিরদার ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি স্বর্গত পিতার মতো প্রজাবৎসল এবং ধার্মিক ছিলেন।

গৌরীকান্তের পুত্র শ্রীমন্ত রায়ও রাজকার্যে বেশ দক্ষ ছিলেন।

কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৫৬ বা ৫৭ খ্রিস্টাব্দে নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের কথা তাঁর কালিকামঙ্গল কাব্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণরাম সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

আত্মজীবনী প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণরাম দাস জমিদার-বন্দনার ভনিতা করেন—

'অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগনা তার।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যার।।
বসতি করবে তথি সদাচারী শুদ্ধমতী
অবতার কৈল কলিযুগে।
চৌধুরী গন্ধর্বারি বলে নাহি অধিকারী
অধিকার অনেক ধরণী।
দহিতে অহিত বন ছিল দারা হুতাশন
ভার ভবে প্রতাপ ধরণী।।
সাবর্ণ চৌধুরী সব এক মুখে কিবা নিব
অশেষ মহিমা অতি স্থির।
শ্রীমন্ত রায় সর্বলোকে গুণ গায়
ধার্মিক যেমন যুধিষ্ঠির।।
বিদ্বান উত্তম দাতা জিনিয়া কল্পলতা
জনার্দন রায় মহাশয়।
উপমা কোথায় এত কি কহিব গুণ কত
সহস্র বচন মোর নয়।।
প্রতাপে তিমির হর যশের যামিনী কর
শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায়।
পুণ্যের অবাধ নাই দেখি ইন্দ্র ভয় পাই
কলিকালে এমন কোথায়।।'

পূর্বে উল্লেখ করেছি ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর (হিজরি ১১১০ অব্দের জামদিয়াস মাসের ১৫ তারিখে) দিল্লির সম্রাট আলমগিরের রাজত্বে ৪৪ তম বৎসরে সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণ এক দলিলে তৎকালীন মুদ্রায় বার্ষিক তেরোশো টাকার বিনিময়ে গোবিন্দপুর, কলিকাতা, সুতানুটি ইংরেজদের পাট্টা বা লিজ দেন। অবশ্য তৎকালীন রাজনীতির পারিপার্শ্বিক চাপে সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণ দিল্লির সম্রাটের নির্দেশে লিজ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে তাঁরা এই দলিল সম্পাদন করেছিলেন রামচাঁদ, রামভদ্র, মনোহর

সিংহ, প্রাণ এবং মনোহর রায় নামক পাঁচ নবীন ও নাবালক বংশধরের মাধ্যমে। কোনো প্রবীণ জমিদার এর মধ্যে অংশগ্রহণ করেননি।

এই ঐতিহাসিক দলিল সম্পাদিত হয় বড়িশার কাছারি বাড়ির সামনে সাঁঝের আটচালায় জোব চার্নকের জামাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট চার্লস্ আয়ার সাহেবের উপস্থিতিতে।

লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ৩৯ নম্বর ডকুমেন্টের ২৪০৩৯ সংখ্যার পান্ডুলিপিতে এই দলিলের বয়ান লেখা আছে।

এই দলিল বড়িশার কাছারিবাড়িতে স্বাক্ষরিত হলেও মূলত হালিশহর এবং নিমতাবাসী সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণ এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে ছিলেন। কারন জগদীশ রায় এবং তাঁর সন্তানগণ হালিশহরে বাস করতেন। আর শ্রীমন্ত রায় এবং তাঁর বংশধরগণ নিমতা-বিরাটিতে বাস করতেন। লক্ষ্মীকান্তের সাত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রায়ের এবং দ্বিতীয় পুত্র গৌরীকান্তের তরফের উদ্যোগ দেখা যায়।

১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ আলম মারা গেলে তারপর আজিম ওসমানের পুত্র ফারুকশিয়ার দিল্লির সিংহাসনে বসলেন।

তিনি ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে যখন অসুস্থ ছিলেন সেই সময় ঘটনাক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিদল বিশেষ নজরানা নিয়ে দিল্লি পৌঁছলেন। এই প্রতিনিধি দলে ২৪ টাকা বেতনের হ্যামিল্টন নামক একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি চিকিৎসার দ্বারা সম্রাট ফারুকশিয়ারকে সুস্থ করে তোলেন। তখন সম্রাট কৃতজ্ঞতাবশত কোম্পানিকে ইচ্ছামতো পুরস্কার দাবি করতে বলেন। এই সুযোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি দল নিম্নলিখিত চারটি আর্জিসহ সম্রাটের নিকট একটি আবেদন পেশ করে। আবেদনগুলি হল—

১। কলিকাতার কুঠির অধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকলে কেউ কোম্পানির মালপত্র আটকাতে পারবে না।

২। প্রয়োজন হলে মুরশিদাবাদের টাঁকশালে সপ্তাহে তিনদিন কোম্পানির মুদ্রা তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। দেশি-বিদেশি কোনো ব্যক্তি কোম্পানির নিকট ঋণী থাকলে তাকে প্রয়োজন হলে কোম্পানির হতে তুলে দিতে হবে।

৪। আজিম ওসমানের মতো তিনি যেন কলিকাতার পার্শ্ববর্তী আটত্রিশটি গ্রামের জমিদারি ক্রয় করবার অনুমতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেন।

বলা বাহুল্য, ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি দলের চারটি আবেদনই পুরোপুরি মঞ্জুর হল।

এই সংবাদ শুনে বাংলার তৎকালীন নবাব মুরশিদকুলি খাঁ দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীগণের ওপর ইংরেজগণকে কোনো জমি বিক্রি না করার আবেদন জারি করলেন। কিন্তু তা কার্যকারী হল না।

কলিকাতার পার্শ্ববর্তী হুগলি নদীর উভয় তীরের জমিদারগণের নিকট ৩৮টি মৌজা ক্রয় করার সমস্ত রকম অনুমতি ইংরেজ কোম্পানি পেয়ে গেল। ফলে ৩৮টি মৌজা ইংরেজরা ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে অনায়াসে ক্রয় করে নিলেন।

ওই ৩৮টি মৌজা/গ্রামের মধ্যে হুগলি নদীর পূর্বতীরের বেলগাছিয়া, দক্ষিণ পাইক পাড়া, দক্ষিণ দাঁড়ি, বাহির দক্ষিণ দাঁড়ি, চিৎপুর প্রভৃতি মৌজার নাম আছে। আর পশ্চিম তীরের মৌজাগুলি হল বেতোড়, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া, সালকিয়া প্রভৃতি।

এই গ্রাম/মৌজাগুলি কোন্ পরগনার অন্তর্গত এবং কত খাজনা তার কয়েকটি প্রাপ্ত রেকর্ড উল্লেখ করা হল।

	Name of Town	Pargana	Revenue		
			Rs.	A.	P.
6	Belgashia	Calcutta	304	6	9
	Belgachhia	Paican	0	13	10
7.	Deckney Packpara	Amirabad	145	2	2
8.	Deckney Dand	Calcutta	37	8	9
	Daskhin Dari	Paican	12	0	3
		Amirabad	376	0	0
33.	Bodokney Dand (Bahir Dakshindari)	Paican	125	8	4
38.	Chittpoor (Chitpur)	Amirabad	252	8	0

লিজ দেওয়া সম্পত্তির এলাকার মধ্যে রাজস্ব দিয়ে কেশবরাম রায় সম্ভবত থাকতে চাননি। এই গ্লানি ও মর্যাদাহীনতার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যেই কেশবরাম এরপরে অর্থাৎ ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে দমদম-নিমতা থেকে রাজ সরকার তুলে এনে বড়িশায় চলে আসেন।

কেশবরাম অল্প বয়সেই বড়িশা গ্রামের জমিদারি লাভ করেছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন নবকৃষ্ণদেবের পিতামহ রুক্মিণীকান্ত দেব। কারন ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে কেশব রামের পিতা শ্রীমন্ত রায় পরলোকগমন করেন।

আজকের দমদম দেখে মনে হয় না—এখানে এককালে রাজধানী ছিল। সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে এলাকার নতুন নামকরণের কারণে পুরোনো গ্রামগুলির নাম দমদম-নিমতা

এলাকা থেকে মুছে যাচ্ছে। তখনকার কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ৫৫টি গ্রামের মধ্যে বর্তমানে কেবল বেলগাছিয়া, কাঁকুড়িয়া, কালীদহ, দক্ষিণদাঁড়ি, নোয়াবাদ, সিঁথি, পাইকপাড়া, কাশীপুর, চিৎপুর, টালা, বীরপাড়া—এই এগারোটি গ্রামের নামের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

কেশবরামের নিজস্ব অধীনে ছিল খাসপুর এবং মাগুরা পরগনা। তাঁর জমিদারির বিস্তৃতি ছিল দক্ষিণে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত। কেশবরাম রায় সমগ্র বঙ্গদেশে একজন দক্ষ এবং বিচক্ষণ ভূস্বামীরূপে স্বীকৃতি পান। তৎকালীন নবাব তাঁর ভূমিসংস্কার এবং জনহিতকর কাজকর্মে খুশি হয়ে ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে স্বতন্ত্র 'রায় চৌধুরী' উপাধি প্রদান করেন। তখন তিনি একজন বিচক্ষণ দূরদর্শী সমাজসংস্কারক এবং প্রজাবৎসল জায়গিরদার হিসেবে দক্ষিণবঙ্গের সমাজপতি রূপেও মর্যাদা পান।

রায় কেশবরাম মজুমদার চৌধুরী দুবার বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের সন্তান—রামদেব, কৃষ্ণদেব, রঘুদেব এবং শিবদেব। আর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানগণ হলেন—কল্যাণ এবং কুশল।

কেশবরামের তৃতীয় পুত্র রঘুদেব জন্মগ্রহণ করবার বিশ বছর পরে চতুর্থ পুত্র শিবদেব ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিবদেব জন্মগ্রহণ করবার পূর্বে কেশবরাম কাশীধামের শ্রী বিশ্বনাথদেবকে স্বপ্নে দর্শন পেয়েছিলেন। সেজন্যেই এই সন্তানের নাম রাখেন শিবদেব। পুত্র শিবদেবের জন্মকে দৈব ঘটনার স্মারক স্বরূপ কেশবরাম তাঁর জমিদারির দক্ষিণপ্রান্তে এক বিরাট এবং সুউচ্চ শিবমন্দির নির্মাণ করে সেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সুবিশাল পোড়ামাটির অলঙ্করণের মন্দিরটি দক্ষিণবঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। কেশবরাজের নাম অনুসারে এই শিবকে 'কেশবেশ্বর' (কেশবস্ব রায়ঃ) নামে পূজা করা হয়। বর্তমানে এই গ্রামটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'মন্দির বাজার' নামে পরিচিত।

সম্ভবত ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবরাম তাঁর জমিদারি ও বিষয়সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তবে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব এবং তাঁর পুত্র রামভদ্র কোনো এক অজানা কারণে পৈতৃক সম্পত্তির অংশগ্রহণ করেননি। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি—যে পাঁচজন নবীন ও নাবালক বংশধর ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দপুর, কলিকাতা এবং সুতানুটির স্বত্ব ইংরেজদের পাট্টা বা লিজ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রামদেবের পুত্র রামভদ্রও ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব সরে দাঁড়ানোর কারণে দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেবই বৃদ্ধ কেশবরামের জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তা ছাড়া কৃষ্ণদেব নাবালক তিন ভাইয়ের অভিভাবকত্বের ভারও নেন। অবশ্য এজন্য কেশবরাম তাঁকে অধিক সম্পত্তি প্রদান করেন।

কৃষ্ণদেব পিতার মতো প্রজাবৎসল, সুদক্ষ এবং বিচক্ষণ জমিদার ছিলেন। আনুমানিক ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণদেব পূর্ব বড়িশায় চুয়ান্ন বিঘা জমির ওপর একটি নতুন অট্টালিকা, বৈঠকখানা, সিংহদ্বার, পুষ্করিণী, বেড়বাগান সমস্তই ধীরে ধীরে সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তীকালে ভাইয়েদের নতুন বসতির সংস্থান করা।

১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবরাম দমদম ত্যাগ করে বড়িশায় চলে এলেও সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কিছু বংশধর দমদম-নিমতা-বিরাটিতে থেকে যান। বর্তমানে তাঁরাই নিমতা-বিরাটির উল্লেখযোগ্য সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার।

বর্তমানে উত্তর দমদম পৌরসভা, মৃণালিনী দত্ত কলেজ কমপ্লেক্স, বিরাটি রেলস্টেশন............. এসবই সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের জমির ওপর গড়ে উঠেছে।

এখানে রায় চৌধুরী বংশের দুর্গাপূজা শুরু হয় ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করেই দুর্গোৎসবের আনন্দ কোলাহলে নিমতা-বিরাটি পূর্বে মেতে উঠত। কারণ তখন কোনো বারো-ইয়ারি অর্থাৎ বারোয়ারি দুর্গাপূজা এতদঞ্চলে অনুষ্ঠিত হত না। এখানে রায় চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা আজও অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বের মতো কুমারী পূজা, সমস্ত বিধি-নিয়ম মেনে পূজা, ভোগারতি. ছাগবলি আজও চলছে। ভক্তিসহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, বিজয়া দশমীর দিন প্রণাম ও প্রীতি আলিঙ্গন বিশেষ আকর্ষণ।

বিরাটি রেলস্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটাপথ অতিক্রম করলে সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন বাড়ির অস্তিত্ব আজও প্রত্যক্ষ করা যায়। এই বাড়ির সামনে একটি বহু প্রাচীন বটবৃক্ষ ছিল। সেটি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ঝড়ে ভেঙে গেছে। কিন্তু প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার নির্মাণশৈলি, দরজা-জানালার খিলান এখনও হৃত মর্যাদা ও প্রতিপত্তির স্বাক্ষর বহন করছে। ভেতরের বাড়ি, পূজামণ্ডপও এখনও দেখা যায়। মণ্ডপের গড়ন সাধারণ। কিন্তু ঐতিহ্য অসাধারণ।

এই সমস্ত ঐতিহ্যপূর্ণ সৃষ্টির কৃতিত্ব বহুলাংশে কেশবরামের প্রাপ্য। নিমতা-বিরাটিতে বসবাস করে দক্ষিণেশ্বর থেকে সমস্ত দক্ষিণবঙ্গের জমিদারি সামলানো সম্ভব নয়। ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে তাই বিরাটি ত্যাগ করে বড়িশায় চলে আসার এটাও একটা অন্যতম কারণ।

কেশবরাম সমগ্র বঙ্গদেশে কেবল একজন সুদক্ষ ভূস্বামী ছিলেন না। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে নবাব তাঁকে স্বতন্ত্র 'রায় চৌধুরী' উপাধি প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সনন্দে তাঁকে অতিরিক্ত জায়গির প্রদান করেন।

পরে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুরশিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁর রাজ্যকে ১৩টি চাকলা এবং ১৬৬০ পরগনায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক চাকলার

ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাদশাহি-রাজস্ব আদায় করতেন। কেশবরাম বঙ্গদেশের দক্ষিণ চাক্‌লার রাজস্ব আদায়ের পদে নিযুক্ত হলেন।

বর্তমান ডালহৌসিতে সাবর্ণ রায় চৌধুরীর কাছারিবাড়ি ছিল। সেই কাছারিবাড়ির ওপরেই বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং গড়ে উঠেছে। ওই কাছারিবাড়ির সামনে ছিল শ্যাম রায়ের মন্দির। মন্দিরের সামনে বড় পুষ্করিণী। শ্যাম রায়ের দোলোৎসবের সময় হোলির রঙ আর লাল আবিরে পুষ্করিণীর জল লাল হয়ে যেত বলে এই পুষ্করিণীর নাম হয়েছিল 'লালদিঘি'।

এই কাছারি বাড়িতে ফিরিঙ্গি চার্লস এ্যান্টনি সাহেব সাবর্ণ রায় চৌধুরী বাড়ির কর্মচারী ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালের কবিয়াল এ্যান্টনি ফিরিঙ্গির পিতামহ ছিলেন। ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে দোলপূর্ণিমার দিন জোব চার্নকের সৈন্যরা লালদিঘির পাড়ে সাবর্ণ মহিলাগণের দোলখেলা এবং স্নান দেখবার জন্য উপস্থিত হয়। চার্লস এ্যান্টনি তাদের বাধা দেন এবং তাড়িয়েও দেন। এরপর জোব চার্নক তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করেন। শোকে, দুঃখে এবং অপমানে চার্লস এ্যান্টনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে লবণের ব্যাবসা আরম্ভ করেন।

কালীঘাটের শ্রীশ্রীকালীমাতা সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের ইষ্টদেবী। তাঁরাই দেবীর মন্দির করে দিয়েছেন। জমি-জায়গা দান করে দেবীর পূজার্চনার ব্যবস্থা করেছেন। হালদার পরিবার বেতনভুক্ত পুরোহিত মাত্র ছিলেন। পূজার্চনার হাল ধরে থাকেন বলে তাঁদের 'হালদার' পদবি প্রদান করা হয়।

নিমতা-বিরাটিতে সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশধরদের একটি শাখা এখনও বসবাস করছেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত নিমতার প্রাচীন কালীবাড়ি এবং অন্যান্য দেবদেবী এখনও পূজিত হয়ে আসছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিমতা-বিরাটির স্থান উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি রচনাকার রামরাম বসু নিমতাতেই প্রথম জীবনে শিক্ষালাভ করেন। কবি কৃষ্ণরাম দাসও বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন এই দমদম নিমতাতেই।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর এখানে প্রতিষ্ঠিত হল উত্তর দমদম পৌরসভা। সেই সঙ্গে শুরু হল নিমতা-বিরাটি-দমদমের নতুন যুগ।

সাবর্ণ চৌধুরী বংশের ধর্মনিষ্ঠার অতীতের ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ আজও বিরাজ করছেন—নিমতা কালীমন্দিরে দুই হস্ত বিশিষ্ট একটি কালীমূর্তি এবং ধ্যানমগ্ন একটি শিবমূর্তি। অনুরূপভাবে পানিহাটির কালীমন্দিরে বিরাজ করছে চতুর্হস্ত বিশিষ্ট একটি কালীমূর্তি।

ওই মূর্তি তিনটি সম্ভবত ২২ তম পুরুষ রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার

চৌধুরী বা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র গৌরীকান্তের আমলে গঠিত। মূর্তি তিনটি উদ্ধার করা হয় বর্তমান উত্তর কলকাতার একটি সরোবর থেকে।

নিমতা-বিরাটির সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে প্রাতঃস্মরণীয় শৈলেন রায় চৌধুরীর কথা উল্লেখ করতেই হয়। তিনি সমাজসেবী এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের জন্যও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এরপর স্মরণ করতে হয় বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরীর কর্মময় জীবন। জীবনচর্চায় সরল, পরোপকারী মানুষ বৈদ্যনাথ পরলোকগত হলেও আজও তিনি নিমতা-বিরাটির মানুষের মনোজগতে জীবিত।

বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রী বারীন রায় চৌধুরী। ইনি পেশায় আইনজীবী। কিন্তু সমাজের একজন দরদি মানুষ। শ্রী বিজয় কুমার রায় চৌধুরী একজন উচ্চপদস্থ গেজেটেড সরকারি অফিসার। কর্মজীবনে তাঁর সততা, সাফল্য এবং দক্ষতা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। শ্রী প্রভাকর রায় চৌধুরীর নাম না করলে একটা ত্রুটি থেকে যায়। তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর কর্মক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এছাড়া বর্তমান প্রজন্মে নিমতা-বিরাটির সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশে অনেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন এবং বংশের গৌরব বৃদ্ধির কার্যে লিপ্ত আছেন। এদের মধ্যে কুমারী বহ্নি রায় চৌধুরী কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। এই পরিবারের আরেক দুহিতা মহুয়া চিকিৎসক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কলিকাতা

কলিকাতার বিষয়ে কিছু আলোচনা করার পূর্বে গঙ্গানদীর প্রবাহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলতেই হয়। কারণ গঙ্গানদীর প্রবাহ এ-অঞ্চলে না থাকলে কলিকাতা নগরের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হত না। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কলিকাতা যদি সন্তান হয়, তাহলে গঙ্গানদী তার জননী।

গঙ্গানদীর প্রবাহ সম্বন্ধে নদনদী-বিষয়ক বিজ্ঞানীগণ বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন। আমরা সেই বিশদ বিবরণের মধ্যে প্রবেশ না করে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি মাত্র।

এলাহাবাদে (পূর্বনাম প্রয়াগ) গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতীর মিলন ঘটেছে। তারপর গঙ্গা ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবাহিত হতে হতে হুগলির ত্রিবেণীতে এসে আবার মুক্তবেণী হল। পুনরায় আবির্ভাব ঘটল গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর। ত্রিবেণী থেকে যমুনার গতি প্রবাহিত হল পূর্বমুখে। সরস্বতী প্রবাহিত হতে লাগল পশ্চিম মুখে। আর গঙ্গা দক্ষিণে

প্রবাহিত হতে হতে পশ্চিমতীরে হুগলিকে রেখে পূর্বদিকে ঈষৎ বাঁক নিয়ে কালীঘাট, বড়িশা, বোড়াল, বারুইপুর, জয়নগর, মজিলপুর, হাতিয়াগড় (হেতেগড়) হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। সরস্বতী ভিন্নপথে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হয়ে সংক্ষিপ্ত পথে সাগরে এসে মিশেছিল। আদিগঙ্গা ষোড়শ শতক থেকেই ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। বজবজ, রায়পুরের পাশ দিয়ে সরস্বতী নদীর আকার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য এরজন্য গঙ্গা ও সরস্বতীর সংযোগসূত্র খালকে কেটে বেশ প্রশস্ত করা হয়েছিল। এর ফলেই গঙ্গার জল প্রবলতর বেগে সরস্বতীতে এসে পড়তে লাগল। আর আদি গঙ্গা ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল। খাল কেটে দেওয়ার পর সরস্বতী নদীই কাটিগঙ্গা বা হুগলি নদী নামে প্রবাহিত হল। এখন আমরা কাটিগঙ্গা বা হুগলি নদীকেই প্রকৃত গঙ্গা মনে করছি। আর আদিগঙ্গা খিদিরপুর, কালীঘাটের পাশ দিয়ে খালের আকারে কোনোমতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই আদিগঙ্গার একটি ছবি সংযুক্ত করা হল।

সাবর্ণ রায় চৌধুরীর বড়িশা বাড়ির কথা আলোচনা করার পূর্বে কলিকাতার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানা যাক।

কলিকাতার পরতে-পরতে রয়েছে রূপকথার মতো এর বেড়ে ওঠার গল্পময় কাহিনি। সেজন্যেই কলিকাতাকে নিয়ে এত গবেষণা, এত লেখালেখি। কল্লোলিনী তিলোত্তমা একদিনে গড়ে উঠেনি। একজনের দ্বারাও নয়। কলিকাতার পত্তন ভাগীরথীর প্রবাহের কলধ্বনিময় প্রমত্ত ছন্দ থেকে।

আদি কলিকাতা গড়ে উঠেছিল ভাগীরথীর পূর্বতীরে পাশাপাশি অবস্থিত গোবিন্দপুর, কলিকাতা আর সুতানুটি—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে। গোবিন্দপুর গ্রামটির অবস্থান ছিল বর্তমানের হেস্টিংস থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত। তার উত্তরে এসপ্লানেড থেকে বড়বাজার পর্যন্ত কলিকাতা গ্রামের অবস্থান ছিল। আর বড়বাজার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত ছিল সুতানুটি গ্রামের সীমানা। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের নবীন ও নাবালক পাঁচ বংশধর চার্লস্ আয়ারকে গোবিন্দপুর কলিকাতা, আর সুতানুটি গ্রাম তিনটি ১৩০০ টাকায় বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে লিজ বা পাট্টা দলিল করে দেওয়ার পর ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজগণ কলিকাতা এলাকাটিকে বাজার কলিকাতা এবং টাউন কলিকাতা নামে দুভাগে বিভক্ত করে সমস্ত জমি জরিপ করেন। জরিপকালে বাজার কলিকাতার (বড়বাজার অঞ্চল) জমির পরিমাণ ৪৮৮ বিঘা ৯ কাঠা ১২ ছটাক দাঁড়ায়। আর টাউন কলিকাতার (ডালহৌসি অঞ্চল) জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭১৭ বিঘা ১০ কাঠা। এই জরিপের সময় টাউন কলিকাতায় অর্থাৎ ডালহৌসি পাড়ায় সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের কাছারিবাড়ি ছিল। সেখানেই পরে গড়ে উঠল রাইটার্স বিল্ডিং। পূর্বে কলিকাতায় মাটির বাড়ির সংখ্যাই বেশি ছিল। আর বসবাস ছিল নিম্ন সম্প্রদায়ের

হিন্দুগণের। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের বাস খুবই কম। সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণই বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বসবাস গড়ে তোলার জন্য নিম্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুগণকে ধান চাষ, খেতখামার, ফলের বাগান, পানীয় জলের জন্য কূপ ইত্যাদি খনন করতে সাহায্য করেছিলেন। এসব কাজে তাঁদের উৎসাহ প্রদানও উল্লেখযোগ্য। আরও পূর্বে এসব জায়গা ছিল জলা-জঙ্গলাকীর্ণ। হোগ্‌লার ঝোপঝাড়ে ভরতি। নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসতিতেই পূর্ণ ছিল তখনকার কলিকাতা। তাই এদের মহল্লা বা পাড়ার নামেই কুমোরটুলি, কলুটোলা, মুচিপাড়া, চুনারি পাড়া, যুগিপাড়া, চাষিপাড়া, ধোপাপাড়া.......... ইত্যাদি। মান্যগণ্যরা অনেকে এসেছিলেন সৌভাগ্যলক্ষ্মী লাভের তাগিদে।

কলিকাতার অনেক পুরোনো ব্যবসায়ী শেঠ-বসাকগণ। তাঁতশিল্পের দাদনী-বণিক হিসেবেই এঁরা পরিচিত ছিলেন। প্রথমে শেঠেদের একটি পরিবার এবং বসাকদের চারটি পরিবার পূর্বে গোবিন্দপুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। অন্য তন্তুশিল্পীদের মাধ্যমে বস্ত্র বুনিয়ে এঁরা রপ্তানি করতেন। পরে তৎকালীন নবাবের নিকট ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে বর্তমান শহিদমিনারের দক্ষিণদিকে বস্ত্র বোনার কারখানা গড়ে তোলেন। পাশের জমিতে চাষাবাদও শুরু হয়। সে তো অনেক পূর্বের কথা। জোব চার্নকের তখন অস্তিত্ব কোথায়? সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন অত্যন্ত খামখেয়ালিভাবেই কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক—এই তথ্যের ভিত্তিতে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দকে কলিকাতার জন্মসাল ধরে উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে এসেছেন। প্রশাসনের জানা উচিত ছিল—প্রাণী বা জীবের মতো কোনো দেশ বা নগর একটি বিশেষ ক্ষণে বা দিনে জন্মায় না। "Rome was not built in a day"—এ দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন। তবু পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকগণের এই খামখেয়ালিপনা কেন হয়েছিল তার উত্তর কে দেবে? অশেষ ধন্যবাদ সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ আর নয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীকে, যাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের পরিষ্কার রায়ের মাধ্যমে এই ভুল শুধরে দিলেন।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে শেঠ-বসাকগণ দমদমে বসবাস করতেন। আর বরানগরের তন্তুবায়গণ তাঁদের ব্যবসার বস্ত্রাদি বয়ন করে দিতেন। বরানগর তখন প্রাচীন শহর ছিল। পরে শেঠ-বসাকগণ গোবিন্দপুরের দক্ষিণ অংশে শহিদমিনারের পাশে উঠে এসে কারখানা তৈরি করলে তন্তুবায় শিল্পীগণও সেখানে চলে আসেন। শুরু হয় সুতালুটি (সুতানুটি) হাটখোলায় সুতার লুটির বেচাকেনা। শেঠ-বসাকদের সঙ্গে এলেন দত্ত-মল্লিকরা। তখন সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের জমিদারি-জায়গিরদারির রাজধানী ছিল দমদমে।

কলিকাতার অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত আরও অনেক অতীতেও পাওয়া যায়। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস পিপ্পলাই প্রথম তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কলিকাতার উল্লেখ করেন। পরে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এবং আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরিতে'ও

কলিকাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে Van Dan Brouke-এর তৈরি ম্যাপেও কলিকাতার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও পাঞ্জাবি ভাষায় (গুরমুখী ভাষা) গুরু নানকের জীবনীতে জানা যায় যে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কালীক্ষেত্র দর্শনে এসে নানক কলিকাতায় বেশ কিছুদিন বসবাস করেছেন। সুতরাং জোব চার্নক কলিকাতায় পদার্পণ করেই কলিকাতা-নগর গড়ে ফেললেন—এটা অর্বাচীনের ধারণা বা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ যেন শেকসপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে জুলিয়াস সিজারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি—ভিনি, ভিডি, ভিসি (পদার্পণ করলাম, প্রত্যক্ষ করলাম, সেই সঙ্গে জয়লাভ করলাম)।

প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার পত্তন ঘটে কালীক্ষেত্রের অর্থাৎ কালীঘাটের কালীমাতার অস্তিত্বের সঙ্গে আর পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর প্রবাহের ছন্দে ছন্দে। পরে তাকে রূপ দিয়েছেন সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের জমিদারির পত্তনের সময় থেকে। রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী বিজ্ঞানসম্মতভাবে কলিকাতায় বসবাস, সমাজ পত্তন এবং লেনদেনের ব্যাবসাকেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে গেছেন এবং রূপ দিয়েছে এক শহরের। সুতরাং জোব চার্নক দেখেছেন কলিকাতা নগরের কৈশোর কালকে। কলিকাতার জন্মদাতা তো নয়ই, এমনকি কলিকাতার শৈশবও তিনি দেখেননি।

আরও একটা কথা,—কলিকাতা তো গোবিন্দপুর, ডিহি কলিকাতা আর সুতানুটি— এই তিনটি গ্রাম নিয়ে নয়। কলিকাতার অস্তিত্ব পঞ্চান্নটি গ্রাম নিয়ে। এই পঞ্চান্নটি গ্রাম মূলত পঞ্চান্নটি গ্রামের তৌজি। এর আয়তন ২৬০ বর্গমাইল। সীমা হল—উত্তরে বরানগর, পূর্বে দমদম, দক্ষিণে টালির নালা আর পশ্চিমে ভাগীরথী। বর্তমান কলিকাতার মধ্যে এই পঞ্চান্ন গ্রামের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণায় প্রথম এই পঞ্চান্ন গ্রামের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়।

কলিকাতার জন্মসালের ইতিহাস যেমন বিকৃত বা ইচ্ছাকৃত বিলুপ্ত হতে বসেছিল, সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণ এবং কলিকাতার কিছু বুদ্ধিজীবী মহোদয় জনস্বার্থ মামলা করে তা উদ্ধার করলেন,—তেমনি কলকাতার মধ্যস্থল ধর্মতলার প্রকৃত ইতিহাস কে উদ্ধার করবে?

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের বিধ্বস্ত করে কলিকাতার নাম দিলেন 'আলিনগর'—দাদু আলিবর্দির নামানুসারে। ইংরেজরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাসস্থান ছেড়ে পালাতে লাগলেন। চতুর লর্ড ক্লাইভ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। উদ্দেশ্যপূরণের জন্য তাঁর দরকার হল এক লক্ষ টাকার। কিন্তু কে দেবে? দালাল এসে খবর দিল—"এক ভুজাওয়ালা ছাতু বিক্রি করে।

সে দিতে পারবে।" সেই ভুজাওয়ালা বর্তমান কার্জন পার্কের নিকট প্রতিদিন ছাতু বিক্রি করতেন। লর্ড ক্লাইভ ভুজাওয়ালাকে দেখে অবাক। সেই গেঁয়ো ব্যক্তিই অবশেষে গোরুর গাড়িতে করে এক লক্ষ টাকা লর্ড ক্লাইভের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিন বছরের মধ্যে টাকা পরিশোধ করার চুক্তিতে হ্যান্ডনোটও লেখা হল। কিন্তু তিন বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও লর্ড ক্লাইভ ভুজাওয়ালাকে টাকা ফেরৎ দিলেন না। ইতিমধ্যে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করেছে। চতুর লর্ড ক্লাইভ আবার নতুন চাল দিয়ে ভুজাওয়ালাকে বললেন—তাকে টাকা ফেরত দিতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই টাকার কথা এত জানাজানি হয়ে গেছে যে তাকে টাকা দিলে সে দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হতে পারে। তখন সরল সাদাসিধে ভুজাওয়ালা ক্লাইভকেই সেই টাকা রেখে দিতে বললেন। আর বললেন—ওই টাকার বিনিময়ে বরং এখানে (কার্জন পার্কের পাশে) একটা ধর্মতালাও (পুকুর) কেটে দেন। যাতে মানুষ জল খেতে পায়। অবশ্য লর্ড ক্লাইভ ভুজাওয়ালার কথামতো একটি পুষ্করিণী খনন করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে ওই 'ধর্মতালাও'-এর নাম অনুসারে এলাকাটির নাম 'ধর্মতলা'।

কিন্তু সেই 'ধর্মতালাও' পরে লর্ড কার্জন মাটি ফেলে ভরাট করে দিলেন। আর জায়গাটির নাম হল 'লর্ড কার্জন পার্ক'।

ইতিহাসের এই অধ্যায়টিও কি হারিয়ে গেল? কেউ কি উদ্ধার করতে পারবে এর প্রকৃত ইতিহাস?

রাধারমণ মিত্র তাঁর 'কলিকাতা দর্পণ' গ্রন্থে Encyclopaedia Britannica-র 'Micropaedia' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'Frequently at odds with Indian leaders and his superiors, Charnok was at times accused of mismanagement, theft, brutality to Indian prisoners and having questionable morals, he was once recommended for being dismissed"—এই চার্নককে ইংরেজরা চিনলেও কলকাতাবাসী কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা বলে তাঁকে স্মরণ করে এসেছেন। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ কর্তৃক জনস্বার্থ মামলা করে সেই ভুল সংশোধন করা হয়েছে। এইভাবে ধর্মতলার 'লর্ড কার্জন পার্কের' ভুল ইতিহাস জনস্বার্থ মামলা করে বাতিল করা উচিত। কেন ভুজাওয়ালার পবিত্র স্মৃতি জনসাধারণের মন থেকে মুছে যাবে?

আদি গঙ্গা এবং সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর

রামশঙ্কর
শ্রীরাম
কৃষ্ণচাঁদ
রাজারাম
কেশব
পরেশ
যদুনাথ
পঞ্চানন
নন্দ
সুকুমার
চন্দন
রঞ্জন
দেবাশিস্
অগ্নিবেশ
শিবাশীষ
অঙ্কিতা
শম্ভু
রাজর্ষি
স্নেহা
রামদাস
যদুনাথ
সন্তোষ (ক)
বৈদ্যনাথ (খ)
শচী (গ)
অমর (ঘ)
শৈলেন (ঙ)
অশ্বিনী
কৃষ্ণ (চ)
জীবন
অক্ষয় (ছ)
গোপাল (জ)
নীলমাধব
ক্ষেত্রনাথ
নিমাই (ট)
মনীন্দ্র
শান্তি
মহাদেব
নারায়ণ (ঝ)
অজিত (ঞ)
পাঁচুগোপাল
পার্থ
প্রতীক
অসীম

(ক) সন্তোষ
প্রফুল্ল
অনিল
সুনীল
নির্মল
বিমল
অমল
শ্যামল
রত্না
স্বপ্না
জ্যোৎস্না
প্রসন্নময়ী
স্বরূপকুমার
ডলি
দেবাশিস
দেবায়ন
মৃত্যুঞ্জয়
পিংকী
দেবমিতা
সুস্মিতা
ভাস্কর
কাকলি
মিতালী
সুব্রত
কুহেলী
(খ) বৈদ্যনাথ
স্বপন
সাধন
শুভজিৎ
স্বাতী
সহেলী
শিউলি
(গ) শচী
সুভাষ
মানব
অশোক
মলয়
শান্তনু
মানস
বর্নালী
তমন্না
দীপান্বিতা
দীপায়ন

(ঘ) অমর
কিঙ্কর
প্রণব
প্রভাকর
শুভঙ্কর
শ্রীপর্ণা
শর্মিষ্ঠা
পর্ণা
ঋতুপর্ণা
ঋতম্
(ঙ) শৈলেন
প্রতাপ
বারীন
প্রশান্ত
পবিত্র
শমিক
শোভিক
বহ্নি
সৌদীপ
মিত্রালী
চিত্রালী
দেবযানী
চন্দ্রানী
সাশ্রিকা
(চ) কৃষ্ণ
সুকুমার
সুবোধ
সঞ্জয়
বিশ্বজিৎ
সায়ন
অভিজিৎ
অস্মিত
লতা
মিতা
অর্পিতা
(ছ) অক্ষয়
তাপসী
দীপা
শেখর
অনন্যা

(জ) গোপাল
অজয়
বিজয়
সুব্রত
সুপর্ণা
সুমন্ত্র
মহুয়া
সুচন্দ্রা
সুলগ্না
(ঝ) নারায়ণ
দীপায়ণ
শিবায়ণ
সমীরণ
তামসী
তিয়াসা
(ঞ) অজিত
মানিক
মনিকা
মল্লিকা
ইন্দ্রজিৎ
(ট) নিমাই
হরিপ্রসাদ
সুধীর
সুশীল
সুবোধ
বিশ্বনাথ
পঙ্কজ
শক্তি
গৌরী
টুম্পা
সৌরভ
সোমা
সৌমিত্র

বড়িশা

বড়িশা গ্রামটি তৎকালীন খাসপুর পরগনার অন্তর্গত বহুলাপুরী অর্থাৎ বহুগ্রামের সমন্বয়ে গঠিত বেহালা এলাকায় অবস্থিত। পূর্বে এই গ্রাম চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত ছিল। এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা কলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত।

বড়িশা গ্রামের বানান মূলত দু-প্রকার দেখা যায়—বড়িষা এবং বড়িশা। এর কারণ সাধারণত নামের উৎস বিভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে।

বাংলার বারো ভুঁইয়া তথা সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের জায়গিরদারির পূর্ব থেকেই বড়িশা গ্রামের রাজস্বের ভাগ ছিল বেশি। অর্থাৎ বড় হিষ্যা (ভাগ)। এই বড় হিষ্যা কথা থেকেই 'বড়িষা' নামকরণ। অপর যুক্তি হল—এই এলাকায় পূর্বে নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতেন। আর এই এলাকা ছিল মূলত জলাভূমি। এই জলাভূমিতে বঁড়্শে দিয়ে মাছ ধরে গরিব মানুষজন তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফলে বঁড়্শে থেকে 'বড়িশা' নাম এসেছে। ভাষাবিদ অমিয়কান্তি ভৌমিকের বিশ্লেষণ হল—ব (জল) + অড় (ভূমি) + ঈশ (বিস্তৃত) = বিস্তৃত জলাভূমি। অর্থাৎ বড়িশা হল বিস্তৃত জলাভূমি। এই জলাভূমিতে মৎস্যজীবীরা বঁড়্শে দিয়ে মাছ ধরতেন। এই ব্যাখ্যার অনুকরণে মেদিনীপুর জেলার (বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের) রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে কোলাঘাটের উত্তরে 'বাড় বড়িশা' নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানেও জলাভূমিতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বসবাস লক্ষ করা যায়।

আরও একটা কথা প্রচলিত আছে, বর্তমান ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে কয়েক শতক পূর্বে বড়েশা নামক এক ইসলামধর্মী সাধক বসবাস করতেন। তাঁর খ্যাতি ছিল বহুদূর পর্যন্ত। ওই ইসলামধর্মী সাধকের নামানুসারেও এই এলাকার নাম 'বড়িশা' হওয়া স্বাভাবিক।

যা হোক, এসব কারণেই গ্রামটির দুটি বানান প্রচলিত আছে—বড়িষা এবং বড়িশা।

এই বড়িশার সঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত, গৌরীকান্ত এবং শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী—এই তিনজনের যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা এখানে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস না করলেও তাঁদের জায়গিরদারির কাজকর্ম, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং ধর্মাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে তাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। প্রতাপাদিত্যের পর বসন্ত রায়ের পুত্র রাঘব রায় (কচু রায়) বড়িশার নিকট সরশুনার কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তের জায়গির প্রাপ্তির পর বড়িশা-সরশুনায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে দমদম থেকে বেদগর্ভের অধস্তন পঁচিশতম পুরুষ কেশবরাম রায় চৌধুরী জমিদারি দেখাশোনার সুবিধার জন্য বড়িশায় উঠে আসেন। অবশ্য বড়িশার কাছারিবাড়ির পত্তন করেন বেদগর্ভের বাইশতম পুরুষ রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী। তখন কাছারিবাড়ির সামনে কয়েকটি বৃহৎ থামের ওপর সাঁঝের আটচালার পূজামণ্ডপ ছিল। থামের মাথায় কাঠামোর ওপর গোলপাতার আটচালের ছাউনি। বর্তমানে ওই আটচালা 'সাঁজের আটচালা' নাম ধারণ করে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্যের এক প্রধান সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

বড়িশা কাছারিবাড়িতে লক্ষ্মীকান্ত ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মেড়সহ সপরিবার অর্থাৎ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, কলাবউসহ মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার পূজা শুরু করেন। এরূপ মেড়সহ সপরিবার দুর্গার মূর্তি বঙ্গদেশের মধ্যে বড়িশার কাছারিবাড়িতেই প্রথম পূজা হয়। এর পূর্বে বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা শুরু হলেও এরূপ সপরিবার দশভুজা দুর্গার পূজার প্রচলন ছিল না।

১৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই দুর্গাপূজা বড়িশা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। হালিশহরে বাস করেও বড়িশাতেই লক্ষ্মীকান্ত স্থায়ীভাবে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করলেন। হালিশহর থেকে বড়িশার কাছারিবাড়িতে আসবার রাস্তাও লক্ষ্মীকান্ত তৈরি করেছিলেন। যাতায়াতের জন্য সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ারগাড়ি— এমন কি পালকি রাখারও ব্যবস্থা ছিল। পূজার কদিন লক্ষ্মীকান্ত আত্মীয়স্বজন এবং পুত্রদের নিয়ে মহানন্দে ভক্তিযুক্ত অন্তরে অতিবাহিত করতেন। তাঁর পত্নী ভগবতীদেবী নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গা দালানে বসে পূজার আয়োজনের তদারকি করতেন। প্রজাবৎসল লক্ষ্মীকান্ত প্রজাদের সঙ্গও ছাড়তেন না। তাঁরা স্বচ্ছন্দে পূজার কাজকর্মে যোগ দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। রামচন্দ্রপুরের প্রজারা টহলে হিসেবে পূজার কদিন স্বেচ্ছায় বিভিন্ন কাজকর্মে সহায়তা করতেন। সিরিটির গঙ্গার ঘাটে তাঁরা কাঁধে করে সপরিবার দুর্গা প্রতিমা নিয়ে গিয়ে ভাসান দিতেন। এসব এখন ইতিহাস।

বড়িশার অদূরেই ছিল প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায়ের রাজধানী সরশুনা। সরশুনাতে আছে মস্ত দিঘি। বসন্ত রায়ের নামানুসারে এই দিঘির নাম 'রায়দিঘি'। এই রায়দিঘির পাশের গ্রামে লক্ষ্মীকান্তের দুর্গাপূজার ঢাকে কাঠি পড়ত। এ যেন যশোরের রাজবাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার পরিকল্পনা। দুর্গাপূজা হয় মধ্যযুগের হাতের লেখা কবি বিদ্যাপতি রচিত পুঁথি 'দুর্গা ভক্তিতরঙ্গিনী' মতে। বলির জন্য কামার আসেন রামচন্দ্রপুর থেকে। বলি হয় মোট ১৩টি ছাগ, ১টি মহিষ। সপ্তমীতে ১টি ছাগ, অষ্টমীতে ২টি, সন্ধিপূজাতে ১টি আর নবমীতে ৯টি ছাগ এবং ১টি মহিষ। এর সঙ্গে আখ, চালকুমড়ো—সেসব তো আছেই। আজ বড়িশা আটচালা বাড়ির এই দুর্গাপূজা চারশো বছরের দোরগড়ায়।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পাড়া দুর্গাপূজার শুরু সঙ্গে-সঙ্গে সাবর্ণপাড়া নামে পরিচিত হল। সাবর্ণ চৌধুরীগণ বড়িশা এলাকাতেও তাঁদের কুলীন জামাতাদের বাসস্থান দিয়েছিলেন। কুলীনপাড়া নামে সেই পাড়া বর্তমানে পরিচিত। চিকিৎসক হিসেবে বৈদ্যদের বসতি দান করায় বৈদ্যপাড়া সৃষ্টি হয়েছে। পুরোহিতগণের বাসস্থানকে ভট্টাচার্যপাড়া বলা হয়। এছাড়া সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বোসেদের বাসস্থানকে বোসপাড়া বলা হয়। খেটে-খাওয়া নিম্নবর্গীয় মানুষদেরও পাশাপাশি এলাকায় বসবাসের স্থান দিয়ে সাবর্ণ চৌধুরীগণ একটি স্বাবলম্বী সমাজ গড়েছিলেন। তাই বড়িশার আশপাশের এলাকায় মুচিপাড়া, মাঝি পাড়া, ঢালিপাড়া, দাসপাড়া, কুমোরপাড়া, দুলেপাড়া প্রভৃতি পাড়ার নাম এখনও শোনা যায়।

হুগলি জেলার গোহট্ট, গোপালপুর থেকে যে জায়গির-জমিদারি সাবর্ণ বংশধরগণ লাভ করেছিলেন—তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল কুমারহট্ট-হালিশহর, দমদম-নিমতা-বিরাটি, বালিগ্রাম, উত্তরপাড়া, বড়িশা ও মেদিনীপুর জেলায়।

বর্তমানে বড়িশা বাড়ির সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

শ্রীমন্তের কনিষ্ঠপুত্র কেশবরাম। ইনি ২৫তম পুরুষ। পূর্বে উল্লেখ করেছি ইনি ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে বড়িশায় এসে বসবাস শুরু করেন।

লক্ষ্মীকান্ত ২৪ পরগনার মধ্যে যে ৮টি পরগনার জায়গির পান, তার মধ্যে কেশবরামের নিজস্ব ছিল ২টি পরগণা। এছাড়া তাঁর পৃথক জমিদারিও ছিল। তাঁর জমিদারির বিস্তৃতি ছিল দক্ষিণে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে একজন সার্থক জমিদার এবং প্রশাসকরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজিব কর্তৃক তিনি স্বতন্ত্র 'রায় চৌধুরী' খেতাব লাভ করেন। কেশবরাম সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের সমাজপতি ছিলেন। কেশবরাম অনেকগুলি জনহিতকর কার্য করেন। তিনি দানশীল এবং দেবভক্ত ছিলেন। ২৪ পরগনার মন্দির বাজারে তিনি যে শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে যান,—তা আজও দর্শনীয়। ওই মন্দিরটি সুউচ্চ। মন্দিরের ২১টি সিঁড়ির মধ্যে ১৬টি সিঁড়ি ইতিমধ্যে মাটির তলায় লীন হয়েছে। মাত্র ৫টি সিঁড়ি এখন দেখা যায়। এই মন্দিরের খ্যাতির কারনেই এই স্থানের নাম মন্দিরবাজার। পূর্বে উল্লেখ করেছি—পুত্র শিবদেবের (সন্তোষের) জন্মলাভের পূর্বে কেশবরাম কাশীর বিশ্বনাথকে স্বপ্নে দর্শন করেন। সেজন্য তিনি পুত্রের নাম শিবদেব রেখেছিলেন। আর মন্দিরবাজারে শিবমন্দির নির্মাণ এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাও সেই কারণে।

বড়িশায় এসে ২৫তম পুরুষ কেশবরাম সমাজবিন্যাসের জন্য বিশেষ সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম দিকে যে সমাজবিন্যাস সৃষ্টি করেন তা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। মূলত তিনিই তৎকালীন বড়িশা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণপুরুষ ছিলেন। কালীঘাট কেশবরামের জমিদারভুক্ত ছিল। সেজন্য তিনি কালীঘাটের আদি গঙ্গার তীরে বসে জপতপ করতেন।

কেশবরামের মৃত্যুর পর বড়িশা বাড়িতে বংশবৃদ্ধির কারণে পাশাপাশি বসবাসের স্থানাভাব ঘটল। স্থানাভাবের কারণে কিছুটা পারস্পরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি হল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণদেব রায় পূর্ব বড়িশায় 'বড়বাড়ি' নামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলরামবাটি বা কালীকিঙ্কর বাটি, মেজো বাড়ি, মাঝের বাড়ি, বেনাকি বাড়ি, মহেশভবন, যদুনাথ ভবন, নতুন বাড়ি নামে শরিকদের ভিন্ন ভিন্ন বাড়ি বা বাসস্থান তৈরি হল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কুশল রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রামদুলাল মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণের নদের পশ্চিমতীরে জমিদারী লাভ করে সপরিবারে চলে গিয়ে সেখানে খেপুত বাড়ির সূচনা করেন।

কেশবরামের তৃতীয় পুত্র রায় রঘুদেব মজুমদার চৌধুরী সাঁজের আটচালার দক্ষিণদিকে সম্ভবত ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে পৃথক বসত বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পৃথক দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। রঘুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র বলরামের নামানুসারে রঘুদেবের বসতবাটি পরবর্তীকালে 'বলরামবাটি' নামে পরিচিত হয়। বলরামের বংশে কালীকিঙ্কর নামে এক স্বনামধন্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রভাবশালী জমিদার এবং সমাজসেবী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামানুসারে বলরামবাটি পরবর্তীকালে "কালীকিঙ্কর ভবন" নামে পরিচিত হয়। কালীকিঙ্কর রায় চৌধুরীর নামে বড়িশা অঞ্চলে একটি রাস্তাও আছে। কালীকিঙ্কর আপন জমিদারির মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক নবজাগরণ আনয়ন করেছিলেন। 'কালীকিঙ্কর ভবনে' এখনও পূর্বের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 'কালীকিঙ্কর ট্রাস্ট' নামে এই বাড়িতে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আছে,—যা এ বাড়ির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

কেশবরাম কাশীর বিশ্বনাথের স্বপ্নদর্শনে যে সন্তান লাভ করেন তার নাম রাখেন শিবদেব (১৭১০-৯৯)। শিবদেব ২৬ তম সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের সন্তান। তিনি স্বনামধন্য এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। দানশীলতা এবং উদারতার জন্য তিনি 'সন্তোষ' নামেই পরিচিত ছিলেন। কারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করাই ছিল তাঁর ব্রত। তিনিও দক্ষিণবঙ্গের সমাজপতি ছিলেন। জমিদার হিসেবে ভূমিসংস্কার এবং প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পাদন করে গেছেন। দাতা হিসেবেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কৃষক সম্প্রদায়কে তিনি লক্ষাধিক বিঘা জমি দান করেছিলেন। বর্তমান কালের প্রশাসনে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের যে রীতি লক্ষ করা যায়—প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে দূরদর্শী এবং প্রজাদরদি সন্তোষ কুমার রায় চৌধুরী (শিবদেব) তার সূচনা করে গেছেন। গরিব ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর এবং দেবসেবার জন্য দেবোত্তর প্রচুর ভূসম্পত্তি তিনি অকাতরে দান করেছেন। কন্যা পুঁটিরানির বিবাহকালে সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশীয় জামাতা গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এক লক্ষ বিঘা জমি যৌতুক স্বরূপ সম্প্রদান করেছেন। সন্তোষ রায় চৌধুরীই কালীঘাটের

বর্তমান কালীমন্দির নিজ ব্যয়ে এবং নিজ রুচিসম্মতভাবে নির্মাণের কাজ শেষ বয়সে শুরু করেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ পরলোকগমন করায় তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি রাজীবলোচন ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। কথিত আছে মন্দিরটি নির্মাণ করতে দুশো বছর পূর্বে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।

বড়িশার বসতবাড়িতেও অর্থাৎ সাবর্ণ পাড়ায় তিনি অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য দেবমন্দির নির্মান করেন। এমনকি দেবসেবার পরিচালন ব্যবস্থাও নির্ধারণ করে যান।

যৌবনে ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে সন্তোষ রায় মাতুলালয়ে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গিয়ে সেখানে মন্দির এবং দেবতার মূর্তি দেখে মুগ্ধ হন। পরে তিনি অনুরূপ মন্দির ও মূর্তি বড়িশা বাড়িতে স্থাপন করেন। উক্ত দেবদেবীর সিংহাসনে লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরীর দ্বিতীয় পত্নী পতিব্রতা শ্রীমতী সহস্রদল বাসিনীর স্মরণে তাঁর নাম লেখা আছে। এরপর চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী অন্নপূর্ণা মন্দির তৈরি করেন। বড়িশার দোলমঞ্চ এবং দ্বাদশ শিবের মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি সুচারুরূপে পরিচালনার ব্যবস্থাও তিনি করে যান। সন্তোষ রায় চৌধুরীর সময় সাঁঝার আটচালার মূল ও প্রথম দুর্গাপূজা বিশেষ খ্যাতি ও প্রচারের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

একবার কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কালীঘাটে সন্তোষ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র হাতি, ঘোড়া, পালকি, পাইক-বরকন্দাজসহ রাজকীয় সাজে উপস্থিত। কিন্তু সন্তোষ রায় হাজার-হাজার চার মেলের পণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণ নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উপহাস করে বললেন--কই, আপনার হাতি, ঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজ?

উপস্থিত গণ্যমান্য ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়ে সন্তোষ রায় বললেন—এঁরাই আমার মান-সম্মান, প্রতিপত্তি, হাতি-ঘোড়া নয়। এঁদের আমি লক্ষাধিক ব্রহ্মোত্তর জমি দান করে স্থিতি করেছি।

সন্তোষ রায়ের কথায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র লজ্জাবোধ করলেন।

ইংরেজ তাঁবেদার হতে না পারার জন্য সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণ সন্তোষ রায়ের শেষ জীবনে অনেক জমিদারি এলাকা হারালেন। সেইসঙ্গে নিজেরাও ভাগ-বাঁটোয়ারায় ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় অর্থনৈতিক দুর্বল হয়েও পড়লেন।

ছাব্বিশতম বংশধর কৃষ্ণদেব (জন্ম ১৬৮২ খ্রিঃ) অনেক পূর্বেই ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে নিমতা-বিরাটিতে থাকাকালেই পূর্ব বড়িশায় ৫৪ বিঘা সম্পত্তির ওপর বসতবাটির পত্তন শুরু করেছিলেন। সে সময় কৃষ্ণদেব প্রাসাদোপম যে বসতবাটি নির্মাণ করেছিলেন—তা এতদঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা। এই অট্টালিকার কারুকার্য দর্শনীয়। অট্টালিকার

সম্মুখে বৈঠকখানা, দুর্গাদালান এবং তোরণ এই অট্টালিকার গাম্ভীর্য ও মহিমা বৃদ্ধি করত। অবশ্য বর্তমানে তার অধিকাংশই ভগ্নপ্রায়। এই ভদ্রাসনের বিশালতা এবং ভাব গাম্ভীর্যের কারণে এই বাড়ি জনসাধারণের নিকট সহজেই 'বড়বাড়ি' নামে চিহ্নিত এবং পরিচিত হতে পেরেছিল। আজও কৃষ্ণদেবের এই বাড়িকে বড়িশার মানুষ 'বড়বাড়ি' নামে জানে। এই বড়বাড়িতে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ নিমতা থেকে সপরিবারে কেশবরাম বড়িশায় চলে আসার পরের বছর দুর্গাপূজা শুরু হয়। সেই থেকে এখনও বড়বাড়িতে ভক্তি ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে দুর্গাদেবীর পূজার্চনা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

দুর্গাপূজার সূচনা হওয়ার দুবছর পরে অর্থাৎ ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে বড়বাড়িতে রথযাত্রা উৎসব আরম্ভ হয়। এই রথযাত্রা উৎসব বর্তমানে 'বড়িশা রথযাত্রা উৎসব' নামে পরিচিত। প্রতিবছর এই রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। জনসমাগম হয় প্রচুর।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের অন্যান্য বংশধরগণের ন্যায় কৃষ্ণদেবও প্রজানুরাগী এবং সুপ্রশাসক ছিলেন। তিনি সমগ্র চব্বিশ পরগনার মধ্যে বিচক্ষণ প্রজাবৎসল জমিদার হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

পিতৃনির্দেশেই কৃষ্ণদেব শিবদেব (সন্তোষ), কল্যাণ এবং কুশলের অভিভাবক থাকলেও শিবদেব যোগ্য এবং সুব্যবস্থাপক হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে কল্যাণ এবং কুশল কৃষ্ণদেবের নিকট না থেকে শিবদেব অর্থাৎ সন্তোষ রায়ের নিকট থাকতেন। কিছুকাল পরে কল্যাণ অন্যত্র জমিদারি লাভ করে চলে যান। তাঁর বংশে চাঁচোলের রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী উল্লেখযোগ্য এক বংশধর। আর ষষ্ঠ অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশল সন্তোষের সহিত আটচালা বাড়িতেই বসবাস করতেন।

পরবর্তীকালে কুশলের জ্যেষ্ঠপুত্র সাতাশতম বংশধর রামদুলাল (জন্ম আনুমানিক ১৭৩৯ খ্রিঃ) মেদিনীপুর জেলার রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে চিতুয়া বা চেতুয়া পরগনার জমিদারি লাভ করে খেপুত উত্তরবাড় গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

তৃতীয় পুত্র রামগোপাল আটচালা বাড়ির দক্ষিণে নতুন একটি বসতবাড়ির পত্তন করেন। এই বসতবাটির নাম 'কালীকুটির' এই বাড়িতে কোনোদিন দুর্গোৎসব হয়নি। বড়িশার শ্মশানকালী মন্দির এবং হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা বর্তমানে 'কালীকুটির' ভবনের উল্লেখযোগ্য অক্ষয়কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

রামগোপালের সহিত তাঁর অপর দাদা রামরাম বাস করতেন। কিন্তু ছোটো ভাই রাধাচরণ 'নূতন বাড়ি' নামে পৃথক বাসভবন নির্মাণ করেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে এই বাড়ি দুর্গাপূজা শুরু হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

কৃষ্ণদেবের একমাত্র সন্তান সাতাশতম বংশধর নন্দদুলাল বা নন্দলাল (জন্ম ১৭২২ খ্রিঃ) পিতার জমিদারি ব্যতীত নিজ প্রচেষ্টায় সিমলা, বেলেঘাটা প্রভৃতি কয়েকটি মৌজার

অতিরিক্ত জমিদারি লাভ করেছিলেন। পৈতৃক খাসপুর পরগনার জমিদারিও তিনি দক্ষতার সঙ্গে দেখাশোনা করতেন। পিতার মতো তিনিও দক্ষ এবং উদার প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। বিষয়-সম্পত্তি এবং জমিদারি তাঁর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনাকে ধ্বংস করতে পারেনি। তাই তিনি পরে আধ্যাত্মিক সাধনার একজন উচ্চকোটির সাধক হতে পেরেছিলেন। সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা করুণাময়ীর মাত্র সাত বছর বয়সে অকালমৃত্যু ঘটলে নন্দদুলাল শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কন্যার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত টালিগঞ্জের ব্রিজের নিকট আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরের শ্মশানভূমিতে এক দক্ষিণাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এক সহাস্য বালিকার অবয়ববিশিষ্ট দেবী নির্মাণ করেন এবং নিজ কন্যার নামানুসারে এই দেবী 'করুণাময়ী' নামে পরিচিত হন। করুণাময়ী দক্ষিণাকালীর মন্দিরটি একটি অপরূপ নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের পাশে দ্বাদশ শিব প্রতিষ্ঠা করে তাঁদেরও মন্দির নির্মাণ করে দেন। নন্দদুলালের এসব সৃষ্টি ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে পরে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রূপায়িত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি—একটি মাত্র মূল্যবান কষ্টিপাথরেই শিব এবং করুণাময়ী কালীমাতার সপ্তবর্ষীয়া বালিকামূর্তি খোদিত হয়েছে। কী অপরূপ শান্ত হাস্যময়ী মাতৃমূর্তি। এখানে কালীমাতা করালবদনা নন। দক্ষিণ কলিকাতার এই করুণাময়ী কালী দর্শনের জন্য নিত্য বহু ভক্তসাধারণ উপস্থিত হন। করুণাময়ী কালিকা দেবীর সম্বন্ধে শোনা যায় করুণাময়ী তাঁর পিতা নন্দদুলালকে স্বপ্নে বলেছিলেন—"তুমি কেঁদো না। প্রতিদিন তুমি সকালে আদিগঙ্গার তীরে যেয়ো। সেখানে একটি কালো কষ্টিপাথর দেখতে পাবে। তুমি সেই পাথর দিয়ে তোমার ইষ্টদেবীর মূর্তি তৈরি করো। সেই মূর্তির মধ্যেই আমাকে দেখতে পাবে।" নন্দদুলাল সেজন্য কালীমূর্তিটিকে কন্যারূপিণী এক বালিকা বেশে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়েছেন।

নন্দদুলালের বংশধর মনিমোহন এই দেবস্থানের পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। অসিত রায় চৌধুরী সেবায়েত হিসেবে মন্দিরের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী এবং সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমানে তার সুযোগ্য পুত্র অশোক কুমার রায় চৌধুরী মন্দির পরিচালনা করছেন।

গঙ্গাসাগর তীর্থ করে রানি রাসমনি প্রত্যাবর্তনের পথে করুণাময়ী কালীদেবী দর্শন করে ভাবাপ্লুত হন। তিনি বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত কোনা সমাজে জন্মগ্রহণ করলেও কুমারহট্ট হালিশহরের কন্যা। হালিশহরে সাবর্ন রায় চৌধুরীদের দেবদেবীর গুণমাহাত্ম্য এবং অলৌকিক দৈবভাবে বাল্যকাল থেকেই রাসমনির অন্তরে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়। বর্তমানে করুণাময়ী মূর্তি এবং মন্দির দর্শন করে পরবর্তীকালে 'মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানিকে' দক্ষিণেশ্বরে অনুরূপভাবে ভবতারিণীর

মন্দিরের নকশা তৈরি করতে নির্দেশ দেন। বলাবাহুল্য, তাঁর নির্দেশেই দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীদেবীর মন্দির এবং সেই সঙ্গে দ্বাদশ শিবের মন্দির নির্মিত হয়। অবশ্য করুণাময়ীর পূর্বের মন্দির বর্তমানে দেখা যাবে না। কারণ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সেই মন্দিরের অবলুপ্তি ঘটেছে। সেই স্থানে নির্মিত হয়েছে নতুন মন্দির। মন্দিরচত্বরও নতুন রূপে ও সাজে সজ্জিত হয়েছে। এমনকি দ্বাদশ শিবের মন্দিরগুলিকেও নতুন করে সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

রানি রাসমনির স্মৃতিকল্পে এই মন্দিরের পাশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ এই সভাগৃহের উদ্‌বোধন করেন। এখানে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব, দীপান্বিতা কালীপূজা ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

নন্দদুলালের (নন্দলালের) দ্বিতীয় পুত্র (মেজো) আটাশতম পুরুষ রামচরণ আটচালা বাড়ির দক্ষিণে স্বতন্ত্র বাসস্থানের পত্তন করেন। তাঁর স্বর্গত পিতামহ কৃষ্ণদেবের নামানুসারে 'কৃষ্ণগোবিন্দ লজ' নামে এই বাসস্থানের নামকরণ করেন। রামচরণ তাঁর নতুন বাসস্থানে ১৭৬০-৬৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দুর্গাপূজা করতে শুরু করেন। বর্তমানে রামচরণের বংশধরদের বাড়ি 'মেজ বাড়ি' নামে পরিচিত। রামচরণের আর এক পৌত্র উমাচরণ পরে পৃথক বাসস্থান তৈরি করেন। সেই বাসস্থান উমাচরণের পুত্র যদুনাথের নামানুসারে 'যদুবাবুর বাড়ি' নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে লোকে 'যদুনাথ ভবন' নামেই এই বাড়িটিকে চেনেন। পূর্বে যদুনাথ ভবনে দুর্গাপূজা হলেও বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে।

নন্দদুলালের জ্যেষ্ঠপুত্র রাঘবেন্দ্র, কৃষ্ণদেব পূর্ব বড়িশায় যে বাসস্থানের পত্তন করেছিলেন, তিনি সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। রাঘবেন্দ্র প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। তিনিই প্রথম 'বাড়িশাধিপতি' উপাধি লাভ করেন।

ঊনত্রিশতম পুত্র তারিণীচরণ হলেন রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। তিনি পিতার জমিদারি এবং সামাজিক কাজকর্মে সর্বদা সহায়তা করতেন। এমনকি ধর্মীয় কার্যেও পিতাকে তিনি অনেক সহযোগিতা করতেন। ফলে রাঘবেন্দ্র এবং তারিণীচরণের সময়ে 'বড়বাড়ির' দুর্গোৎসব রথযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। তখন এই উৎসবগুলি বেহালা-বড়িশা-ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বড়িশায় বর্তমানে যে জায়গা 'সখের বাজার' নামে পরিচিত, সেখানে তারিণীচরণই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে (সম্ভবত শেষ দশকে) সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণের প্রয়োজন এবং সখের তাগিদে সাপ্তাহিক বাজার বসিয়েছিলেন। সেই বাজারেরই পরবর্তীকালে নাম হয় 'সখের বাজার'। তবে এই সখের বাজারের পত্তন হয়েছে মাঝের আট (মাঝের হাট) থেকে যখন কে-এফ্ রেল (কালীঘাট-ফলতা) চলত তার পূর্বে। কারণ ওই রেলপথ ছিল

বর্তমান জেমস্ লঙ্ সরণি বরাবর পথে। রেলপথের স্টেশন ছিল মাঝের আট, ঘোলসাহাপুর, সখের বাজার, ঠাকুরপুকুর........... ইত্যাদি। সেজন্য অনেকে আজও জেমস্ লঙ্ সরণিকে রেললাইন বলে।

তারিণীচরণের আটটি পুত্রের মধ্যে মাত্র রামকুমার (১৭৯৮-১৮৩৫), কালীপদ এবং চন্দ্রকান্ত (১৮০৭-৭৮)—এই তিনজনের বংশরক্ষা হয়েছিল। এঁরা প্রত্যেকেই বড়বাড়িতে পৃথক পৃথক অট্টালিকা নির্মাণ করে বসবাস করতেন। সেইসব অট্টালিকার অস্তিত্ব আজও রয়েছে। চন্দ্রকান্ত দু-বার বিবাহ করেও বংশরক্ষা না হওয়ায় তিনি আটচালা বাড়ির যদুনাথ রায় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রকুমারকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু দত্তক পুত্রের মাধ্যমেও বংশরক্ষা না হওয়ায় চন্দ্রকান্তবাবু বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমনকি দুই পত্নীও অতঃপর কাশীবাসের মনস্থ করেন। তখন পত্নীদ্বয়কে সান্ত্বনা দেওয়ার নিমিত্ত এবং সংসারে রাখার উদ্দেশ্যে চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর বসতবাড়ির সম্মুখে অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পঞ্চরত্নবিশিষ্ট একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। অন্নপূর্ণামাতার মূর্তিটি ৩০০ ভরি সোনা দ্বারা গঠিত হয়। উক্ত মন্দিরের পাশে জোড়া শিবমন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। শিব বিগ্রহ দুটি নির্মিত হয়েছিল ১ মন রুপার দ্বারা। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৩০০ ভরি ওজনের সোনার অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্তিটি চুরি হয়ে যায়। তবে ১ মন ওজনের শিবমূর্তি দুটি এখনও আছে। সোনার অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ায় চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরীর বংশধরগণ ওই বছরেই (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে) নতুন করে অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরটিকেও ভেঙে নতুন মন্দির নির্মাণ করে দেন।

তারিণীচরণের অন্যতম পুত্র কালীকান্ত ছিলেন প্রতাপশালী জমিদার। তিনি এক ঘাটে 'বাঘে বলদে' জল খাওয়ানোর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি নিয়মিত আটটি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে কালীঘাট মন্দিরে যেতেন। মন্দিরে কালীমাতার নিত্য পূজার্চনা এবং সেবা সেবায়েত হালদারগণ করছেন কিনা তা তদারক করতেন। কালীকান্তর একটিমাত্র পুত্র ছিলেন। যজ্ঞেশ্বরী নামে তাঁর একটি কন্যাসন্তান ছিলেন। কালীকান্ত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশে দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কন্যা যজ্ঞেশ্বরীর বিবাহ দেন। যজ্ঞেশ্বরী দেবীও অপুত্রক ছিলেন। সুশীলেশ্বরী নামে তাঁদের একটি কন্যাসন্তান ছিলেন মাত্র। অল্পবয়সেই সুশীলেশ্বরী দেবীর বিবাহ দেন। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় সুশীলেশ্বরী দেবী এবং তাঁর স্বামী মারা যান। কন্যা এবং জামাতাকে হারিয়ে বিধবা যজ্ঞেশ্বরী দেবী সংসারে বড়োই একা হয়ে পড়েন। এই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বরচিন্তা এবং সাধনায় মগ্ন হন। ক্রমে তিনি মহা সাধিকা হন এবং করুণাময়ী কালীমন্দিরের নিকট তিনি আশ্রম নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ১

ফাল্গুন মাঘি পূর্ণিমা তিথিতে কন্যা সুশীলেশ্বরী নামে এক চণ্ডীদেবী মাতৃকার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকবার এসেছিলেন। যজ্ঞেশ্বরী দেবী ভক্তদের নিকট দিদি ঠাকরুণ নামে পরিচিতা ছিলেন। তিনি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

তারিণীকুমারের দ্বিতীয় পুত্র রামকুমারের দুটি পুত্র—সূর্যকুমার (১৮২৮-১৮৬৫) এবং তারাকুমার (১৮৩০-১৯১৯)। সূর্যকুমার নিঃসন্তান ছিলেন। তারাকুমারের প্রথম পক্ষের পুত্র লালকুমার এবং দ্বিতীয় পক্ষের চারপুত্র—অভয়কুমার, রাধাকুমার, প্রিয়কুমার এবং কামাক্ষাকুমার। এঁদের মধ্যে কেবল তারাকুমারের বংশধরগণই বড়িশার 'বড়বাড়ি'তে বসবাস করেন। তারাকুমারের মোট পাঁচ পুত্র ব্যতীত চার কন্যাও ছিলেন।

তারাকুমারের অপর ভ্রাতা সূর্যকুমারের বংশধর জমিদারির অংশ বিক্রি করে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কাশীবাসী হন।

একত্রিশতম পুরুষ সূর্যকুমার (১৮২৮-৬৫) শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন না। কিন্তু অল্প জীবনেই তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বড়িশার বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মেধাবী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। রেভারেন্ড জেমস্ লঙ তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সূর্যকুমারের হৃদ্যতা ছিল প্রচুর। এমনকি বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে উদ্বোধন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁকে প্রভূত সহায়তাও করেন। সেই সময় 'প্রাতিগ্রামে একটি বিদ্যালয়'—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আহ্বানে বিদ্যানুরাগী সূর্যকুমার সাড়া দিয়েছিলেন। সূর্যকুমার রক্ষণশীল মানসিকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে 'বড়িশা দেশহিতকারিণী সভা' নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়।

উক্ত বিদ্যালয়টি কয়েকবার আটচালা, বড়বাড়ি ও বেনাকিবাড়িতে স্থান পরিবর্তন করে স্থায়ীভাবে পরে চৌরাস্তায় একটি বাড়িতে পঠন-পাঠন শুরু করা হয়। সূর্যকুমার ওই বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয় এবং দেশহিতকারিণী সভার সম্পাদক ছিলেন। তারাকুমার, রাজেন্দ্রকুমার, ননীগোপাল প্রভৃতি কয়েকজন সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের বংশধর ১১ কাঠা জমি দান করেন। সেই জমিতেই বর্তমান চৌরাস্তার উত্তর-পূর্বদিকে বিদ্যালয়টি নির্মিত হয়েছে।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সম্পাদক শ্যামাবিলাস রায় চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বড়িশা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় নামে বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে এবং এই বৎসর থেকেই সরকারি অর্থ অনুদান মঞ্জুরিকৃত হয়। এই বিদ্যালয়ে পরে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী একজন স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই পরিবারের অপর

বংশধর ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী পরবর্তীকালে সরশুনা বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

শিবদেব বা সন্তোষ রায় চৌধুরীর বংশধরগণের এমন বৃদ্ধিলাভ ঘটায় সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা শুরু হয়। ফলে মূল সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার কয়েকটি পৃথক পৃথক বাড়ি বা বাসভবনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বেনাবন কেটে তৈরি বেনাকিবাড়ি, মাঝের বাড়ি, হরিশবাড়ি বা মহেশচন্দ্র ভবন ইত্যাদি। 'মহেশচন্দ্র ভবন' বর্তমানে 'চণ্ডীবাড়ি' নামে পরিচিত। মহেশভবনে হরচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বংশধর জগৎচন্দ্র মারা যাওয়ার পর ওই দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই বাড়ি চণ্ডীপূজার জন্য উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীপূজা

বড়িশা অঞ্চলে পূর্ব থেকেই বিপত্তারিণী মঙ্গলচণ্ডী পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। মহিলাগণ সংসারের মঙ্গল কামনায় এবং বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে ভক্তিসহকারে বিপত্তারিণী মঙ্গলচণ্ডী পূজা করতেন। পূজায় উৎসর্গীকৃত লাল সুতো সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি সংসারের প্রত্যেকের হাতে বিপদ মুক্তির কামনায় বেঁধে দেওয়া হত। পরে বাংলা ১২০০ সনে (ইং ১৭৯৩ খ্রিঃ) মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরীর বড়িশার চণ্ডীপূজার প্রবর্তন করেন। এরপরে হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী 'মহেশ ভবনে' চণ্ডীপূজার সূচনা করেন। ঐতিহ্যপূর্ণ এই চণ্ডীপূজা প্রথমে আক্রোশবশত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের দৌহিত্র বংশেও পূজা শুরু হয়। এই সময় বড়িশাবাসীগণ এই চণ্ডীপূজাটিকে 'দলাদলির চণ্ডী' বলতেন। দশ-বারো বছর এই 'দলাদলির চণ্ডী' পূজিত হয়েছিলেন। তারপর বেশ কয়েকবছর এই চণ্ডীপূজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রথম দিকে দুটি চণ্ডীপূজাই ছিল পারিবারিক চণ্ডীপূজা।

যে চণ্ডীপূজা এতাবৎকাল চলে আসছে এবং বড়িশা-সখের বাজার অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য এক চণ্ডীমেলার রূপ নিয়েছে, সেই চণ্ডীপূজা মূলত প্রথমে একটি তাম্রঘটে পূজা হত। হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বসতবাড়ি সংলগ্ন চণ্ডীপুকুর থেকে একটি তাম্রঘট পাওয়া যায়। শ্রীচণ্ডীর স্বপ্নপ্রদত্ত এই ঘট বলে প্রথমে তাম্রঘটেই চণ্ডীপূজা হত। তাম্রঘটের চণ্ডীপূজা শুরু হত শরৎকালে দুর্গাপঞ্চমী তিথি থেকে। তাম্রঘটের এই চণ্ডীপূজার ব্যাপারে হরিশচন্দ্রের পরিবারের একটি মানসিক ব্যথা-বেদনার কাহিনিও বিজড়িত।

হরিশচন্দ্রের দুই কন্যা দুর্গাদেবী এবং ক্ষুদিরাণী প্রায় একই সময়ে অল্পবয়সে উভয়েই বিধবা হন। তৎকালে শোকাহতা রমণীগণ দেবকার্যে লিপ্ত থেকে মানসিক সান্ত্বনা পাওয়ার পথ খুঁজতেন। সেই কারণে হরিশচন্দ্র দুই বিধবা কন্যাকে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত তাম্রঘটের চণ্ডীপূজার কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকার পরামর্শ দেন। বিধবা কন্যাদ্বয়ও পিতার পরামর্শমতো তাম্রঘটের চণ্ডীদেবীর সাজসজ্জা, বস্ত্রাচ্ছাদন, পূজার্চনা ইত্যাদি দেবকর্মে সময় অতিবাহিত করতেন। এইভাবেই বড়িশার চণ্ডীপূজা শুরু হয়। বর্তমানে শ্রীচণ্ডীদেবীর অপরূপ মূর্তি গঠন করে অগ্রহায়ণ মাসে পূজা এবং এই উপলক্ষে চণ্ডীমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বড়িশার আটচালা বাড়ির প্রাচীন দুর্গাপূজা ব্যতীত এখানে আরও কয়েকটি উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলির মধ্যে চণ্ডীমেলা, বড়োবাড়ির রথের মেলা, কালীকুটির বাড়ির হরিভক্তি প্রদায়িনী উৎসব ইত্যাদি।

বড়িশার চণ্ডীমেলা বর্তমানে একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। ভট্টপল্লির পণ্ডিতগণের সহায়তায় শ্রীচণ্ডীদেবীর মূর্তিটি সম্পূর্ণ ধ্যানমন্ত্র অনুসারে গঠিত হয়। তিনি নরমুণ্ডমালা বিভূষিতা, ত্রিনয়না, রক্তবসনা, তাঁর চারটি হাতে যথাক্রমে পুস্তক, রুদ্রাক্ষমালা, বরমুদ্রা এবং অভয় মুদ্রা। দেবী বন্ধুক পুষ্পবর্ণ (রক্তবর্ণা) এবং পঞ্চ অসুরের মুণ্ডের আসনে অধিষ্ঠিতা।

প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির শেষে দেবগণের উত্তরায়ণ পরিক্রমা সূচিত হয়। সুপ্তা দেবীকে জাগ্রত করার পক্ষে এই সময়টি বিশেষ উপযুক্ত। মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ মাস) মাসের শুক্লা অষ্টমীতে সেকারণে শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে বসে একপক্ষকালব্যাপী জাতীয় চণ্ডীমেলা। বড়িশার শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতার পূজার্চনায় তন্ত্র সাধনার, শক্তি সাধনার এবং কালী সাধনার সহিত স্ত্রীজাতীয় মঙ্গলচণ্ডী এবং বণিক জাতির কমলেকামিনী চণ্ডী একাকার হয়ে প্রকাশিতা এবং পূজিতা হয়ে আসছেন। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কানুপ্রিয় রায় চৌধুরী চণ্ডীপূজা ও মেলার অনুষ্ঠানে কোনো-না-কোনো পদে প্রায় প্রতি বছর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। ১৪১২ সনে তিনি অর্থসংগ্রহ দপ্তরের চেয়ারম্যানের পদে আসীন ছিলেন।

বড়িশা বড়োবাড়ির রথযাত্রা উৎসব

মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বড়িশায় প্রবর্তন করেন চণ্ডীপূজা এবং চণ্ডীমেলা। আর বড়োবাড়ির কৃষ্ণদেব রায় চৌধুরী ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তন করেন রথযাত্রা উৎসব এবং মেলা। এই উভয় উৎসব ও মেলা বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্যময় গৌরব।

বড়োবাড়িতে আজও রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই রথযাত্রা উৎসব বড়োবাড়িতে পারিবারিক বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হত। কিন্তু ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই রথযাত্রার উৎসব সার্বজনীন উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়। অবশ্য এর কারণও ছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ডায়মন্ডহারবার রোডের সম্প্রসারণের কারণে রথগৃহটি ভেঙে দেওয়া হয়। সরকার কোনো তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রথগৃহ পুনর্নির্মাণ না করে দেওয়ার কারণে রথটি আকাশতলে খোলা জায়গায় পড়ে থেকে রোদ-জলে বিনষ্ট হয়। রথের ওপরের পিতলের পাত বা চাদরের অলঙ্কারগুলি ক্রমশ চুরি হয়ে যায়। এই অবস্থাতেই দু-এক বছর রথযাত্রার উৎসব কোনোক্রমে অনুষ্ঠিত হলেও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই উৎসব সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। পরে সাবর্ণ রায় চৌধুরী বড়োবাড়ির বর্তমান সুযোগ্য বংশধর শ্রী গোরাচাঁদ রায় চৌধুরীর ঐকান্তিক উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় বড়িশা সার্বজনীন রথযাত্রা উৎসব কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সংগৃহীত অর্থে রথটি পুরীর জগন্নাথধামের দারুশিল্পীগণ মাত্র পনেরো দিনে প্রভু জগন্নাথদেবের কৃপায় রথটি নির্মাণ করে দেন। ওই বৎসরেই তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পাণ্ডে মহোদয়ের নিকট পূর্বের রথগৃহ বিনষ্ট করার দরুন ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে তাঁর নির্দেশে বড়োবাড়ির ভেতর-চত্বরে বর্তমান রথগৃহ সরকারের পূর্ত বিভাগ কর্তৃক ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। রথযাত্রা উৎসব বর্তমানে একটি আনন্দময় অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়েছে।

মহাপ্রভু জগন্নাথের মন্দির সখের বাজারে অবস্থিত। এই মন্দিরটি প্রথম নির্মাণ করেন তারাকুমার রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র লালকুমার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। পরে মন্দিরটির অনেকাংশ সংস্কারসাধন করা হয়। এই মন্দিরেই প্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলভদ্র অবস্থান করেন।

প্রতি বছর সখের বাজারের মন্দির থেকে প্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলভদ্রদেবের দারু নির্মিত বিগ্রহগুলি বিকালে ভক্তিসহকারে আনয়ন করে বড়োবাড়ির রথে অধিষ্ঠিত করানো হয়। তারপর যথারীতি নারকেল ভেঙে রথযাত্রার উদ্‌বোধন করা হয়। রথ পরিক্রমা করে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে বেহালার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে শীলপাড়ার ভজন আশ্রমের নিকট। পথ পরিক্রমার পর তিনটি বিগ্রহ বড়োবাড়ির পাশে বোসপাড়ায় হীরালাল বসুর বাড়িতে আটদিন অবস্থান করেন। তারপর উলটোরথের দিন পুনরায় রথযাত্রা সম্পূর্ণ করে বিগ্রহগুলি সখের বাজারের মন্দিরে আনা হয়।

কলিকাতার ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন এই রথযাত্রা উৎসব বর্তমানে বড়িশা সার্বজনীন উৎসব কমিটি কর্তৃক আয়োজিত হয়। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের এবং ভক্তবৃন্দের সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণও এক অপরিহার্য ব্যাপার।

বড়োবাড়ির দুর্গাপূজা এবং অন্নপূর্ণা পূজা আজও পারিবারিক উৎসব ও অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ আছে। তবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তারাকুমার রায় চৌধুরী পরলোকগমন করার পর থেকে এইসব পারিবারিক পূজা-অনুষ্ঠানে অনেকটা ভাটা পড়েছে।

বড়িশা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মধারার যে মিলন বঙ্গদেশে পরিলক্ষিত হয়, বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর সুযোগ্য তিন পুত্র—সীতানাথ, দেবেন্দ্রনাথ এবং হরিদাস তাঁদের পৈতৃক জমিতে একটি সাধারণ হরিসভাগৃহ নির্মাণ করেন। এই হরিসভার উন্নতি এবং উৎসব-অনুষ্ঠান নির্বাহ করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। সভার নামকরণ হয় 'হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা'। দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পদে মনোনীত হন। হরিসভায় প্রতি সন্ধ্যায় নামগান কীর্তন অনুষ্ঠিত হত। পরে ওই হরিসভা গৃহটি নষ্ট হয়ে গেলে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব পাকাবাড়িতে হরিসভা স্থানান্তরিত হয়।

দোলপূর্ণিমায় বা গুড ফ্রাইডেতে হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার প্রধান বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় নিতাই গৌরাঙ্গকে নিয়ে নামসংকীর্তনসহ বেশ একটি শোভাযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। আটচালা বাড়ির রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে সখের বাজার, ডায়মণ্ড হারবার রোড, শীলপাড়া প্রভৃতি স্থান প্রদক্ষিণ করে পুনরায় শ্মশান কালীমাতা তলার হরিসভায় ফিরে আসে। এলাকার নবীন-প্রবীণ নরনারী প্রত্যেকেই এই সময় কৃষ্ণপ্রেমে মেতে ওঠেন। বেশ ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, রামায়ণ গান, অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন, বাউল গান, গীতাপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সপ্তাহকালব্যাপী ভক্তি, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা বিনিময় করেন।

বাৎসরিক উৎসব ব্যতীত প্রতিবছর রথ, জন্মাষ্টমী এবং দোল-উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বড়িশা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার পরিচালন কমিটির সভাপতি মাননীয় শ্রী মৃগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং দীর্ঘদিনের সক্রিয় সম্পাদক মাননীয় শ্রী কানুপ্রিয় রায় চৌধুরী মহাশয়।

বর্তমানে বড়িশার যে হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত এবং পরিচালিত হচ্ছে— সেই হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার আরম্ভের ইতিহাস বড়োই চমকপ্রদ।

সীতানাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কাঠের কারখানা ছিল। কারখানার কিছু ভক্তকর্মী সময়-সুযোগ বা অবসর পেলেই গৌরাঙ্গের নামগান করতেন। নামগানের প্রতি

ভক্তকর্মীগণের অনুরাগ লক্ষ করে সীতানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় কারখানার পাশেই একটি সাধারণ গৃহ নির্মাণ করে দেন। কর্মীগণ সীতানাথ মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় সেই কুটিরে সন্ধে-সকাল নামসংকীর্তন করতেন। বড়িশার পূর্বপ্রান্তে চোঙার বন নামক স্থানে একটি হরিসভা ও মঞ্চ ছিল। কর্মীবৃন্দ সেখানে নামগানেও অংশ নিতেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করে ধন্য হতেন।

ভক্ত কর্মচারীবৃন্দের এই অনুরাগ দেখে হরিসভা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই হরিসভায় সংগীত চর্চারও বিশেষ একটি অঙ্গ ছিল। উৎসবের জন্য প্রতি বছর নতুন নতুন সঙ্গীত রচনা করে সুরারোপ করা হত। সংগীত রচনার ক্ষেত্রে বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর একটি গানের প্রথম কয়েক ছত্র উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

"সাধের বৃন্দাবন, ত্যজি নারায়ণ
কোথা যাবে আজি বল বিবরণ।
রাম লয়ে সনে হরষিত মনে,
রথ আরোহণ, কিসের কারণ?"

গায়ক হিসেবে মধুর কণ্ঠের অধিকারী স্বর্গত প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরীর নাম অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। তিনি গানগুলিতে নিজে সুরারোপ করে তাঁর ভাবমিশ্রিত মধুর কণ্ঠে পরিবেশন করতেন।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার সর্বকালে এবং সর্বস্থানে ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং অধ্যাত্মবোধের যে ধারক এবং বাহক এই বড়িশা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বর্তমানে বড়িশা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সুযোগ্য এবং ধর্মপ্রাণ সম্পাদক হলেন শ্রী কানুপ্রিয় রায় চৌধুরী মহাশয়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরও অগ্রগতি এবং উন্নতির পথে চালিত করছেন।

বড়িশা টাউন লাইব্রেরি

শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে বড়িশা সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার আর একটি স্বাক্ষর হল বড়িশা টাউন লাইব্রেরি।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দানস্বরূপ গৃহীত মাত্র ৫৬ খানি পুস্তক পুঁজি করে বেনাকি বাড়িতে 'বড়িশা স্টার লাইব্রেরী' নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে হরিচরণ রায় চৌধুরী, গুরুচরণ রায় চৌধুরী, বিনোদবিহারী রায় চৌধুরীর ভূমিকা

এবং সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। ১৯০৮-১০ খ্রিস্টাব্দে বড়িশার বহু শিক্ষিত মানুষ এই পাঠাগারের উন্নতিকল্পে এগিয়ে আসেন। পুস্তক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাঁরা পরে এই লাইব্রেরির নামকরণ করেন—'বড়িশা ফ্রী রিডিং ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরি'। ড. সুবীর কুমার গুপ্ত মহাশয়ের পিতামহ মতিলাল গুপ্তের বাড়ির নীচের তলায় আট টাকায় একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে সেখানে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করা হয়। পরে প্রসাদ দাস রায় চৌধুরীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি সাড়ে তিন কাঠা মতো নিষ্কর জমি অধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুই ভাইয়ে লাইব্রেরিকে দান করেন। ওই সময় লাইব্রেরির সভাপতি পদে কালী কুমার রায় চৌধুরী মনোনীত হওয়ায় উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি সভাপতি পদে আসীন থাকাকালে বড়িশার নাগরিকগণের সাহায্য ব্যতীত খুলনার জমিদার দেবকুমার রায় চৌধুরী এক হাজার টাকা দান করেন। তৎকালীন জেলা শাসক Mr. R. N. Blande গৃহনির্মাণ তহবিলে পাঁচশো টাকা সরকারি অনুদান মঞ্জুর করেন। এইসব অর্থেই উক্ত সাড়ে তিন কাঠা জমিতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নতুন পাঠগার ভবন নির্মিত হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের পরে নীলমণি রায় চৌধুরী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নীলমণি হঠাৎ দেহত্যাগ করলে বিনোদবিহারী রায় চৌধুরী উক্ত পদে আসীন হন এবং তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর সুনামের সঙ্গে লাইব্রেরির দায়িত্ব পালন করেন।

এর মধ্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করা হয়। এই বছরে প্রাক্তন সভাপতি মাখনলাল রায় চৌধুরীর বাড়ি সংলগ্ন বড়িশা ব্রহ্ম বিদ্যা সমিতির পাঠাগারে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত হয়। কারণ স্বর্গত মাখনলাল রায় চৌধুরীর পুত্রগণ ব্রহ্ম সমিতি পাঠাগারের সমস্ত পুস্তক এই লাইব্রেরিকে দান করেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সগৌরবে পালিত হয়। পরে সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের Memo No. $\frac{144-\text{EDN(D)}}{5\text{L}-56-61}$ dated 3.1.61 তারিখের অনুমতি পত্রানুসারে লাইব্রেরির নতুন নাম হয় 'বড়িশা টাউন লাইব্রেরী'। সেই সঙ্গে ৫২,০০০ টাকার একটি সরকারি অনুদানও পাওয়া যায়। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এই বড়িশা টাউন লাইব্রেরির শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল। এই পাঠাগারের বর্তমান পুস্তক এবং বাঁধানো পত্রিকার সংখ্যা প্রায় আঠারো হাজার।

আরও দু-একটি কথা

বড়োবাড়িতে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুর্গাদালানে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। এরপর কয়েক বছর বিভিন্ন কারণে ঘটপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দুর্গাপূজা বন্ধ

হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বড়োবাড়ির ভেতর মহলে প্যান্ডেল তৈরি করে পুনরায় দুর্গাপূজা শুরু করা হয়েছে। তবে বর্তমানে জীব বলিদান প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। এখন কেবল আটচালাবাড়ি এবং মেজোবাড়িতে জীব বলিদান অব্যাহত আছে। অন্যান্য বাড়িতে চালকুমড়ো আখ ইত্যাদি বলি হয়।

বর্তমানে বড়িশা সাবর্ণ রায় চৌধুরী ছয়টি বাড়িতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অবশিষ্ট তিনটিতে যদুনাথ ভবন, নতুন বাড়ি এবং চণ্ডীবাড়ি বা মহেশবাড়িতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় না।

(১) আটচালা বাড়ি ঃ সাবর্ণ পাড়া, বড়িশা, কলকাতা-৮
(২) মেজোবাড়ি ঃ সাবর্ণ পাড়া, বড়িশা, কলকাতা-৮
(৩) মাঝের বাড়ি ঃ নারায়ণ রায় রোড, বড়িশা, কলকাতা-৮
(৪) বড়োবাড়ি ঃ ডায়মন্ডহারবার রোড, বড়িশা, কলকাতা-৮
(৫) কালীকিঙ্কর ভবন ঃ কালীকিঙ্কর রোড, শীলপাড়া, কলকাতা-৮
(৬) বেনাকীবাড়ি ঃ নারায়ণ রায় রোড, বড়িশা, কলকাতা-৮

এর মধ্যে বড়োবাড়ি এবং মেজোবাড়ির দুর্গা প্রতিমার সিংহের মুখ অশ্বমুখের আকারে নির্মিত হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়কল্পে এরূপ বিধি প্রচলিত হয়েছে।

সাবর্ণ গোত্রীয় মহর্ষি বেদগর্ভের বংশধরগণের ধমনিতে যে ধর্মচেতনা এবং অধ্যাত্মবোধ সাড়া জাগাতো পরবর্তীকালে বিদ্যাধর, কামদেব ব্রহ্মচারী, লক্ষ্মীকান্ত, কেশবরাম, সন্তোষ কুমার, নন্দদুলাল প্রভৃতি বংশধরের জীবনেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী যোগানন্দ (জন্ম ১৮৬১ খ্রি.), মহাসাধিকা যজ্ঞেশ্বরী দিদিঠাকরুণ প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ সাধক-সাধিকাগণ আজ প্রত্যেকের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

কেবল ধর্মের কথাই বলি কেন—স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা উল্লেখ করতে হলে অভয়কুমার রায় চৌধুরীর মেজোছেলে নরেন্দ্রকুমার অনুশীলন কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছোটোছেলে জগদীশ কুমার খ্যাতনামা বাস্কেটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাজয়ী Y.M.C.A. ছাত্রদলের তিনি সদস্য ছিলেন। পরবর্তী বৎসরে তিনি ওই দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। প্রিয়কুমার রায় চৌধুরীর বড়োছেলে সুধাংশুকুমারও স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। সুধাংশু কুমার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো কট্টরপন্থী নেতাদের খুব নিকটের মানুষ ছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে সুধাংশুকুমারের উদ্যোগে 'বড়োবাড়ি'র ঠাকুরদালানে তাঁকে উপযুক্ত নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

কামাখ্যা কুমার রায় চৌধুরীর পুত্র বেণীমাধব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বড়িশা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্টা করেন। তা ছাড়া তিনি এলাকার যুব সংগঠন এবং যুব জাগরণের এক রূপকার ছিলেন। কালীকুমার এবং সনৎ কুমার ম্যাজিস্ট্রেট থাকার দরুন জীবনে গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

সুতরাং দেখা যায়—সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণ যুগের তাগিদে তাল মিলিয়ে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সমাজের বিভিন্ন কর্মে যুক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন।

আরও একটা কথা উল্লেখ করতে হয়—সারাবিশ্বে আজ সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করছেন। তাঁদের সকলের খোঁজখবর এখনও পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে যাঁদের খোঁজখবর পাওয়া গেছে তাঁদের সংখ্যা পনেরো হাজারের কম নয়। এর মধ্যে বড়িশা বাড়িতেই প্রায় আড়াই হাজার বংশধর বাস করছেন। এছাড়া নিমতা, বিরাটি, হালিশহর, মেদিনীপুর, হুগলি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁদের বসবাস। বড়িশা এবং ভারতের অন্যত্রও অনেক সাবর্ণ বংশধর বসবাস করছেন।

সাবর্ণ জমিদারের অক্ষয় কীর্তি—
ময়দা গ্রামে ময়দানবের দক্ষিণাকালীর স্বপ্নদর্শন

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কাজকর্মের সাক্ষ্য সারা বাংলাদেশ কেন বাংলার বাইরের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সেসব ঐতিহ্যপূর্ণ কর্মের সাক্ষ্য অধিকাংশই আজও অজ্ঞাত।

এরকম একটি ঐতিহ্যপূর্ণ সাক্ষ্য হাতের কাছেই বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ময়দা গ্রামে রয়েছে।

পূর্বে মেদিনীপুর জেলার গেঁয়োখালি এবং বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত তাড়দহ অঞ্চল পোর্তুগিজদের জমিদারি ছিল। ২৪ পরগনার তাড়দহ থেকে পোর্তুগিজদের একটি দল ময়দা অঞ্চলে চলে আসেন। তখন আদিগঙ্গা এই এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হত। ফলে পোর্তুগিজরা ময়দায় একটি বাণিজ্যশহর গড়ে তুলেন। এই অঞ্চলের নামকরণের অন্তরালে পোর্তুগিজদের 'মাদিয়া' শব্দ লুকায়িত। অনেকে বলেন ওই 'মাদিয়া' শব্দ থেকে এলাকার নাম 'ময়দা' হয়েছে। অবশ্য অন্য মতও আছে। প্রসঙ্গক্রমে তা আলোচনা করব। তবে ময়দা গ্রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকেই একমত। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে—বহড়ুর নিকটবর্তী আদি গঙ্গার তীরে 'ময়দা' একটি উল্লেখযোগ্য শহর ছিল।

এখানে একসময় ময়দা গ্রাম রেভিনিউ পরগনার কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে ময়দা গ্রামের উল্লেখ আছে।

ময়দা গ্রামে তৎকালীন পোর্তুগিজদের কাজকর্মের বা ব্যাবসাবাণিজ্যের কোনো নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায় না। তবে ময়দা গ্রাম বর্তমানে পাতালভেদী শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালীমাতার জন্য বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধকার সন্তোষ ছাটুই-এর বর্ণনা অনুসারে এই প্রাচীন মন্দিরটি ৭৩ শতক জমির ওপর অবস্থিত। পশ্চিমে দেবীর এক রিঘার একটি পুষ্করিণী আছে। কালীমাতার মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শিবমন্দির। আর পশ্চাতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত সাধক ভবানী পাঠকের পঞ্চমুণ্ডীর আসন। এই এলাকা একসময় জঙ্গলে আবৃত ছিল। বর্তমানে সে জঙ্গল আর নেই। তবে এখানে একটি প্রাচীন বকুল গাছ আছে। গাছটি বেশ সতেজ এবং বলিষ্ঠ। এই বকুল গাছের বৈশিষ্ট্য হল গাছটিতে ফুল ফোটে, কিন্তু অন্যান্য বকুল গাছের মতো ফল ধরে না। মন্দিরের উত্তরপূর্ব কোণে ঠাকুর ধর্মরাজ অবস্থান করছেন। ধর্মরাজের মন্দিরের পশ্চাতে কালীমাতার আর একটি পুষ্পরিণী আছে। এই পুষ্করিণীটি "কালীকুণ্ড" নামে পরিচিত। যে মায়ের সন্তান গর্ভে বা ভূমিষ্ঠ হবার পর মারা যায়—সেই সব সন্তান হারা মায়েরা এই কালীকুণ্ডে স্নান করে দেবীর মূল কবচ গলায় ধারণ করলে কোলে সন্তানলাভ করতে পারেন।

ময়দা গ্রামের এহেন কালীমাতার মন্দির এবং পূজাপাঠের ব্যাপারে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের যথেষ্ঠ অবদান আছে। একসময়—এই পরিবারের এক জমিদার গঙ্গাপথে বজরায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়ে ওই বকুল গাছের ডালে একটি বালিকাকে হাসতে-খেলতে দেখেন। জঙ্গলে গাছের ডালে বালিকাকে দেখে জমিদার অবাক হন। তিনি বজরা থামিয়ে বালিকাকে ধরতে যাওয়ার উদ্যোগ করলে মাঝিমল্লারগণ বলেন—বাবু, ও ডাইনি। বালিকা নয়। সত্যিই বালিকাটি জঙ্গলে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার বিস্মিত হলেন। রাত্রে জমিদার স্বপ্ন দেখলেন—বালিকা যেন তাঁকে বলছিল—আমাকে ধরার চেষ্টা করিস না। আমি ত্রেতা যুগের রামায়ণে বর্ণিত রাবণের শ্বশুর ময়দানবের আরাধ্যা দক্ষিণাকালী। কাল সকালে বকুল গাছের পাশে জঙ্গলে ঢাকা মাটির ঢিবি খুললে আমায় দেখতে পাবি।

পরদিন সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার লোক লাগিয়ে মাটি খুঁড়ে একটি শিলা দেখতে পান। কোনো মূর্তির সন্ধান পেলেন না। জমিদার হতাশ হলেন। স্বপ্নে আবার নির্দেশ পান—ওই শিলার মধ্যেই আমি আছি। আমি পাতালভেদী। আমায় তুলতে পারবি না। ওখানেই আমার মন্দির করে দে। সাবর্ণ জমিদার দক্ষিণা কালীমাতার মন্দির তৈরি করে দেন।

মন্দিরের মধ্যে পাতালভেদী ওই শিলাকেই দক্ষিণাকালীর ধ্যানে পূজা করা হয়। ময়দার শিলারূপিণী এই দক্ষিণাকালীর দেবী খণ্ডের মধ্যে একটি চক্র আছে। এই দক্ষিণাকালীর জন্য শুধু ময়দা গ্রামে নয় পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহেও এখনও কোনো বাড়িতে কালীপূজা হয় না। এই কালী ময়দানবের আরাধ্যা দেবী। সেজন্য অনেকে মনে করেন—'ময়দানব' শব্দ থেকে গ্রামের নাম 'ময়দা' হয়েছে।

বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের তৈরি পূর্বের সেই মন্দিরের অধিকাংশ বর্তমানে বিলুপ্ত। তবে সেই মন্দির যে বেশ বড়ো ছিল তা অনুমান করা যায়। বর্তমানের মন্দিরটি স্থানীয় জমিদার গদাধর চৌধুরী নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তবে এখনও এখানে কালীপূজার সময়ে সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের নামে সংকল্প করে জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

এই দক্ষিণাকালীর সারাবছরেই কোনো-না-কোনো উৎসব বা পূজা লেগেই আছে। ১লা বৈশাখের উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমায় পূজা, আষাঢ় মাসে বিপত্তারিনী এবং অম্বুবাচি, ভাদ্র মাসে তালনবমীতে উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠান মূল পূজা ব্যতীত লেগেই থাকে। বাৎসরিক পূজায় মহা অন্নভোগ উল্লেখযোগ্য। ২৪টি উনুনে মায়ের খিচুড়ি ভোগ রান্না হয়। ভোগ ঘরে ৬টি উনুনে মায়ের পৃথক ভোগ রান্না হয়। ভক্ত সাধারণের সমাগমে ময়দা কালীবাড়ি জমজমাট হয়ে উঠে।

এই ময়দা গ্রাম যেতে হলে শিয়ালদহ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে বহড়ু স্টেশনে নেমে রিক্সায় তিন কিলোমিটার মতো পথ গেলেই ময়দার পাতালভেদী দক্ষিণাকালীর মন্দিরে পৌঁছে যাওয়া যায়। সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্যপূর্ণ সৃষ্টির এটি এক অন্যতম সাক্ষ্য।

বড়িশাবাড়ির বর্তমান প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন

(ক) শ্রী রতিকান্ত রায় চৌধুরী :

সংগীতশিল্পী রতিকান্ত রায় চৌধুরী ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা হলেন—ননীগোপাল রায় চৌধুরী এবং আন্নাকালী দেবী। বড়িশা বাড়ির বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম গুণীসন্তান রতিকান্ত রায় চৌধুরী তাঁর পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অনুপ্রেরণায় সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে, সুবিনয় রায়,

পণ্ডিত কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য প্রভৃতির নিকট তিনি তালিম নেন। রতিকান্ত রায় চৌধুরী বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের নিয়মিত গায়ক ছিলেন। তিনি 'সংগীত প্রভাকর' এবং 'সংগীত প্রবীণ' উপাধি লাভ করেন। দীর্ঘ বারো বছর তিনি আকাশবাণীতে সংগীত পরিবেশন করেছেন। তিনি দু-বার বিদেশে সংগীত পরিবেশন করার আহ্বান পান। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রায় দু-মাস ধরে ইউনাইটেড কিংডাম্ সফর করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সংগীতা' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুরু করেন।

প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রতিকান্ত রায় চৌধুরীর নিকট রবীন্দ্র সংগীত এবং ঈশ্বরচিন্তা বেশি প্রিয়।

(খ) ড. শুভব্রত রায় চৌধুরী :

ড. শুভব্রত রায় চৌধুরী বড়িশা সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের একজন উজ্জ্বল স্বনামধন্য পুরুষ। ইনি খ্যাতনামা ক্ষীরোদ রায় চৌধুরীর পৌত্র এবং সাহিত্যসেবী বিভুদান রায় চৌধুরীর সার্থক পুত্র। মাতা ঊর্মিলা দেবী এবং পিতার আদর্শে শুভব্রত নিজেকে গড়ে তোলেন।

শুভব্রত রায় চৌধুরী ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে St. Xavier's College থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পরের বৎসরেই IBM-এ কনসোল অপারেটরের চাকরিতে যোগদান করেন। পরে যাদবপুর রিজিওনাল কম্পিউটার সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Sociology-তে এম.এ. করার পর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি Anthropological Cultural Philosophy নিয়ে পি.এইচ.ডি. করেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বিজড়িত। তিনি 'সমীক্ষা', 'সাবর্ণ বার্তা', 'বিজ্ঞান মেলা' নামক বিভিন্ন সাহিত্য ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

Eastern India Science Club Association, Dipannita Braille Institute, Institute of Computer Engineers & Management Kolkata, Computer Society of India, ভারত সরকারের National Council of Science Technology Communication Network, Science Association of Bengal প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি একান্তভাবে বিজড়িত। তা ছাড়া স্থানীয়ভাবে বড়িশা রোটারি ক্লাব, সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ প্রভৃতির সঙ্গেও তিনি ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। তিনি প্রায় দেড়শো গবেষণা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

সোলার এনার্জি, রঙিন মৎস্য চাষ প্রভৃতি শিল্পে প্রায় দেড় শতাধিক মানুষকে শুভব্রত উদ্যোগী করেছেন।

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেঘনাদ সাহা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে National Environmental Science Academy-এর ফেলো নির্বাচিত হন। এছাড়া School of Fundamental Research-এর আজীবন ফেলো মনোনীত হয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শুভব্রত মিশুকে এবং কর্মোদ্যোগী মানুষ। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের তিনি একজন কৃতী ও গুণী সন্তান।

ডঃ শুভব্রত রায় চৌধুরী ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে' প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর হাত থেকে 'জওহরলাল নেহেরু' পুরস্কার লাভ করেছেন। এই পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ টাকা এবং একটি স্বর্ণপদক। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কৃতী বংশধর ডঃ শুভব্রত দীর্ঘ ৩০ বছর কাল The Science Association of Bengal-এর সঙ্গে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কর্মে লিপ্ত আছেন।

(গ) শ্রী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী :

বড়িশাবাড়ির অন্যতম বর্তমান বংশধর হলেন শ্রী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (জন্ম ১৯৫৪ খ্রি.)। পিতা ভোলানাথ রায় চৌধুরী একজন বিশিষ্ট সেতারবাদক ছিলেন। দেবীপ্রসাদ শিক্ষায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। তবু কৈশোর থেকে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের প্রেরণায় সংগীতচর্চা শুরু করেন। সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি ও অনুরাগ। তিনি প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বাণীকুমার, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা সংগীতশিল্পীদের নিকট তালিম নেন। দেবীপ্রসাদ আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত প্রভৃতি গানের কয়েকটি ক্যাসেটও করেছেন। তাঁর সংগীতগুলি উচ্চ প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়েছে।

(ঘ) শ্রীমতী অনিতা রায় চৌধুরী :

শ্রীমতী অনিতা রায় চৌধুরী বড়িশা বাড়ির বধূমাতা। পিত্রালয় নদিয়া জেলার শিমুরালি গ্রামে। পিতামাতার নাম অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মিনতি দেবী। অনিতা দেবীর জন্ম ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বড়িশাবাড়ির শ্রী জয়ন্ত কুমার রায় চৌধুরীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। তারপর বিবাহসূত্রে তিনি কেবল সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের গৃহবধূ নন—এই পরিবারের একজন গুণগ্রাহী যোগ্যা রমণী।

শিক্ষায় অনিতা দেবী স্নাতক এবং কর্মজীবনে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের ক্যানিং রুলাল হস্‌পিটালের একজন কর্মী। অনিতা দেবীর বড়ো পরিচয় তিনি একজন সার্থক কবি। বিবাহের পূর্ব থেকেই সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার সম্বন্ধে বিশেষ করে এই পরিবারের প্রাচীন দুর্গোৎসব এবং ঐতিহ্যময় ঘটনাবলীর বিষয়ে তাঁর একটা অব্যক্ত কৌতূহল ছিল।

বিবাহসূত্রে এই পরিবারে আসার পর তিনি শুরু করেন সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারকে আরও বেশি করে করতে জানতে এবং তাঁর কাব্যে ও লেখনিতে তা প্রকাশ করতে। তাঁর সেই কবিতাগুলি মূলত লাল মোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়' নামক যেন এক অনবদ্য কাব্যমালা। কারণ তাঁর কবিতায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের ইতিহাস ও বর্ণনা যেন এক প্রাণবন্ত রূপ পায়।

অনিতা দেবীর কবিতার দু-একটি ছন্দ এখানে উল্লেখ করছি।

'বড়িশা এক ঐতিহাসিক শহর, ঘিরে অনেক গাথা
দ্বাদশ মন্দির, আটচালা আর আছে সাবর্ণদের কথা।
আছেন মহারাজা নিয়ে সৌরভ
বিশ্বের দরবারে তিনি আজ গৌরব।
....
....
জ্ঞানী-গুণী জনে বড়িশা পরিপূর্ণ
বড়িশাকে এরা সবাই করেছেন ধন্য।
চণ্ডীমেলার মহান ব্রত সর্বধর্মসমন্বয়,
এমন ঐতিহ্যবাহী স্থান আছে বা কোথায়?
অমর হোক বড়িশার পুরাতন ঐতিহ্য
সংস্কৃতির এ পীঠস্থান হোক সর্বজনগ্রাহ্য।"

অনিতা দেবী তাঁর সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার বিষয়ক কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে আসছেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বইমেলায় স্বামী জয়ন্ত রায় চৌধুরীর প্রচেষ্টায় অনিতা দেবী তাঁর 'অথ সাবর্ণকথা' কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন। কবিতা ব্যতীত ফিচার এবং গল্প লিখতেও অনিতা দেবী অভ্যস্ত। তবে কাব্য রচনাতেই তাঁর বেশি পছন্দ। কবিতা আবৃত্তি করার দক্ষতাও অনিতা দেবীর কম নয়। একমাত্র কন্যা দেবস্মিতা, স্বামী আর সংসার নিয়ে তিনি চান সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের একজন সার্থক সদস্যা হতে।

....

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের গুণী ও কৃতি সন্তানদের নাম উল্লেখ করতে হলে রাজনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বর্গত সুধাংশু রায় চৌধুরী, স্বর্গত ভবেন রায় চৌধুরী এবং স্বর্গত সমর রায় চৌধুরীর কথা বাদ দেওয়া যায় না। তাঁরা প্রত্যেকেই আপন-আপন কর্মক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

এছাড়া স্বর্গত কালী কুমার রায় চৌধুরী এবং স্বর্গত সনৎ রায় চৌধুরী সরকারি প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বে নিজ-নিজ কর্ম-স্বীকৃতির জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

বিশিষ্ট অর্থোপেডিক ড. দীপক রায় চৌধুরী, বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিদ শ্রী অমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী, বিশিষ্ট গবেষক এবং অধ্যাপক শ্রী জ্যোতির্ময় রায় চৌধুরী জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইঞ্জিনিয়ারে প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল শ্রী সনাতন রায় চৌধুরী, বিশিষ্ট চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট শ্রী রঞ্জন রায় চৌধুরী—এদের প্রত্যেকে নিজ-নিজ কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, এছাড়াও বর্তমানে সর্বশ্রী কানুপ্রিয় রায় চৌধুরী, নির্মল রায় চৌধুরী, শ্রীকুমার রায় চৌধুরী, মৃগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সুভাষ রায় চৌধুরী, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, সরোজ রায় চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে বিভিন্ন গঠনমূলক ও সমাজ সেবামূলক কাজে ব্রতী আছেন এবং আপন-আপন কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন।

নবীন সদস্যরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেমন অভিনয়, ব্যাবসাবাণিজ্য, ফটোগ্রাফি, ম্যানেজমেন্ট, আইন ব্যবসা, সাহিত্য, কম্পুউটার, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কর্মজগতে নিজ কৃতিত্বের গুণে বংশের নাম উজ্জ্বল করে চলেছেন।

বড়িশা
বংশতালিকা—৫
২১। কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় (জীয়া) (১৫৩৫/৪৮-১৬২০)
২২। রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী (১৫৭০-১৬৪৯)
২৩। রামকান্ত ১৫৯০-১৬৫০)
হালিশহর
গৌরীকান্ত (১৬০০-৬৯)
গোপাল (রায়)
বীরেশ্বর (চক্রবর্তী)
কৃষ্ণ (সিংহ)
গোপীকান্ত (রায়)
মহাদেব (১৬৩৯(?)-১৭৩০)
২৪। গন্ধর্ব (১৬১৮)
জনার্দন (১৬২০)
শ্রীমন্ত (১৬২৫-৮১)
কুলেশ্বর
প্রাণ
২৫। রাধাকৃষ্ণ
২৬। রামশঙ্কর (১৬৭৫)
বিরাটি
২৫। কেশবরাম (১৬৫০-১৭২৬)
বড়িশা

পরপৃষ্ঠায় –

২৫। রায়কেশবরাম মজুমদার চৌধুরী
(১৬৫০-১৭২৬)
২৬। রামদেব
(১৬৮০-১৭২৬)
২৭। রামভদ্র
কৃষ্ণদেব (১৬৮২ জন্ম)
বড়বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা
২৭। নন্দলাল (নন্দদুলাল)
(১৭২২ জন্ম)
রঘুদেব
(১৬৯০ জন্ম)
২৭। নারায়ণ
বলরাম
কালীকিঙ্কর ভবন
শিবদেব (সন্তোষ)
(১৭১০-১৭৯৯)
কল্যাণ
(১৭১৪ জন্ম)
কুশল (ক)
(১৭১৭ জন্ম)
২৮। রাঘবেন্দ্র
রামচরণ
জগন্নাথ
করুণাময়ী
(ঙ)২৯। তারিণীচরণ
বড়বাড়ি
২৯। কালিদাস
২৯। দুর্গাদাস
২৯। রামচাঁদ
মেজোবাড়ি
৩০। সতুরাম
৩১। রাজকৃষ্ণ
মেজোবাড়ি
৩০। উমাচরণ
যদুনাথ ভবন
২৭। রামনাথ
রামচন্দ্র
রামকিশোর
রামকৃষ্ণ
রামরাম
পুঁটিরানী
মাঝের আটচালা বাড়ি
২৮। রামকান্ত
রাধাকান্ত
(খ)
মুকুন্দ
(গ)
রামচরণ
(ঘ)

পরপৃষ্ঠায় →

(ক) ২৬। রায় কুশল মজুমদার চৌধুরী (জন্ম—১৭১৭)
২৭। রামদুলাল
খেপুত
রামরাম
রামগোপাল
কালীকুটির
রানীবালা
রাধাচরণ
নূতন বাড়ি
(খ) ২৮। রাধাকান্ত রায় চৌধুরী
২৯। তারাচন্দ্র
হরচন্দ্র
মহেশচন্দ্র ভবন
কৃষ্ণচন্দ্র
(গ) ২৮। মুকুন্দ রায় চৌধুরী
২৯। হরেকৃষ্ণ
৩০। পঞ্চানন
কৃষ্ণকিশোর
হরিনাথ
হরনাথ
রামকুমার
গদাধর
(?)
মাঝের বাড়ি
(ঘ) ২৮। রামচরণ রায় চৌধুরী
২৯। কৃষ্ণদেব
কালীচন্দ্র
রামতনু
শ্রীধর
গোবিন্দ
রামচাঁদ
হরিনাথ
বেনাকি বাড়ি

পরপৃষ্ঠায় →

* পরবর্তী সংস্করণে বড়িশা বাড়ির বিস্তারিত বংশতালিকা সংযোজিত হবে।

খেপুত-উত্তরবাড়

পূর্বের অধ্যায়ে নিম্নলিখিত অংশগুলি আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে পুনরায় সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর তারিখে গোবিন্দপুর কলিকাতা আর সুতানুটি গ্রাম তিনটি তেরোশো টাকায় ইংরেজ কোম্পানিকে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের পাঁচজন নবীন ও নাবালক বংশধরের মাধ্যমে বাৎসরিক খাজনার বিনিময়ে লিজ দেওয়ার মধ্যেই উক্ত পরিবারের জমিদারির সগৌরব মহিমা অনেকটা হ্রাস পেতে শুরু হল।

অন্যদিকে, পরিবারের বংশবৃদ্ধিও ক্রমশ: ঘটতে লাগল।

এই অবস্থা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে পঁচিশতম বংশধর রায় কেশবরাম মজুমদার চৌধুরীর বংশধরগণের জীবনে অধিক প্রকট হয়।

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেবের বংশধরগণ 'বড়োবাড়ি' 'মেজোবাড়ি' সৃষ্টি করেন। তৃতীয় পুত্র রঘুদেবের বংশধরগণ 'কালীকিঙ্কর ভবন'-এ উঠে এসে বসবাস শুরু করেন।

কেশবরাম প্রথম এবং দ্বিতীয় পক্ষের মোট ছয় পুত্র রেখে ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাকে তেরোটি চাক্‌লা আর বহু পরগনায় বিভক্ত করে নতুন রাজস্ব প্রথা চালু করলেন। দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন কেশবরাম। সেই সঙ্গে তিনি নবাব কর্তৃক স্বতন্ত্র 'রায় চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু মাত্র চার বছর পরেই তিনি পরলোকগমন করায় বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার আবার একটা নতুন ধাক্কা খেলেন। অবশ্য তাঁর যোগ্য সন্তান শিবদেব (সন্তোষ) রায় চৌধুরী হাল ধরার চেষ্টা করলেন। তিনি কেশবরামের স্থলে রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হলেন। কিন্তু সন্তোষ রায় চৌধুরী অতিরিক্ত দানশীল, প্রজাবৎসল এবং ধর্মনিষ্ঠ থাকায় রাজস্বের আয়ের মাধ্যমে জমিদারি বৃদ্ধির অন্তরায় হল। তার ওপর ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টাদের আক্রমণে বাংলার কৃষকগণ সবদিক দিয়ে আক্রান্ত হতে লাগলেন। ফলে, অন্যান্য জমিদারসহ সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারও জমিদারির রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হতে লাগলেন। তার ওপর তৎকালীন নবাব আলিবর্দি খাঁ অনন্যোপায় হয়ে মারহাট্টাদের 'চৌথা' দেওয়ার চুক্তি করে কোনোরকমে সামলাবার চেষ্টা করলেন। এর ফলে জমিদারদের ওপর নবাব অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে সেই "চৌথা" আদায় করতে লাগলেন। জমিদারগণ মহা মুশকিলে পড়লেন। সন্তোষ রায়কেও এই মুশকিল থেকে অব্যাহতি পেতে কম বেগ পেতে হয়নি।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ৬ নভেম্বর তারিখের বোর্ড প্রসিডিংস্-এ বড়িশার জমিদার সন্তোষ রায়ের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই প্রসিডিংস থেকে বোঝা যায় তখন জমিদারি রক্ষা করার জন্য সাবর্ণ রায় চৌধুরী জমিদারগণের কীরকম বেগ পেতে হত।

প্রসিডিংসটি হল—"সন্তোষ রায় প্রমুখ মাগুরা পরগনার জমিদারগণ বোর্ডের নিকট এক আবেদন পত্র পাঠাইয়া জানাইতেছেন যে তাঁহারা মাগুরা পরগনার জমিদারি জমা লইয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে অনেকটা কর্জ করিতে হইয়াছে। এই কর্জ নবাবি রাজস্বের জন্যই হইয়াছে। এই কর্জের জন্য তাঁহাদের নামে উত্তমর্ণরা 'কাছারি কোর্টে' অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এখন ঘটনাবশে জমিদারি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

এজন্য যে সমস্ত কড়ারে ইহা অর্জিত হইয়াছিল তাহা পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই হেতু তাঁহারা অনুরোধ করিতেছেন—'আপনারা আমাদের পাওনাদারদিগকে টাকা আদায়ের জন্য নবাব দরবারে অভিযোগ করিতে বলুন। ....'

এর থেকে উপলব্ধি করা যায় যে তৎকালীন জমিদারগণ তাঁদের জমিদারি সামলাবার জন্য কীপ্রকার রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ঝামেলায় পড়তেন।

ইতিমধ্যে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটেছে। মিরজাফর সিংহাসনে বসে ইংরেজদের তাঁবেদারি করে কোনোরকমে নবাবি সামলাচ্ছেন।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলেন।

শুরু হল রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নতুন অধ্যায়। অবশ্য নবাবের সঙ্গে জমিদারদের যে ব্যবস্থা ছিল ইংরেজদের ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা বহাল রইল। কিন্তু পার্থক্য ঘটল বর্ধমানের মহারাজাদের ক্ষেত্রে। তাঁরা তাঁদের জমিদারির জন্য পরে 'পাঁচশালা', 'দশশালা' বন্দোবস্ত করে ইংরেজদের অধীন স্বাধীনভাবে জমিদারি চালাতে লাগলেন। তবে জমিদার এবং প্রজাদের মধ্যে আদানপ্রদান আর আচরণের পরিবর্তন ঘটায় শুরু হল জুলুমি যুগের।

কেশবরামের বংশধরগণের মধ্যে জমিদারি এবং বসতবাড়ির ভাগ বিভাজন হতে শুরু হয়। বড়িশার আটচালা বাড়ির আশপাশের জমিসংস্কার করে বিভিন্ন বসতবাড়ি গড়ে উঠল। এমনকি বেনাবন কেটে 'বেনাকি বাড়ির' পতন হল। তবে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক এবং এইসব কারণে আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ঘটেনি।

সুতরাং সাতাশতম পুরুষ থেকে ত্রিশতম পুরুষের মধ্যে বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার কয়েকটি বাড়িতে বিভক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চাঁচোল, খেপুত উত্তরবাড় প্রভৃতি জায়গায় জমিদারি ক্রয় করে সরে যেতে লাগলেন। কারণ জমিদারবংশ তখনও ব্যাবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে আয় উপায়ের পথের কথা ভাবতে শেখেননি। জমিদারির রাজস্বকেই তাঁরা প্রধান উপার্জন মনে করতেন।

বড়িশাবাড়ি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি—কেশবরামের প্রথম পক্ষের চারপুত্র—রামদেব, কৃষ্ণদেব, রঘুদেব ও শিবদেব (সন্তোষ), আর দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্র—কল্যাণ ও কুশল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেবের পুত্র রামভদ্র কোনো পৈতৃক অংশ গ্রহণ করেননি। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের যে দলিলে ইংরেজদের তিনটি গ্রামের প্রজাস্বত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাতে নাবালক হিসেবে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব ৫৪ বিঘা জমির ওপর পূর্ব বড়িশায় 'বড়োবাড়ি'র পত্তন করেন। তৃতীয় পুত্র রঘুদেব নিজ অংশ মত আটচালা বাড়ির দক্ষিণে পৃথক বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। চতুর্থ পুত্র শিবদেব অর্থাৎ সন্তোষ রায় চৌধুরী (১৭১০-৯৯) আটচালা বাড়িতেই থাকতেন। পঞ্চম পুত্র কল্যাণ বড়িশার জমিদারি ত্যাগ করে অন্যত্র জমিদারি লাভ করে চলে যান। চাঁচোলের রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরি তাঁর বংশে একজন যোগ্য সন্তান। কনিষ্ঠ ভাই কুশল (জন্ম-১৭১৭)—যিনি সন্তোষ রায়ের থেকে বয়সে সাত বছরের ছোটো—তিনি সন্তোষ রায়ের সহিত আটচালা বাড়িতেই বাস করতেন।

ছাব্বিশতম পুরুষ কুশল রায় চৌধুরীর (জন্ম-১৭১৭) চারটি পুত্র এবং একটি কন্যা রানিবালা।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সাতাশতম পুরুষ রামদুলাল আনুমানিক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার চিতুয়া বা চেতুয়া পরগনার জমিদারি লাভ করে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে খেপুত উত্তরবাড় গ্রামে চলে যান। দ্বিতীয় পুত্র রামরাম অল্প বয়সেই পরলোকগমন করেন। তৃতীয় পুত্র রামগোপাল আটচালা বাড়ির দক্ষিণদিকে 'কালীকুটীর' নামে নতুন বসতি স্থাপন করেন। আব কনিষ্ঠ পুত্র রাধাচরণ আটচালা বাড়ির নিকটে দোলমঞ্চের বিপরীত দিকে নতুন বাড়ি এবং দুর্গাদালান নির্মাণ করেন। এই বাস্তু নতুন বাড়ি (নূতন বাটী) নামে বর্তমানে পরিচিত।

এরপর মেদিনীপুর জেলার রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে চেতুয়া পরগনার সেই সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা উচিত মনে করছি। এই আলোচনা থেকেই রামদুলাল রায় চৌধুরী কেন ওই এলাকায় ছোটো জমিদারি লাভ করেছিলেন তা উপলব্ধি করা যাবে। ওই এলাকার তখন হুজুরি জমিদার ছিলেন বর্ধমানের মহারাজগণ। গঙ্গার উভয়তীরে ইংরেজদের উপদ্রব থাকলেও তখন মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজদের সরাসরি উপদ্রব ছিল না। রামদুলাল রায় চৌধুরী মুলত সেই কারণেই মেদিনীপুর জেলায় জমিদারি ক্রয় করেছিলেন। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকাটি ছিল রূপনারায়ণনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। অর্থাৎ কলকাতা থেকে জলপথে যাতায়াতের সুযোগসুবিধার অনুকূলে।

এ প্রসঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক ড. প্রণব রায়, এফ-এ-এস (ক্যাল), এফ-আর-এ-এস (লন্ডন) কর্তৃক প্রদত্ত চেতুয়া (চিতুয়া) পরগনার সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্য— [অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ] বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"তখন কোম্পানির আমল। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হন। কোম্পানি তখন বাংলার নবাব এবং দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি সনন্দ লাভ করে নির্বিচারে গরিব প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে চলেছে। এর ফলে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ দেখা দিল বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের সংলগ্ন জঙ্গলমহালে ঘাটশিলা, রায়পুর প্রভৃতি স্থানে। নবাব ছিলেন নামমাত্র। কোনো ক্ষমতাই নেই। ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

চেতুয়া পরগনা বন্দোবস্ত হয়েছিল নবাব মুরশিদকুলি খানের সময় ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। তারও অনেক আগে চেতুয়া-বরদার পরাক্রান্ত জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহ (১৬৯৫-৯৬ খ্রি.) হয়ে গেছে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অনুগ্রহপুষ্ট ও রাজস্বসংগ্রাহক বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে। শোভা সিংহ বর্ধমানের রাজপ্রাসাদে নিহত হন আনুমানিক ১৬৯৬ খ্রি.-এর জুলাই মাসে। কিন্তু শোভা সিংহের আক্রমণে কৃষ্ণরাম নিহত হন তার আগে এবং তার পুত্র জগৎরাম গোপনে ঢাকায় পলায়ন করেন। পরে তিনি বর্ধমানে ফিরে এলে কিছুকাল পরে নিহত হন।

জগৎরামের পুত্র কীর্তিচন্দ্র বা কীর্তিচাঁদ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। শোভা সিংহের ভাই হিম্মৎ সিংহ দাদার মৃত্যুর পর গোপনে কিছুকাল থাকলেও ঘাটালের কাছে 'হেমন্তনগর' নামে (বর্তমান নিমতলা) একটি নগর স্থাপন করে রাজত্ব করতে থাকেন।

কিন্তু প্রবল পরাক্রমশালী কীর্তিচাঁদের সঙ্গে চন্দ্রকোণার জমিদার ও সম্ভবত হিম্মতের ঘাটালে ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে যে যুদ্ধ হয়, তাতে পরাস্ত হলেন তাঁরা, যদিও ১১৩৭ বঙ্গাব্দে (১৭৩০ খ্রি.) হিম্মতের একটি পাট্টায় আমরা বৈকুণ্ঠপুরের নিম্বার্ক মঠের তদানীন্তন মোহান্ত শুকদেবকে বিভিন্ন মৌজায় মোট ছেচল্লিশ বিঘা ভূমিদানের কথা জানতে পেরেছি। অতএব হিম্মৎ চেতুয়া পরগনায় তখনও ছোটোখাটো পত্তনিদার মাত্র ছিলেন। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রই ছিলেন এই অঞ্চলের বিরাট জমিদার যাকে 'হুজুরি' জমিদার বলা যায় অর্থাৎ তাঁরা সরাসরি নবাবের কাছে বা বাদশাহের কাছে রাজস্ব জমা দিতে পারতেন যে অধিকার ছোটোখাটো জমিদারের ছিল না।

হিম্মৎ সিং-এর আর কোনো পাট্টা বা দলিল ১৭৩০ খ্রি. পর উদ্ধার করা যায়নি। তাই খ্রি. আঠারো শতকের প্রথমার্ধের পরে তিনি জীবিত ছিলেন না মনে হয়। শোভাসিংহের বিদ্রোহে এবং তাঁর সহযোগী চন্দ্রকোণার রাজা এবং পাঠান সর্দার রহিম খাঁর সম্মিলিত বিদ্রোহে এই অঞ্চলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তার ফলে জমিজায়গার রাজস্ব আদায় না হওয়ায় নবাব মুরশিদকুলি খাঁ চেতুয়া পরগনা বন্দোবস্ত করার জন্য বহু কর্মচারী এই

অঞ্চলে পাঠিয়ে রাজস্ব ধার্য করেন জমির ওপর। কীর্তিচাঁদ বড়ো জমিদাররূপে দায়িত্ব লাভ করেন। (তাঁর শাসনাধিকার ছিল ১৭০১-৪০ খ্রি.)। এর পরে তাঁর পুত্র চিত্র সেন অল্পসময় ছিলেন জমিদার। চিত্র সেনের ভাই মিত্র সেনের পুত্র তিলকচন্দ্র এরপর জমিদার হয়ে এই অঞ্চলে শাসনাধিকার লাভ করেন (১৭৪৪ খ্রি.-৭০ খ্রি.)। তাঁর পুত্র তেজশ্চন্দ্র বা তেজচাঁদ ১৭৭০ খ্রিঃ থেকে ১৮৩২ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘকাল বর্ধমানের রাজা ছিলেন।

এই অঞ্চলে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর যাবতীয় সম্পত্তি বর্ধমান রাজারাই অনুগ্রহভাজনদের দান করতেন। দিঘি, মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাও তাঁদের আনুকূল্যে হত। এই সময় (১৭৭৫-৯০ খ্রি.) ইংরেজ কোম্পানি সরকার সারা রাজ্যে শাসন কায়েম করলেও বর্ধমান রাজা পাঁচশালা, দশশালা প্রভৃতি বন্দোবস্তের ফলে নির্দিষ্ট রাজস্ব ইংরেজ সরকারে জমা দিয়ে কতকটা স্বাধীন জমিদাররূপে থাকতেন এবং জমিজমা বিলি বন্দোবস্ত সব এঁরাই করতেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র দীর্ঘদিন (১৭৭০-১৮৩২ খ্রি.) গঙ্গার পশ্চিমে এইসব অঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য করতেন। পরবর্তীকালে চেতুয়া-দাসপুর অঞ্চলে নাড়াজোল রাজাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রানি শিরোমণির কাছ থেকে তাঁরা খ্রি. উনিশ শতকের প্রথম পাদে মেদিনীপুর জমিদারি লাভ করে শক্তিশালী জমিদাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু খ্রি. আঠারো শতকের শেষ দিকে বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রই বিশাল ভূখণ্ডের মুখ্য জমিদার ছিলেন। বরদা পরগনার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী এই সময়ে যেসব কাব্যের (চণ্ডীমঙ্গল, শীতলাবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা) পুঁথি রচনা করেন (১৭৭৪ খ্রি. পর্যন্ত), তাতে তিনি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র, তিলকচন্দ্র ও তেজশ্চন্দ্রের ভূরিভূরি প্রশংসা করেছেন এবং কবি তাঁর দেশে বাস করেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাই বর্ধমান রাজাদের আনুকূল্যে চেতুয়া-বরদা-চন্দ্রকোণায় যাঁরা নতুন ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে ভূস্বামী ছোটো জমিদারে পরিণত হতেন, তাঁরা সকলেই সরাসরি বর্ধমানরাজার অনুগ্রহ লাভ করতেন।

খ্রি. সতেরো শতকে শিলাবতী ও কংসাবতীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ছিল 'ভান' দেশ বা 'ভানরাজ্য'। ভানবংশীয় রাজারা ছিলেন সেই ভূখণ্ডের রাজা বা জমিদার। কিন্তু শিলাবতীর পূর্বভাগ 'মণ্ডলঘাট' পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কোম্পানির শাসনকালে এই স্থান চেতুয়া পরগনা নামে পরিচিত ছিল। নবাব মুরশিদকুলির সময় পরগনা বিভাগ হয় এবং সেসময় চেতুয়া, 'পরগনা' নামে পরিচিত হয়। তবে মুঘল আমলে, বিশেষ করে 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে চিতুয়া বা চেতুয়া একটি 'মহাল' ছিল। পরে 'মহাল' থেকে নাম হয় 'পরগনা'। রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরবর্তী ভূভাগের অনেকটা অংশ ছিল (বর্তমান নিম্ন দাসপুর) এই চেতুয়া পরগনার অন্তর্গত।"

....

অধ্যাপক ড. প্রণব রায়ের সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে বোঝা যায়, 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থানুসারে চিতুয়া বা চেতুয়া একটি মহাল ছিল। বাংলার নবাব মুরশিদকুলি খাঁয়ের সময় ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে পরগনা বিভাগ হয় এবং সেই সময় চেতুয়া মহাল থেকে চেতুয়া পরগনা নাম হয়।

রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলের অনেকটা অংশ—যা বর্তমানে নিম্ন দাসপুর নামে পরিচিত—এই চেতুয়া পরগনার অন্তর্গত।

মেদিনীপুরের শোভা সিংহের বিদ্রোহের পর—বিশেষ করে চুয়াড় বিদ্রোহের পর—চেতুয়া পরগনার জমিজায়গার রাজস্ব ঠিকমত আদায় হচ্ছিল না। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায় শোভা সিংহের আক্রমণে নিহত হওয়ার পর বর্ধমানের রাজপরিবার সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেও পরে পরাক্রমশালী কীর্তিচাঁদ রায়ের আমল থেকে বর্ধমান রাজপরিবার পুর্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন।

কীর্তিচাঁদের পর তার পুত্র চিত্র সেন—তারপর তাঁর ভাই মিত্র সেনের পুত্র তিলকচন্দ্র ১৭৪০-৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-বরদা প্রভৃতি পরগনার শাসনাধিকার লাভ করেন। বর্ধমানের রাজ পরিবার বাংলার নবাব এবং দিল্লির বাদশাহকে সরাসরি রাজস্ব জমা দিয়ে জমিদারি লাভ করতেন। ফলে বর্ধমানের রাজপরিবারই তখন এতদঞ্চলের একমাত্র 'হুজুরি' জমিদার। বর্ধমানের হুজুরি জমিদারগণ তাঁদের অনুগ্রহভাজনদের ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তি দান করতেন। বর্ধমানের রাজ পরিবারের সহিত বড়িশার জায়গিরদার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বরাবরই সুসম্পর্ক ছিল। বর্ধমানের রাজপরিবার—বিশেষ করে তিলক চন্দ্রের পর তেজশ্চন্দ্র বা তেজচাঁদ (১৭৭০-১৮৩২ খ্রি.) বর্ধমানের রাজা ছিলেন।

চেতুয়া পরগনা এবং বরদা পরগনার অনিয়মিত রাজস্ব আদায় হওয়ার জন্য বিচলিত হয়ে যখন বর্ধমানের রাজপরিবার বিশেষ করে রাজা তেজ চাঁদ উক্ত এলাকার নিমিত্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা কর্মচারী, পত্তনিদার, ছোটো জমিদারের খোঁজ করছিলেন—সেই সময় বড়িশার রামদুলাল রায় চৌধুরী পূর্বের সুসম্পর্কের ফলে চেতুয়া পরগনার আংশিক জমিদারি লাভ করার কাজে সচেষ্ট হয়ে উক্ত অঞ্চলে ছোটো জমিদারি লাভ করেন। এ কাজে সম্ভবত তাঁর জ্যেঠামশাই সন্তোষ রায় চৌধুরীর হস্তক্ষেপও ছিল। এই জমিদারি রামদুলাল বর্ধমানের তেজশ্চন্দ্র বা তেজচাঁদের নিকট সম্ভবত ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করেন। কারণ তেজচাঁদই তখন বিশাল ভূখণ্ডের মুখ্য জমিদার ছিলেন। তখন ইংরেজ কোম্পানি সারা রাজ্যে শাসন কায়েম করলেও বর্ধমান রাজারা পাঁচশালা, দশশালা প্রভৃতি বন্দোবস্তের ফলে নির্দিষ্ট রাজস্ব ইংরেজ সরকারে জমা দিয়ে কতকটা স্বাধীন জমিদাররূপে জমিজমা বিলি বন্দোবস্ত করতেন। তেজশ্চন্দ্রও (১৭৭০-১৮৩২ খ্রি.) দীর্ঘকাল গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে একচ্ছত্র আধিপত্য করেছেন।

বেদগর্ভের অধস্তন সাতাশতম পুরুষ রামদুলাল রায় চৌধুরী আনুমানিক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগনায় জমিদারি লাভ করেন। তখন নতুন-নতুন জমিদারি লাভ করার জন্য বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণ জীবনের তাগিদে বেশ তৎপর হয়ে পড়েছিলেন।

চেতুয়া পরগনার পূর্বাংশে রূপনারায়ণ নদ। সেই সময় রূপনারায়ণ নদের নাব্যতা ছিল প্রচুর। গঙ্গা নদীর মতো দিনে রাতে দুবার জোয়ারভাটা। সেই জোয়ারভাটা এবং বাতাসের সহায়তায় রূপনারায়ণ নদে বড়ো বড়ো বজরা, দু-হাজারমনী, এক হাজারমনী নৌকা ভেসে চলত তাম্রলিপ্ত, গেঁয়োখালি হয়ে কাটি গঙ্গার পথ ধরে কলিকাতায়। বজরা, নৌকায় অবশ্য পালছাড়া পাঁচ জোড়া, আট জোড়া পর্যন্ত দাঁড়ও থাকত।

রামদুলাল চেতুয়া পরগনার আংশিক জমিদারি লাভ করে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে খেপুত উত্তরবাড় মৌজায় (জে. এন নং ২২২) বাসস্থানের পত্তন করেন। তিনি প্রথমে একা কয়েকবার কলকাতা থেকে খেপুত উত্তরবাড় গ্রামে গিয়ে জমিদারি দেখাশোনা করেন। তারপর একটি মাটির বসতবাড়ি এবং পরে একটি মাটির ঠাকুরঘর নির্মাণ করেন। তারপর দু-এক বছরের মধ্যে পত্নী ও দুই পুত্রকে নিয়ে খেপুত উত্তরবাড়ের বাড়িতে যান। সেই সঙ্গে নিয়ে যান বাস্তুদেবতা রঘুনাথ জীউ নামক একটি নারায়ণ শিলা। রামদুলাল নিজের নামের সঙ্গে মনে হয় মিল রেখেই 'রঘুনাথ' নামক নারায়ণ শিলা সংগ্রহ করেছিলেন। পত্নী সঙ্গে নেন বড়িশা বাড়িতে থাকাকালীন গৃহকোণে নিত্য পূজা করার কাঠের লক্ষ্মীর সিন্দুরকৌটা আর মঙ্গলচণ্ডী নামক একটি পিতলের কৌটা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি—বড়িশা-বেহালা অঞ্চলের স্থানীয় মহিলাগণ মধ্যযুগ থেকেই বিপত্তারিণী মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘরে ঘরে সংসারের মঙ্গল কামনায় করে আসছেন। রামদুলালের পত্নীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। এর থেকে সহজে অনুমান করা যায়—রামদুলালের পত্নী অর্থাৎ খেপুত উত্তরবাড় বাড়ির প্রথম রমণী বেশ সুগৃহিণী এবং ধর্মনিষ্ঠা মহিলা ছিলেন।

ঠাকুরঘরে একটি সুন্দর শিশুকাঠের সিংহাসন তৈরি করে তাতে রাখা হয়েছিল শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউকে। আর সিংহাসনের একপাশে রাখলেন কৌটাধৃত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী আর শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী দেবীকে।

দেবতাগুলির নিত্য পূজার ব্যবস্থা হল। সকালে নৈবেদ্য আর অন্নভোগ। সায়াহ্নে আরতি আর ফলমিষ্টান্ন নিবেদন।

কাঠের সিংহাসনের সামনের দিকে নীচে বাটালি দিয়ে খোদাই করে লেখা ছিল ১১৮১ বঙ্গাব্দ। হিসাব করলে সেটা দাঁড়ায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ। এর থেকে বোঝা যায় রামদুলাল ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে যাওয়ার পর সিংহাসনটি নির্মাণ করে। ওই মাটির

ঠাকুরঘরেই দেবতাগুলি স্থাপন করেছিলেন। ওই মাটির ঠাকুরঘর এবং শিশুকাঠের সিংহাসন ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের বন্যা পর্যন্ত ছিল। বন্যায় মাটির ঠাকুরঘরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং তার চাপে সিংহাসনটিও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বর্তমানে কোনোরকমে মেরামত করে সেই ভাঙা আংশিক সিংহাসনকে পূর্বের আদলে রূপদান করা হয়েছে। তবে অনেক ভাঙা কাঠ বন্যার জলে ভেসে গেছে। সেই সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত '১১৮১ বঙ্গাব্দ' লেখা কাঠের টুকরোটিও হারিয়ে গেছে বা ভেসে গেছে।

খেপুত নামটি গ্রাম্যদেবী খেপুতেশ্বরীর নামানুসারে প্রচলিত। অবশ্য এই নামে কোনো মৌজা নেই। দক্ষিণবাড় (জে.এল. নং ২২৪) এবং উত্তরবাড় (জে.এল. নং ২২২) এই দুই গ্রামকে খেপুত বলা হয়। অবশ্য খেপুতেশ্বরী দেবীর মন্দির উত্তরবাড় মৌজায় অবস্থিত।

রামদুলাল খেপুতের উত্তরবাড় মৌজায় রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে ভদ্রাসন রচনা করেন। ভদ্রাসনটি পরিসীমার ক্ষেত্রফলসহ ৭৪ বিঘা অখণ্ড জমির ওপর অবস্থিত। রামদুলাল নিরাপত্তা এবং মর্যাদার প্রয়োজনে এই ভদ্রাসনের উত্তরে গড়, পূর্বে পাহাড় (পাড়), দক্ষিণ ও পশ্চিমের কিছু অংশে এলাকার জল নিকাশি নালা দ্বারা নির্দিষ্ট সীমানা রচনা করেন। আজও ওই সীমানা অটুট রয়েছে এবং উক্ত ৭৪ বিঘা ভদ্রাসনের মধ্যে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার ব্যতীত অন্য কোনো পরিবারের বসতি নেই।

এই ভদ্রাসনের উত্তর-পশ্চিমদিকে গুপ্ত রাজাদের আমলে ফিঙ্গা রাজপরিবারের বসতি ছিল। বর্তমানে তা প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত। এই এলাকাটি পূর্বে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের জমিদারির আমলে তাঁদের বেড় ছিল। ফলে এখনও অনেকে উক্ত এলাকাকে 'চৌধুরীর বেড়' বলেন। তবে বর্তমানে ওই বেড় উত্তরবাড় মৌজার ঘর পরিবারের সম্পত্তি। ৪০/৫০ বছর পূর্ব পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উক্ত বেড় এবং তার আশপাশের জমি থেকে মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন প্রস্তরখণ্ড উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। সেইসব প্রস্তরখণ্ড থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মন্তব্য করেছেন যে ফিঙ্গা রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

রূপনারায়ণ নদের তীরে উত্তরবাড় মৌজায় রামদুলাল বসতি স্থাপন করার ক্ষেত্রে ফিঙ্গা রাজাদের কথা-কাহিনি, খেপুতেশ্বরী দেবীর অবস্থিতি অনেকটা তাঁর চিন্তার এবং স্থান নির্বাচনের সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয়।

রামদুলাল রায় চৌধুরীর মধ্যেও সাবর্ণবংশীয় রীতি, আচরণ, কর্মপদ্ধতি এবং মানসিকতা পুরোপুরিই ছিল। তিনিও হালিশহরের পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় (পাঁচ শক্তি খান) এবং বড়িশার রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীর মতো স্বাবলম্বী হিন্দু সমাজ গঠনের জন্য উদ্যোগী হলেন।

পূর্বে খেপুত গ্রাম অর্থাৎ উত্তরবাড় এবং দক্ষিণবাড় মৌজা স্বাবলম্বী হিন্দু সমাজরূপে

গঠিত ছিল না। উত্তরবাড় মৌজায় একটি কায়স্থ পরিবার ছিল মাত্র। এই পরিবারের প্রথম পুরুষ জটাধর নাগ। তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন এবং তিনি ফিঙ্গা রাজবাটির দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। ফিঙ্গা রাজপরিবার বিলুপ্ত হলেও জটাধর নাগ উত্তরবাড় মৌজায় পশ্চিম প্রান্তে বেড় বাগানসহ বসতি স্থাপন করে গেছলেন। সেখানেই উক্ত নাগ পদবিধারি কায়স্থ পরিবারের বসবাস ছিল।

উত্তরবাড়ের খেপুতেশ্বরী দেবীর মূর্তিও প্রাচীন। মূর্তিটি প্রস্তর ফলকে খোদিত অষ্টভুজা মহিষমর্দিনীরূপ। পূর্বে দেবীর জন্য একটি মাটির দেবালয় ছিল। সম্ভবত বর্ধমানের রাজা কর্তৃক ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমানের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৪ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। মন্দিরের ওপরে পোড়া মাটির লিপিতে লেখা—

"শ্রীশ্রী মাতা খিপতেশ্বরি চরণে স্বরণং/ষুভমস্ত সকাব্দা ১৭০১/সন ১১৮৬/মাহ আশ্মিন তারিখ ...."

অর্থাৎ মন্দিরটি ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। কারণ সন ১১৮৬-এর সহিত ৫৯৩ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। অথবা শকাব্দ ১৭০১-এর সহিত ৭৮ যোগ করলেও খ্রিস্টাব্দ জানা যায়। এই দেবীর নাম খিপতেশ্বরী। এই নামানুসারে উত্তরবাড় এবং দক্ষিণবাড় মৌজাকে খেপুত বলা হয়। কিন্তু পূর্বে অনেকে উচ্চারণ বিভ্রম অনুসারে 'ক্ষিপ্ত' উচ্চারণ করতেন এবং 'ক্ষেপুতেশ্বরী দেবী' বলে থাকেন। তা থেকে এলাকার নাম 'ক্ষেপুত' লেখা হত। অবশ্য ডাকবিভাগ এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে 'খেপুত' লেখা হয়। বর্তমান 'খেপুত' নামটিই প্রচলিত।

খেপুতেশ্বরীর নিত্য আমিষ ভোগ হয়। মানসিক থাকলে নিত্যবলিরও বিধি আছে। তবে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী তিথিগুলিতে এবং কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজার সময় দেবীর বিশেষ পূজা হয়।

খেপুতেশ্বরী দেবীর পুরোহিতগণ উত্তরবাড় গ্রামেই পূর্ব থেকে বসবাস করছেন। বর্ধমানের রাজা খেপুতেশ্বরী দেবীর নিত্য পূজার্চনার জন্য তায়দাদভুক্ত ৩৬৫ বিঘা দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন।

দক্ষিণবাড় মৌজায় পরাশর গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবার বসবাস করতেন। তাঁদের চতুষ্পাঠী টোলও ছিল। এই পরিবার এখনও বসবাস করছেন।

উত্তরবাড় মৌজার নাগ পরিবারের অধিকাংশ বংশধর বর্তমানে দক্ষিণবাড় মৌজায় নতুন বসতি স্থাপন করেছেন।

উত্তরবাড় এবং দক্ষিণবাড় উভয় মৌজায় তখন উল্লেখযোগ্য ওই কয়েকটি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবার বসবাস করতেন। অবশিষ্ট গ্রামবাসীগণ ছিলেন কৃষক ও মজুর সম্প্রদায়ভুক্ত। রূপনারায়ণ নদের তীরে জীবিকার প্রয়োজনে বাস করতেন কুম্ভকার এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন।

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ মাকড়া পাথরের স্তরমণ্ডিত অসমান শক্ত গেরুয়া রঙের কাঁকর মাটিতে গঠিত। কিন্তু জেলার পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত চেতুয়া পরগনা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই জেলার পূর্ব সীমানা কাটিগঙ্গা অর্থাৎ হুগলি নদী আর ওই নদীর উপনদ রূপনারায়ণ নদের অববাহিকার পলিমাটিতে গড়ে ওঠায় এই অঞ্চলের মাটি নরম এবং উর্বর। রূপনারায়ণ নদ মেদিনীপুর জেলার পূর্ব সীমা বরাবর প্রবাহিত হয়ে তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের কিছুটা দক্ষিণে গেঁয়োখালির নিকট কাটিগঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। পরে এদের মিলিত প্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে রসুলপুর নদীর সঙ্গমের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।

বড়িশা থেকে মেদিনীপুরের খেপুত-উত্তরবাড় মৌজার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের যাতায়াত ছিল তখন একমাত্র এই নদীপথে। কলিকাতা থেকে চেতুয়া পরগনায় আসতে হলে রূপনারায়ণ নদের জলপথে উত্তরবাড় মৌজায় প্রথম পদার্পণ করতে হত। রূপনারায়ণ নদের তীরে উত্তরবাড় মৌজায় 'গোপীগঞ্জ' নামক একটি নদীঘাট বা বন্দর আছে। এই নদীঘাটই তখন চেতুয়া পরগনায় প্রবেশের একমাত্র তোরণ ছিল। রূপনারায়ণ নদ উত্তর-পশ্চিমে আরও প্রবাহিত হয়ে ঘাটালের কিছুটা পূর্বে শিলাবতী নদীর সঙ্গে মিশেছে।

উর্বর মাটির জন্য চেতুয়া পরগনা মূলত কৃষিযোগ্য ভূমি। কিন্তু এলাকাটি নদীতীরবর্তী নিম্ন অঞ্চল হওয়ায় উত্তরবাড় সংলগ্ন রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরবর্তী মৌজাগুলিকে 'জলাভূমি' বলা হয়। বর্ষাকালে নদীর বাঁধভাঙা জলে চেতুয়া পরগনার নিম্নাঞ্চলের জলাভূমি বন্যাপ্লাবিত হত, আর সেই সঙ্গে কৃষকের একমাত্র জীবিকা আমন ধানও নষ্ট হয়ে যেত। ফলে সেই সময় এই এলাকার কৃষকদের আর্থিক সংগতি বড়ই দুর্বল ছিল। তারা মূলত গরিব ছিলেন। নিয়মিত রাজস্ব বা খাজনা আদায় দিতে পারতেন না। বন্যা না হলেও অতিরিক্ত বর্ষা হলে বর্ষার জমা জলেও আমন চাস নষ্ট হত।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সাতাশতম পুরুষ রামদুলাল এরকম একটি এলাকায় জমিদারি লাভ করেও প্রজাবৎসল জমিদাররূপে অচিরে প্রজাগণের শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা আদায় করতে সক্ষম হলেন।

সমগ্র খেপুত অঞ্চল অর্থাৎ উত্তরবাড় এবং দক্ষিণবাড় মৌজার অধিবাসীগণ মূলত শাক্ত এবং শৈব। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব এলাকায় তখন খুব একটা ছিল না।

রামদুলাল নিজ বাড়িতে শ্রীশ্রীরঘুনাথ শিলা প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজার্চনা, নিরামিষ

অন্নভোগ প্রদান এবং সন্ধ্যায় কাঁসরঘণ্টা সহযোগে আরতির ব্যবস্থা করায় উত্তরবাড় মৌজায় প্রথম বিষ্ণুপূজার সাড়া পড়ল। জন্মাষ্টমী তিথি এবং শ্রীরামনবমী তিথিতে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর বিশেষ পূজার রীতিও রামদুলাল প্রচলন করলেন।

কিন্তু উত্তরবাড় মৌজাকে একটি স্বাবলম্বী হিন্দু সমাজরূপে গড়ে তুলতে হবে। এই রীতি ও চিন্তা তো সাবর্ণবংশীয় রামদুলালের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সেজন্য তিনি মালাকার পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। ৭৪ বিঘা ভদ্রাসনের বাইরে উত্তরবাড় মৌজায় বাস্তুজমি এবং চাষযোগ্য মাঠের জমি দিয়ে একঘর মালাকার পরিবারকে বসালেন। মালাকার নিত্য শ্রীরঘুনাথ জীউর পূজার ফুল-তুলসী এবং মালা দিয়ে যাবে। সেই মালাকার পরিবার এখনও শ্রীরঘুনাথ জীউর পূজার জন্য নিত্য ফুল-তুলসী এবং মালা দিয়ে আসছেন। সেই সঙ্গে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের অন্যান্য পূজা এবং অনুষ্ঠানের ফুলমালাসহ যাবতীয় মালাকারের সামগ্রী প্রয়োজনমতো তাঁরা দিয়ে আসছেন। বর্তমানে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার তাঁদের মূল এবং প্রধান যজমান।

যে-কোনো পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে হলে হিন্দুধর্মে আচার্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাছাড়া বার-তিথি, সময় নির্ঘণ্ট ইত্যাদি জানবার জন্যেও আচার্য দরকার। সুতরাং অনুরূপভাবে বাস্তুজমি এবং চাষযোগ্য ভূসম্পত্তি দান করে রামদুলাল উত্তরবাড় মৌজায় আচার্য পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। এই আচার্য পরিবার বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ সাবর্ণ পরিবারে এসে নতুন পঞ্জিকার ফলাফল আলোচনা করেন। পরিবারের নারী-পুরুষ সকলে দেবালয়ের সামনে বসে উৎকর্ণ হয়ে নববর্ষের পঞ্জিকার ফলাফল শোনেন। এছাড়া পরিবারের অন্যান্য বিবাহ-উপনয়ন-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত ধর্মীয় কার্যে কলাখোল, কুশ, পঞ্চপল্লব প্রভৃতি যখন যা প্রয়োজন হয় তা দিয়ে যান। অবশ্য তারজন্য বর্তমানে পৃথক পারিশ্রমিকও প্রদান করা হয়।

দেবকার্য এবং ক্ষৌরকর্মের জন্য উত্তরবাড় মৌজায় একঘর প্রামাণিক বসানো হল। অবশ্য সেই পরিবার দু-এক পুরুষ পরে অন্যত্র চলে যান। বর্তমানে অন্য প্রামাণিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিবারের সঙ্গে পূর্বের সেই প্রামাণিক পরিবারের কোনো যোগসূত্র নেই।

রামদুলাল উত্তরবাড়ে একঘর কর্মকারও বসালেন। এঁরা কৃষকদের চাষের হাতিয়ার তৈরি এবং মেরামতের কাজে সহায়তা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে উপনয়নের সময় চরু রন্ধনের কাঠের হাতা-খুন্তি তৈরি করে দেন। এখনও এই কর্মকার পরিবার উত্তরবাড়ে বসবাস করছেন এবং সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের যাবতীয় কাজকর্ম আন্তরিকতার সঙ্গে করে দিচ্ছেন। পরে সাবর্ণ পরিবারে কালীপূজার প্রবর্তন হলে কালীপূজার জন্য বারকোশ শামাদান প্রভৃতি তৈরি এবং মেরামত করে দিয়ে আসছেন।

চিকিৎসার নিমিত্ত একঘর বৈদ্যও ভদ্রাসনের অনতিদূরে বাস্তুজমি ইত্যাদি প্রদান করে রামদুলাল বসালেন। আজও সেই বৈদ্য পরিবার নিজেদের বাস্তুতে বসবাস করছেন। ৩০/৪০ বৎসর পূর্বেও এই পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিগণ কবিরাজি চিকিৎসা করতেন। বর্তমান প্রজন্ম আর কবিরাজি করেন না।

উত্তরবাড় মৌজায় চট্টোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায় পদবিধারী দুঘর কুলীন ব্রাহ্মণের বসবাসের জন্য রামদুলাল নিজের ভদ্রাসনের নিকটে বাস্তুজমি দান করলেন। তাঁদের কৃষিজমি এবং বেড়বাগানও প্রদান করা হয়েছিল। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পর তাঁর বংশধরসম্পত্তি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যান। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশধরগণ এখনও বাস্তুজমি রক্ষা করছেন। অবশ্য তাঁরা জীবন-জীবিকা অন্যত্র নির্বাহ করেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয়—তখন উত্তরবাড় মৌজা রামদুলালের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। সেজন্যেই রামদুলাল উত্তরবাড় মৌজাকে স্বাবলম্বী হিন্দুসমাজ রূপে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু পাশের মৌজা দক্ষিণবাড় স্বাবলম্বী হিন্দু সমাজরূপে গড়ে ওঠেনি।

রামদুলালের দুই পুত্র—নিমানন্দ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রামদুলাল তাদের উপনয়ন কার্য সমাধা করেছেন। জমিদারি কার্যে তাঁরা পিতাকে সহায়তা দান করতে এগিয়ে আসেন। এই অঞ্চলে তখন স্থলভূমিতে যাতায়াতের প্রধান সহায় ছিল পালকি। পুত্ররা বড়ো হওয়ায় রামদুলাল আরও দুটি পালকি তৈরি করলেন। কারণ তিনজনে মহলে বেরোতে হলে তিনটি পালকিরই প্রয়োজন। পালকি রাখতে হলে বাহক বা বেহারা চাই। সেজন্য উত্তরবাড় গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 'সিং' প্রভৃতি পদবিধারী কয়েকটি পরিবারকে কিছু কিছু মাসোহারা দিয়ে খাস তাঁবেদার রূপে নিযুক্ত করলেন।

নিমানন্দ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ যোগ্য হলে তাঁদের বিবাহ দিয়ে রামদুলাল সংসারীও করলেন।

রামদুলাল ইতিমধ্যে দু-একবার নদীপথে বড়িশাবাড়িতে দুর্গাপূজার সময় এসেছেন। কালীঘাটে বংশের ইষ্টদেবীর দর্শন করে গেছেন। জ্যেঠামশাই সন্তোষ রায়ের শেষ জীবনে রামদুলাল তাঁকে একবার দেখতেও আসেন। সে-সময়ে সন্তোষ রায়ের প্রচেষ্টায় কালীঘাটের মন্দির নতুন করে তৈরি হচ্ছে। কালীঘাটের কালীমাতার দিকে তাকিয়ে রামদুলাল বিশেষভাবে অভিভূত হন এবং মনস্থ করেন,—কালীমাতার ওই বৈষ্ণবী রূপ তিনি খেপুত উত্তরবাড়ের বাড়িতে পূজা করবেন।

সেই বছরেই তিনি উত্তরবাড়ের নিজ ঠাকুরঘরে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা করবেন মনস্থ করেন।

দক্ষিণবাড় মৌজায় তখন একঘর সূত্রধর বসবাস করতেন। রামদুলাল তাঁদের নিজ বাড়িতে ডাকিয়ে এনে কালীঘাটের কালীমাতার বৈষ্ণবীরূপের বর্ণনা দিলেন। সেই সঙ্গে দক্ষিণাকালীর ধ্যানটির বঙ্গানুবাদ করে তাদের বোঝালেন। সূত্রধর সমস্ত শুনে দক্ষিণাকালীর মূর্তি তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

বড়িশাবাড়ির দুর্গাপূজার কথা স্মরণ করে বিজয়া দশমীর দিন রামদুলাল কালীমাতার আমিষ ভোগ দিয়ে দেবীর তৃণমূর্তির পদে মৃত্তিকা লেপন করেন। অর্থাৎ বড়িশাবাড়ির দুর্গাপূজা শেষ আর খেপুত উত্তরবাড় বাড়ির কালীপূজার শুরু সূচনা করলেন। বিজয়া দশমীর দিন থেকেই কালীমাতার নিত্য পূজা এবং আমিষ ভোগ দেওয়ার বিধি প্রবর্তিত হল। এর আগে মন্দিরে কেবল শ্রীরঘুনাথ জীউর নিরামিষ ভোগ নিবেদন করা হত। ঠাকুরঘরের মাঝখানে কাঠের বড়ো ম্যারাপ তৈরি হল। মূর্তি গঠিত হলে শুভক্ষণে দেবীকে তুলে এনে সেই ম্যারাপে স্থাপন করা হল। সেই সঙ্গে মূল পূজার আগের দিন অর্থাৎ কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথির দিন বড়ো করে দেবীর আমিষ ভোগ প্রদান করা হল এবং সন্ধ্যায় মঙ্গলারতি হল। খেপুতবাড়িতে এই নিয়ম অপরিবর্তিতভাবে এখনও ভক্তিসহকারে চলে আসছে।

দেবীর মূর্তি ম্যারাপে স্থাপন করার পর সূত্রধর সজল নয়নে কালীমাতার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—আমি কি মা তোকে গড়েছি? বর্তমানেও সেই সূত্রধর পরিবারের বংশধরগণ কালীমাতার মূর্তি তৈরি করে আসছেন এবং মূর্তি নির্মাণের কাজ শেষ হলে দেবীকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এই দক্ষিণা কালীমাতার মূর্তি প্রায় সাত ফুট উচ্চ। মুকুট সমেত ন-ফুট মতো। কালী শবরূপী শিবের ওপর দণ্ডায়মানা। তিনি "শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ .... বিপরীত রতাতুরাম।"

যিনি কালের সঙ্গে রমণ করেন তিনিই কালী-আদ্যাশক্তি। তিনি বন্ধন ও মুক্তি দুইয়েরই সাধনকারিণী। ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী-তারিণী। সেই আদ্যাশক্তি শ্যামাকালীর পূজা রামদুলাল খেপুতবাড়িতে প্রবর্তন করলেন। কালীঘাটের শ্যামাকালী সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের ইষ্টদেবী। গঙ্গার পশ্চিম পারে কালীঘাটের কালীমাতার অনুকরণে গঠিত দেবীর নাসিকায় রসকলি, বৈষ্ণবী তিলক। দেবী দিঘলনয়না। দেবী করালবদনা, গলে নরমুণ্ডমালা। চতুর্হস্তা ভদ্রকালী রূপ। ভীষণা মূর্তির মধ্যেই স্নেহময়ী বরদাতৃ মাতৃরূপ। দেবীর বামে শৃগাল ও ডাকিনী, আর দক্ষিণে যোগিনী। সমগ্র খেপুতে অর্থাৎ উত্তরবাড় এবং দক্ষিণবাড় মৌজায় তখন কোনো কালীপূজা বা দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত না। প্রথম সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারেই সম্ভবত ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে প্রথম কালীপূজা অনুষ্ঠিত হল।

কার্তিক মাসের অমাবস্যা রাত্রি বছরের মধ্যে সবথেকে ঘন অন্ধকারময়। এই তিথিতে সূর্যদেব পৃথিবীর অতি নিকটে সবথেকে নীচে অবস্থান করেন। সেজন্য এই তিথিতে শ্যামাপূজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার যেখানে—সেখানেই এ পর্যন্ত শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। খেপুত উত্তরবাড় বাড়িতেও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এখানে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয় ঘটানো হল একই মন্দিরে—একত্রে। পৃথক-পৃথক ব্যবস্থায় নয়। এখানে শ্যাম রায়ের পরিবর্তে শ্রীরঘুনাথ আর তাঁরই মন্দিরে শিব-শ্যামার যুগল মূর্তি বিরাজমান। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের সমন্বয়ের মূল বিধিমতো শ্রীরঘুনাথের নিত্য ভোগ এইদিন দিবায় উৎসর্গ না করে—রাত্রে কালীমাতার ভোগ উৎসর্গের পূর্বে নিবেদন করা হয়। তারপর শিব ও শ্যামার ভোগ নিবেদন করা হয়। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব .... সব একাকার।

কালীঘাটের বিধিমতো রামদুলাল দীপান্বিতা কালীপূজার দিন পরিবারের মধ্যে কুলো বাজিয়ে চালগুড়ি আর গোবরের তৈরি অলক্ষ্মী মূর্তি বিদায় করে লক্ষ্মীপূজার রীতিও প্রবর্তন করলেন। তবে এই লক্ষ্মীপূজা দেবালয়ে না করে গৃহকোণে অনুষ্ঠিত হল। কালীঘাটের বিধিমতো লক্ষ্মীর নিরামিষ ভোগে উচ্ছে-করলা বা তেঁতো জাতীয় কোনো সবজি দেওয়া নিষেধ করলেন। অবশ্য কালীমাতার আমিষ ভোগে সবরকম সবজি দেওয়ার বিধি আছে। কালীমাতার সাদা অন্নভোগ, খিঁচুড়ি ভোগ, পায়েস এবং অন্যান্য তরকারি ডাল ভাজা দেওয়া হয়। মহাকাল অর্থাৎ শিবের জন্য আতপ চালের নিরামিষ ভোগ রান্না হয়।

উত্তরবাড়ে চট্টোপাধ্যায় (কাশ্যপ গোত্রীয়) এবং বন্দ্যোপাধ্যায় (শাণ্ডিল্য গোত্রীয়) পরিবার দুটি কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীরঘুনাথ জীউর নিত্যপূজায় তাঁরা পারদর্শী থাকলেও কোনো কাম্য পূজা এবং উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানের জন্য তাঁরা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সেজন্য রামদুলাল কাম্যপূজা শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালীমাতার পূজার জন্য রূপনারায়ণ নদের পূর্বপারে হাওড়া জেলার ভাটোরা গ্রামের মুখোপাধ্যায় (ভরদ্বাজ গোত্রীয়) পরিবারকে পৌরোহিত্যে করার জন্য নির্বাচন করলেন। অদ্যাবধি উক্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারের বংশধরগণ খেপুত-উত্তরবাড় গ্রামের সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের পৌরোহিত্য করছেন। এখানে উল্লেখ করতে হয়, রামদুলাল তাঁর পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন এবং বিবাহকার্যে ইতিমধ্যে উক্ত পরিবারের যোগ্য ব্রাহ্মণকেই নিয়োগ করেছিলেন।

৭৪ বিঘা ভদ্রাসনের দক্ষিণে ইশারা (ইজারা) নামক একটি বড়ো পুষ্করিণী আছে। (কেবল জল ১.২৭ একর) পুষ্করিণীটি পাহাড় বা পাড়হীন দিঘি সদৃশ একটি জলাশয়। কিন্তু ভদ্রাসনের মধ্যে ওই পুষ্করিণীটি প্রথমে জটাধর নাগ মহাশয়ের বংশধরগণের

ইজারাভুক্ত সম্পত্তি ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে অবশ্য পুষ্করিণীটি আইনসম্মতভাবে ইজারামুক্ত হয়ে রামদুলালের নিষ্কর সম্পত্তিভুক্ত হয়। কিন্তু উক্ত পুষ্করিণীকে এখনও লোকে ইশারা (ইজারা) পুষ্করিণী বলেন। কালীপূজার পূর্বে পুষ্করিণীটি ইজারামুক্ত হওয়ায় রামদুলাল উক্ত পুষ্করিণীতেই দেবীর পূজার নিমিত্ত ঘট ডুবানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের মালাকার, কর্মকার, নাপিত, আচার্য, প্রত্যেকেই পূজোর দিন সকাল থেকে উপস্থিত। বড়িশাবাড়ির নিয়ম অনুসারে রামদুলাল পাড়ার চাষিদের পূজোর উৎসবে যোগ দেবার জন্য ডাক দিলেন। তারা তিনদিন বিভিন্ন কাজকর্মে টহল দিতে লাগলেন। আজও পাড়ার চাষিরা সাবর্ণ রায় চৌধুরী বাড়ির কালীপূজা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে টহলদার হিসেবে কাজ করেন। তাদের 'টহলে' বলা হয়। সমস্ত কাজকর্মে তাঁরা সানন্দে অংশগ্রহণ করেন। খাওয়া-দাওয়া ব্যতীত সিধে এবং অন্যান্য সামগ্রী তাঁদের দেওয়া হয়।

প্রথম কালীপূজার সময় দেবালয়ের সামনে নাটমন্দির ছিল না। তাই টহলেগণ সাময়িকভাবে দেবালয়ের সামনে একটি অস্থায়ী 'চারচালা' নাটমন্দির তৈরি করলেন। রামদুলাল দুই পুত্রের মঙ্গল কামনায় দুটি ছাগ বলির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এখনো কালীপূজায় দুই পুত্রের দুই বাড়ির মঙ্গল কামনায় অন্তত দুটি ছাগ কালীপূজায় বলি হয়।

তবে পূর্বে শতাধিক ছাগ বলিও হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত ২৫/৩০টি ছাগ বলি হত। বর্তমানে ১০/১৫টি ছাগ কালীপূজায় বলি হয়।

পূজার আনন্দ উপভোগ করার জন্য আহূত, অনাহূত এবং বরাহূত ভক্তসাধারণের সমাগম ঘটল। এছাড়া নায়েব গোমস্তা দ্বারোয়ান, পালকি বেহারা প্রভৃতি সকলে সপরিবারে উপস্থিত।

পূজার সময় নির্ঘণ্ট রচনার জন্য আচার্য ঠাকুরঘরের বারান্দায় 'জলঘড়ি' র আসর পাতলেন। গ্রামীণ ভাষায় এই জলঘড়িকে 'তাঁবি' বলা হয়।

জলঘড়ির মাধ্যমে সময় নির্ণয় করার জন্য একটি বড়ো মাটির হাঁড়িতে আধ হাঁড়ি জল রাখা হয়। সেই জলে তামার একটি ছোটো সরা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ওই তামার সরার তলদেশে একটি এমন ছিদ্র আছে—যার মধ্য দিয়ে জল প্রবেশ করে ঠিক ২৪ মিনিটে সরাটি হাঁড়ির জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। একবার সরাটি ডুবলে একটি তাঁবি গণনা করা হয়। আচার্যমশায় ডুবে যাওয়া সরাটি তুলে পুনরায় হাঁড়ির জলে ভাসিয়ে দেন এবং হাঁড়ির গায়ে একটি সাদা চুনের 'টিপ' বা ফোঁটা দিয়ে তাঁবুর গণনা নির্ণয় করেন। ঠিক সূর্যাস্তের সময় থেকে তাঁবু গণনা শুরু হয় ৯টি তাঁবু হলে অর্থাৎ ৯বার সরাটি ডুবলে ঘট ডোবানো হয়। ২৪ মিনিটে এক দণ্ড। সূর্যাস্তের পর ৯ দণ্ড অতিক্রান্ত হলে ঘট ডুবানোর রীতি প্রবর্তিত হল। এমনিভাবে দণ্ডের বিধান অনুসারে দেবীর চক্ষুদান এবং

চক্ষুদানের চালকুমড়ো বলিদান সম্পন্ন হতে লাগল। এখনও কালীপূজার সময় জলঘড়ির নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়।

৯ দণ্ডের পর রামদুলাল ইশারা পুষ্করিণীতে ঘট ডুবিয়ে আনলেন। পুরোহিতমশায় সঙ্গে গিয়ে মন্ত্র বলে দিলেন। ঢাক-ঢোল-কাঁসরঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল। রামদুলাল নিজেই পূজায় বসলেন। পুরোহিতমশায় তন্ত্রধারণ করলেন। তিনি পূজার বিধি ও প্রকরণের নির্দেশ দিতে লাগলেন। প্রথম কালীপূজার রীতি অনুসারে এখনও রামদুলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বংশের একজন পূজার আসনে বসেন আর পুরোহিতমশায় তন্ত্রধারণ করেন।

ঘট ডুবানোর পর কালীঘাটের কার্তিক মাসের শ্যামা লক্ষ্মীপূজার রীতি অনুসারে ঠাকুর ঘরে সিড়িতে ২৮টি প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হল। সূর্যাস্তের পর ভাঙা কুলো বাজিয়ে পাটকাঠি বা পেঁকাটি জ্বেলে অলক্ষ্মী বিদায় করে রামদুলালের গৃহকোণে লক্ষ্মীপূজা শুরু হল। কালীঘাটের নিয়ম অনুসারে লক্ষ্মীপূজায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজানো হল না। কালীঘাটে লক্ষ্মীর ভোগ নিরামিষ হলেও কালীমাতার পূজায় ছাগ বলি হয়। রামদুলালও সেই বিধিমতো খেপুত উত্তরবাড় বাড়িতে কালীমাতার ছাগ এবং আখ, চালকুমড়ো বলির প্রথা চালু করলেন।

বলিদানের সময় ঢাক-ঢোল-কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে পাড়া মুখর হল। পূজার শেষে ভোরে উপস্থিত ভক্তসাধারণকে বসিয়ে ভোগপ্রসাদ খাওনোর রীতি প্রবর্তন করলেন। সে যেন এক অন্নযজ্ঞ।

শ্যামাপূজার দিন শ্রীরঘুনাথের অন্নভোগ অন্যান্য দিনের মতো মধ্যাহ্নে উৎসর্গ করা হয় না। কালীঘাটে বাসুদেব যেমন বৈষ্ণবরূপিণী শ্যামাকালীর জন্য অপেক্ষায় থাকেন, সেইরকম রঘুনাথ জীউও সারাদিন অপেক্ষা করে রাত্রে শ্যামাকালীর ভোগ উৎসর্গ করার আগে তাঁর নিরামিষ ভোগ দর্শন করেন। তারপর শিব ও শ্যামাকালীর ভোগ দর্শন। একই মন্দিরে বিষ্ণু, শিব, শক্তির সমন্বয়।

পূজার পরদিন নিরঞ্জন পূজা হল। রামদুলাল সপরিবারে প্রতিমা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর দেবীর মাথার অর্ঘ্য, গলার ধাত্রীমালা এবং রঙ্গন ফুলের মালা দুটি খুলে একটি বড়ো বারকোশে সাজিয়ে রাখা হল। মধ্যে একটি জাগপ্রদীপ। "নমঃ নির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ........" বলে পূজা করে সেই নির্মাল্যের থালা ভক্তিসহকারে জলের ধারা দিয়ে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বসতবাটির কুলুঙ্গিতে রাখলেন। বাজনা-বাদ্য বাজল। মনে মনে পরিবারের সকলে আগামী বৎসর পুনরায় শ্যামা মায়ের আগমন কামনা করতে লাগলেন। খেপুত-উত্তরবাড়িতে এই প্রথার কোনো ব্যতিক্রম আজও ঘটেনি।

সন্ধ্যায় টহলেগণ কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে ইশারা পুষ্করিণীতে প্রতিমা বিসর্জন করলেন।

এর পূর্বে দিবাভাগে ব্রাহ্মণ ভোজন এবং নরনারায়ণের সেবার আয়োজন করেছিলেন।

প্রথম বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে রামদুলাল শিক্ষালাভ করলেন যে শ্যামাপূজার আয়োজনের জন্য কুমোরবাড়ির হাঁড়ি-মালসা-সরা-প্রদীপ প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রয়োজন আছে। তিনি উত্তরবাড় মৌজায় জমি দান করে কুমোরবাড়ি ঠিক করলেন। তাঁরা প্রতি বছর পূজার ফর্দমতো মাটির বাসনপত্র পূজাবাড়িতে পৌঁছে দেবেন। অনুরূপভাবে ছোটো টাটি, খুরি, প্রদীপ, পিলসুজ প্রভৃতি ছোটো ছোটো মাটির সামগ্রীগুলি পূজাবাড়িতে সরবরাহ করার জন্য অন্য একটি কুমোরবাড়িকেও কিছু জমিদান করলেন। ওই কুমোর ছোটো-ছোটো মাল (কুঁচো মাল) সরবরাহ করেন বলে তাঁরা 'কুঁচো কুমোর' নামে আজও পরিচিত। ওই দুই কুমোরবাড়ি আজও মাটির জিনিসপত্র পূজাবাড়িতে সরবরাহ করে আসছেন।

রামদুলাল আর একটি অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। জমিদারবাড়ির প্রতিমা দর্শন এবং প্রসাদ গ্রহণের কামনায় বহু ভক্তসমাগম হয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেককে কোনোরকমে প্রসাদ দেওয়া গেলেও—এটা সত্য যে আরও প্রসাদের প্রয়োজন ছিল। সে কারণে পরবর্তী বৎসর থেকে চালের পৃথক অন্ন ও তরকারি রন্ধনের ব্যবস্থা নিলেন। এইভাবে তিনি পূজার সঙ্গে অন্নকুটের প্রবর্তন করেন। এছাড়া পূজার রাত্রে সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণগণের জন্য লুচি ও মিষ্টান্ন সহযোগে জলপানেরও ব্যবস্থা করলেন।

খেপুত-উত্তরবাড় বাড়িতে কালীপূজা শুরু হওয়ার পর চেতুয়া পরগনার অধীন রাধাকান্তপুর, সাগরপুর, কৈজুড়ি-মুগুড়িয়া প্রভৃতি তিন-চারটি মৌজার জমিদারি রামদুলাল পেলেন। আত্মীয়ের যোগাযোগ এবং সহায়তায় কলকাতা থেকে শালের খুঁটি আনিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে একটি বিরাট আটচালা তৈরি করলেন। এই আটচালাটি ৩৫ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২৫ ফুট প্রস্থ ছিল। এর খুঁটিগুলি ৮" × ৬" মোটা ছিল। আটচালার কাঠামো হয়েছিল—বাঁশের শলি কাঠি দিয়ে। এই আটচালা ছাইতে সাতকাহন খড় লাগত। কালীপূজার সময় প্রজাগণ এবং ভক্তসাধারণ এসে বসতে পারবেন। তাঁরা স্বচ্ছন্দে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন। রামদুলালের এমনই বাসনা ছিল। পরের বছর থেকে রামদুলাল পূজার সময় নহবতের ব্যবস্থা করলেন। প্রথমে নহবতের ভারা বেঁধে নহবত বসত। আজও সেই জায়গাটিকে 'নওবত-তলা' বলা হয়। অবশ্য বর্তমানে নহবতখানা তৈরি হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে জমিদারির আয় ও রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় রামদুলাল ৭৪ বিঘা ভদ্রাসনের মধ্যে কালামাটিতে ইটপাঁজা তৈরি করলেন। সেই ইট দিয়ে বসতবাটি নির্মাণ করতে শুরু করেন। বর্তমানে খেপুত উত্তরবাড় বাড়িতে ঐতিহ্যবাহী যে ত্রিতল বাড়িটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—তার মাত্র একটি তলা তিনি জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ করে যান।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি ৭৪ বিঘা ভদ্রাসন এবং জমিদারি দুই পুত্র নিমানন্দ এবং লক্ষ্মীনারায়ণকে ভাগ করে দিয়ে যান। ইশারা পুষ্করিণীসহ কিছু বেড়বাগান এজমাল রাখেন। সেজন্য খেপুত-উত্তরবাড়বাটির ভদ্রাসনের মধ্যে আজও মূলত তিনটি ভাগ দেখা যায়। উত্তরের ভাগ জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমানন্দের বংশধরগণের, দক্ষিণের ভাগ কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধরগণের এবং ইশারা পুষ্করিণীসহ তৃতীয় ভাগ সর্ব এজমাল। অর্থাৎ উভয়পুত্রের বংশধরগণের সম্পত্তি।

রামদুলাল দীর্ঘজীবী মানুষ ছিলেন। তিনি ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। শোনা যায়, তখন তাঁর বয়স ৮৩ বছর ছিল।

রামদুলালের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ২৮তম পুরুষ নিমানন্দ রায় চৌধুরী বাস্তুর উত্তরের অংশে বসবাস করেন। আর বাস্তুর দক্ষিণ অংশে কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় চৌধুরী থেকে যান। উভয় পুত্র বাস্তুর পূর্বদিকে নিজ নিজ খিড়কি পুকুর কেটে নেন। ফলে বর্তমানে উত্তরের বাড়ির এবং দক্ষিণের বাড়ির দুটি পৃথক পৃথক খিড়কি পুকুর দেখা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরবর্তী চেতুয়া পরগনা বন্যা প্লাবিত অঞ্চল। সেজন্য এই অঞ্চলের বাস্তুগুলি উঁচু পোতার,—অর্থাৎ উঁচু-উঁচু, যাতে বন্যায় বাস্তু ডুবে না যায়। উঁচু বাস্তুতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। কিন্তু নিমানন্দ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁদের বাস্তুকে এমনভাবে উঁচু পোতা করলেন—যাতে করে বাস্তুতে উঠবার সময় সিঁড়ি বা ধাপ অতিক্রম করতে না হয়। সেজন্য এই বাস্তুর উচ্চতা ধীরে ধীরে ঢাল হয়ে পশ্চিমদিকে সমতল রাস্তায় নেমে গেছে।

রামদুলালের মৃত্যুর পূর্বেই নিমানন্দের তিন পুত্র ভক্ত রাম (১৭৮৪-১৮৪৮), রামচাঁদ (১৭৮৬-১৮৬০) ও রামতনু (১৭৮৯-১৮৪০) এবং লক্ষ্মীনারায়ণের একমাত্র পুত্র আনন্দ প্রসাদ (১৭৮৬-১৮৪৫)—এই চার নাতিকে দেখে যান। আনন্দপ্রসাদ অতি সুশ্রী দেখতে ছিলেন। সেজন্য তাঁকে অনেকে 'পদ্মলোচন' নামে ডাকতেন।

রামদুলালের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর উভয়পুত্র উত্তরবাড় মৌজার গ্রাম্য শিব শ্রীকালিন্দী রায়ের (বর্তমানে 'কালিন্দীনাথ' বলা হয়) সেবায়েত মুখ্যগণের নামে জমিদান করে যান। এখনও উত্তরবাড়ের শিবের গাজনের সময় জমিদারবাড়ির ভোগ নিতে রায় চৌধুরী বাড়িতে গাজন আসে। নীলের দিনে রাত্রে আলোকসজ্জাসহ শিবের পালকি কাঁধে করে নাচতে নাচতে বরযাত্রী হিসেবে গাজনের সন্ন্যাসীগণ রায় চৌধুরী বাড়ির ভেট নিতে আসেন।

পার্শ্ববর্তী ভুঁএগ্রাড়া মৌজার শ্রীশীতলামাতার নিত্যপূজার জন্য নিমানন্দ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত পদবীধারী দেবীর সেবায়তগণকে কিছু জমি দান করেছিলেন। তার

ফলশ্রুতিস্বরূপ মহা অষ্টমীর সন্ধিপূজার সময় শ্রীশীতলামাতার মন্দিরে যে ছাগবলি হয়—সেই প্রসাদী ছাগ পণ্ডিতগণ আজও রায় চৌধুরী বাড়িতে নিজেরা বয়ে এনে সম্মানসূচক ভেট প্রদান করে যান।

নিমানন্দের মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র ভক্তরাম, রামচাঁদ এবং রামতনু জমিদারি তিন ভায়ের মধ্যে ভাগ করে নেন। এমনকি বাস্তুও তিন ভাগ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র আনন্দ প্রসাদ দক্ষিণের পাকাবাড়িতে থেকে যান। তাঁর জমিদারির অংশও মূলত উত্তরের বাড়ির থেকে তিনগুন বেশি ছিল। আয় বেশি হওয়ায় আনন্দপ্রসাদ আবার পাঁজার ইট পুড়িয়ে ধীরে ধীরে অট্টালিকার দ্বিতল এবং ত্রিতল নির্মাণ করেন।

এরপর আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমানন্দের বংশধরগণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করছি। ভক্তরামের এক পুত্র—ত্রিশতম পুরুষ পার্বতীচরণ। তিনি সরল মানুষ ছিলেন। পার্বতীচরণের চার পুত্র—পীতাম্বর, যদুনাথ, ত্রৈলোক্য এবং রাজকৃষ্ণ। এদের পুত্র যদুনাথ অল্প বয়সেই মারা যান এবং তৃতীয় পুত্র ত্রৈলোক্যচরণের দুই পুত্র বিধুচরণ এবং শশীচরণ চেতুয়া পরগণার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে পৃথক সম্পত্তি পাওয়ার সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এখন জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ যথাক্রমে পীতাম্বর এবং রাজকৃষ্ণের বংশধরগণ উত্তরের বাড়িতে বাস করছেন। তবে এঁদের শেষ বয়সেই জমিদারি চলে যায়। শরিকি ভাগ-বাঁটোয়ারায় জমিদারির অংশ ক্রমশ কমে আসে। সেজন্য দুই ভাই দু-তিনটি মৌজার পত্তনিদার হিসেবে কোনোক্রমে আয় উপায় সামলাতে থাকেন। কৈজুড়ি, মহিষঘাটা এবং উত্তরবাড়ের মধ্যে পত্তনিদারি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এখনও ওইসব গ্রামের মাঠের জমিকে 'রায়ের খোপ' বলা হয়।

একত্রিশতম পুরুষেই উত্তরের বাড়ির জমিদারি বা পত্তনিদারি মূলত চলে যায়। কারণ ইংরেজ সরকারের চাপে বর্ধমানের রাজপরিবার ক্রমশ রাজস্ব বৃদ্ধি করতে থাকেন। আর চেতুয়া পরগনার নিম্ন অঞ্চল 'হাজা মৌজা' হওয়ায় গরিব চাষিগণ খাজনাপত্র আদায় দেওয়ার সংগতি হারিয়ে ফেলেন। প্রজাবৎসল সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার বাধ্য হয়ে জমিদারি-পত্তনিদারির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পথ খোঁজেন। পরবর্তী বংশধরগণ অর্থাৎ বত্রিশতম পুরুষ থেকে শুরু হয় অন্যভাবে জীবিকার সন্ধান। প্রথমে তাঁরা বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করতে শুরু করেন।

পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বত্রিশতম পুরুষ বৈকুণ্ঠনাথ বৈষয়িক মানুষ ছিলেন। তাঁর সময়ে পত্তনিদারির অবশিষ্ট রেশটুকু ছিল মাত্র। তিনি জমি-জায়গা দেখাশোনায় দিন কাটাতেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্র জপতপ নিয়ে দিনাতিপাত করতেন। শোনা যায়,—ইশারা পুকুরের ঈশান কোণে জলের ওপর একটা মাচা বাঁধা থাকত। মাচার ওপরে একটি ছাতা বেঁধে রেখে দিয়ে তিনি প্রাতঃস্নানের পর সেখানে বসে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত

জপ-আহ্নিক করতেন। তারপর ঠাকুর ঘরে এসে ইষ্টদেবী-কালীমাতা এবং বাস্তুদেবতা রঘুনাথ জীউকে সভক্তি প্রণতি জানিয়ে জলগ্রহণ করতেন।

পার্বতীচরণের কনিষ্ঠপুত্র একত্রিশতম পুরুষ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী অতি বিচক্ষণ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও জমিদারি-পত্তনিদারির শেষ লগ্নের মানুষ। তিনি সমগ্র খেপুত অর্থাৎ উত্তরবাড় এবং দক্ষিণবাড় মৌজার সমাজপতি ছিলেন। তিনি পারিবারিক এবং সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সময়োগযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী পরলোকগমন করার পর তাঁর প্রথম পুত্র বত্রিশতম পুরুষ তারাপদ রায় চৌধুরী সমাজপতি হন। তিনিও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। খেপুত বিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন। তারাপদ রায় চৌধুরীর পত্নীও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তিনি হাওড়া জেলার তৎকালীন এম.ই. (মিড্‌ল্-ইংলিশ) শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্রী ছিলেন।

রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র হরিপদ বিবাহসূত্রে হুগলি জেলার রাজহাটির নিকট সেনহাট গ্রামে সম্পত্তি লাভ করে সেইখানেই বসবাস করতেন। তিনি সেখানের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করতেন। তবে খেপুত-উত্তরবাড়ের বাড়িতে বিজয়া দশমীর দিন শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রীচরণে মৃত্তিকা লেপনের দিন থেকে পূজা পর্যন্ত তিনি অবশ্যই থাকতেন এবং শ্রীশ্রীকালীমাতার নিত্যপূজা করে আমিষ অন্ন নিবেদন করতেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথির নির্দিষ্ট দিনে তিনি দীর্ঘদিন কালীপূজা ভক্তিসহকারে করেছেন। পূর্বের রীতিমতো তিনি পূজকের আসনে বসতেন এবং পুরোহিতমশায় তন্ত্রধারণ করতেন। এ পর্যন্ত যেসব বংশধর শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজার আসনে বসেছেন অর্থাৎ পূজা করেছেন তাঁদের মধ্যে হরিপদ রায় চৌধুরী প্রায় দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর এ সুযোগ পেয়েছেন। হরিপদ রায় চৌধুরী নিঃসন্তান ছিলেন। সেজন্য তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তারাপদর কনিষ্ঠ পুত্র তেত্রিশতম পুরুষ প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরীকে বাৎসল্যস্নেহে পুত্রবৎ পালন করেছিলেন। সেজন্য প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরীর বংশধরগণ রাজহাটী-সেনহাটেই বসবাস করেন। তবে তাঁদের পৈতৃক অংশ খেপুত-উত্তরবাড় বাড়িতে এখনও বর্তমান। সেজন্য তাঁরা বৈষয়িক কারণে এবং কার্তিক মাসের কালীপূজার সময় অবশ্যই খেপুত-উত্তরবাড় বাড়িতে আসেন। এমনকি তাঁদের সঙ্গে অশৌচবিধি পালন করার রীতিও এখনও আছে।

হরিপদর পরবর্তী ভ্রাতা রামপদ অল্পবয়সে পরলোকগমন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুপদও কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি মূলত সংসারমুখী মানুষ ছিলেন। তবে ভ্রাতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বরাবর অটুট ছিল।

এবার রামদুলালের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধরগণের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁরা দক্ষিণের বাড়িতে বসবাস করতেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের একমাত্র পুত্র ঊনত্রিশতম পুরুষ আনন্দপ্রসাদ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুদর্শন এবং কর্মঠ মানুষ ছিলেন। তিনি এই বংশের প্রথম সমাজপতি ছিলেন। তাঁর সময়ে জমিদারির রমরমা ভাব থাকায় তাঁকে অনেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তিনি প্রজাবৎসলও ছিলেন।

আনন্দপ্রসাদের পাঁচপুত্র—গঙ্গাধর, মুক্তারাম, চুনীলাল, রামমোহন এবং রাধামোহন। গঙ্গাধর বহুদিন কালীমাতার পূজার আসনে বসেছিলেন। তিনি দেবকার্যে ব্যাপৃত থাকতে ভালোবাসতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পাঁচ পুত্রই অল্পবয়সে পরলোকগমন করায় তাঁর বংশধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় পুত্র মুক্তারামের তিন পুত্রের মধ্যে কেবল কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথের বংশ ছিল। বিশ্বনাথ মূলত বৈষয়িক মানুষ ছিলেন। জমিদারির কাজকর্মও সময়মতো দেখতেন। তবে তাঁর সময়ে জমিদারির আয় সীমিত হয়ে পড়ে। বিশ্বনাথ শান্ত এবং সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন।

বিশ্বনাথের পাঁচ পুত্রের মধ্যে কেবল বত্রিশতম পুরুষ ব্রজনাথ এবং প্রসন্নের বংশ ছিল। ব্রজনাথের দুই পুত্র—অখিল এবং শিবকৃষ্ণ। অখিলের বংশে (অখিল—পশুপতি) একপুরুষ পরে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তেত্রিশতম পুরুষ শিবকৃষ্ণের বংশধরগণ এখনও বর্তমান। প্রসন্ন রায়চৌধুরীও সমাজপতি ছিলেন। তিনি বিচক্ষণ এবং গোষ্ঠীরক্ষা ক্ষেত্রে সচেতন মানুষ ছিলেন। প্রসন্নের দুই পুত্র—নটবর এবং শরৎচন্দ্রের বংশধরগণ এখনও খেপুত-উত্তরবাড়বাড়িতে বসবাস করেন।

আনন্দ প্রসাদের তৃতীয় পুত্র চুনীলাল জমিদারির কাজকর্মে অধিক সময় ব্যয় করতেন। তিনি খুব শৌখিন স্বভাবের মানুষ ছিলেন।

চুনীলালের পাঁচ পুত্র। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পুত্র বিবাহের পূর্বেই পরলোকগমন করেন। প্রথম পুত্র গুরুদাস সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাঁর পুত্র কাশীনাথ শিক্ষিত এবং সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। কাশীনাথের একটিমাত্র পুত্র তেত্রিশতম পুরুষ ভবতারণ রায় চৌধুরী কর্মঠ এবং পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বৈষয়িক জ্ঞান উল্লেখযোগ্য। তিনি দলিলপত্রও লিখতে পারতেন। ভবতারণ অপুত্রক ছিলেন। তাঁর পাঁচ কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যা অনুপমা (স্বামী অমূল্য চক্রবর্তী) পিত্রালয়ে জমি-জায়গার অধিকারিণী হয়ে বসবাস করেন। অমূল্য চক্রবর্তী পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে অনুপমা দেবী খেপুত-উত্তরবাড়বাড়িতে একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে বাস করেন। অনুপমা দেবী দেবকার্যে নিপুণা ছিলেন। তিনি পিত্রালয়ে দেবকার্যে অধিক সময় ব্যয় করতেন। তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সপরিবারে এখনও খেপুত-উত্তরবাড়বাড়িতে বসবাস করছেন। বিশ্বনাথের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী।

চুনীলালের তৃতীয় পুত্র রামগোপাল বৈষয়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বেশিরভাগ সময়

জমিদারির কাজকর্মে ব্যয় করতেন। পরিবারের ক্রিয়াকলাপেও তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র পুত্র বত্রিশতম পুরুষ শ্যামাপদ রায় চৌধুরী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতেন। শোনা যায়, তিনি একবার বৈষয়িক ব্যাপারে আদালতে নিজেই ইংরেজিতে সম্পূর্ণ সওয়াল করে সকলকে চমৎকৃত করেন। তিনি অতিরিক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। তবে এটা সত্য একত্রিশতম পুরুষগণের সময় থেকেই জমিদারি চলে যেতে থাকায় এই পরিবারের জমিজায়গা বিক্রি হতে শুরু হয়। শ্যামাপদ নিঃসন্তান ছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায় তিনি অন্ধজীবন যাপন করেন। শেষ বয়সে তিনি তাঁর জমিজায়গা শরিকগণের মধ্যে বিক্রি করে দিতে থাকেন। শ্যামাপদ রায় চৌধুরীর পত্নী কুসুমকুমারী দেবী ভক্তিপরায়না শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। পতিব্রতা রমণী হিসেবে তিনি প্রতিদিন অন্ধ স্বামীর পরিচর্যা করতেন। সেই সঙ্গে নিত্য ঠাকুরমন্দিরে গীতাপাঠ করে জলগ্রহণ করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি ইশারা পুষ্করিণীর নৈঋত কোণে সমাধি মন্দির নির্মাণ করে রাখেন। এই সমাধি মন্দির আজও দেখা যায়।

কুসুম কুমারী দেবী দক্ষিণবাড়ের দণ্ডেশ্বর শিবের পুষ্করিণীতে বিরাট স্নানের ঘাট (পাকা ঘাট) তৈরি করে দেন।

চুনীলালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ অগ্রজদের জমিদারি কার্যে সহায়তা করতেন। তিনি নিজেও বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কারণ পৈতৃক সম্পত্তির অংশ ব্যতীত তিনি ছোটো কাকা রামমোহনের পোষ্যপোত্র হিসাবে তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পান। অবশ্য আনন্দ প্রসাদের চতুর্থ পুত্র রামমোহন শ্রীনাথকে পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার পর রামমোহনের পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেন। সেই পুত্রের নাম উমাচরণ। উমাচরণ নিঃসন্তান থাকায় তাঁর বংশ স্তব্ধ হয়ে যায়। উমাচরণ বেশ কয়েক বছর কালীপূজার আসনে বসে দেবীর পূজা করেন।

শ্রীনাথের একমাত্র পুত্র বত্রিশতম পুরুষ কালীপ্রসন্ন। পৈতৃক সূত্রে কালীপ্রসন্ন প্রভূত বিষয়-আশয়ের অধিকারী ছিলেন। কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর চার পুত্র—সতীশ, যতীন, নগেন এবং ধীরেন। তেঁত্রিশতম পুরুষ সতীশের একমাত্র পুত্র বিভূতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে সম্পত্তি লাভ করে চলে যান। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। যতীন এবং ধীরেন অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তেত্রিশতম পুরুষ নগেন্দ্রনাথের বংশধরগণ খেপুতউত্তরবাড়ের বাড়িতে বসবাস করছেন।

আনন্দপ্রসাদের ষষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র রাধামোহন জমিদারির কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর তিন পুত্র—পূর্ণানন্দ, সর্বানন্দ এবং ঈশান। সর্বানন্দ এবং ঈশানের বংশ স্তব্ধ হয়ে যায়। জ্যেষ্ঠ পূর্ণানন্দের একমাত্র পুত্র তিনকড়ি বাল্যকাল থেকেই অতি আদরে লালিত-

পালিত হন। কারণ তাঁর কয়েকটি অগ্রজের অকালমৃত্যু ঘটলে তাঁকে দেবতার মন্দিরে তিনটি কড়ি দিয়ে কিনে নেওয়া হয়।

বত্রিশতম পুরুষ তিনকড়ি রায় চৌধুরীর একটিমাত্র পুত্র। নাম ফকির। নাম ফকির হলেও ফকিরচন্দ্রের ইংরেজি সাহিত্যে বেশ দখল ছিল। তিনি খেপুত বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। পরে তিনি হাওড়া জুটমিলের জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এই ব্যক্তি বিষয়সম্পত্তির প্রতি উদাসীন এবং নিঃসন্তান ছিলেন। ফকিরচন্দ্র অল্প বয়সেই পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী জীবনযাত্রার জন্য বিষয়সম্পত্তি শরিকদের মধ্যে কিছু বিক্রি এবং কিছু দান করেন।

তেত্রিশতম পুরুষ শিবকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাওড়া জর্জকোর্টে চাকরি করেন। তিনি খেপুত-উত্তরবাড়বাড়ির দ্বিতীয় সরকারি কর্মচারী। পূর্বে যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সরকারি চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহসূত্রে হাওড়া জেলার খালনা গ্রামে বিষয়সম্পত্তি লাভ করে সেখানে বসবাস করতেন। কিন্তু বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য এবং কালীপূজার সময় তিনি খেপুতের বাড়িতে অবশ্যই আসতেন। তিনি বিচক্ষণ এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। খেপুতবাড়িতে দু-বাড়ির (উত্তরের এবং দক্ষিণের) এজমাল সম্পত্তির আদায়ী অর্থ এবং কালীমাতার পূজা বাবদ নগদ যে অর্থ ভক্তসাধারণ দিয়ে যেতেন—সেই সব অর্থ একটি এজমাল (সরকারি) ফান্ডে জমা রাখার তিনি ব্যবস্থা করেন। এর জন্য একটি ক্যাশ বাক্স কিনে তিনি নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর পত্নী অর্থাৎ তাঁর কাকীমার নিকট সেই অর্থ ক্যাশ বাক্সে জমা রাখার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এই বিধি পূর্বে যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তাঁদের উত্তরের বাড়ির এজমাল সম্পত্তির অর্থ জমা রাখার ক্ষেত্রে প্রচলন করেন। সেই সঞ্চিত অর্থে উত্তরের বাড়ির খিড়কি পুকুরের সংস্কারকার্য সমাধা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি থেকে অবসর লাভ করার পর শেষ জীবনে খেপুতের বাড়িতে থাকেন এবং গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করে যান। বঙ্কিমচন্দ্রের তিন পুত্র—বিকাশ, বিভাস এবং বিনয়। জ্যেষ্ঠপুত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। অবশিষ্ট দুই পুত্র স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ডেপুটি ম্যানেজার পদে উন্নীত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা হাওড়া-শিবপুর এলাকায় বসবাস করছেন। তবে খেপুতের সহিত তাঁদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে। এঁদের সন্তানগণ শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত।

প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র—তেত্রিশতম পুরুষ নটবর রায় চৌধুরী খেপুত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের পড়ন্ত বেলায় যেন নতুন আলোকবর্তিকা। তিনি বাল্যকালে সাবর্ণ পরিবারকে বৈষয়িক বিবাদে এবং আয় উপায়ের ধান্দায় উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় দেখেছেন।

বিষয়-সম্পত্তি বিক্রির প্রবণতা প্রায় সকলের মধ্যে পেয়ে বসেছে। জমিদারি মেজাজ মুক্ত হয়ে কর্মপ্রেরণায় নতুন করে জেগে ওঠার পথ তাদের প্রায় অজানা। এই যুগসন্ধিক্ষণে নটবর প্রত্যেককে নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করলেন। 'পরিশ্রমের বিকল্প নেই' এই মহা মন্ত্রে তিনি সমসাময়িক বংশধরদের দীক্ষিত করলেন। তিনি নিজে সংসারের সমস্ত কাজকর্মে পারদর্শী ছিলেন। হৃতসর্বস্ব জমিদার হয়ে ভুয়ো আত্মসম্মানকে সম্বল করে ঘরে বসে বসে জমি বিক্রির অর্থে জীবনযাপন করার পক্ষে তিনি যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যম এবং আত্মমর্যাদাবোধ ছিল নটবরের জীবনের আদর্শ। বিদ্যাসাগরের কুলিগিরির দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তিনি প্রত্যেককে 'নিজের কাজ নিজে করো' এই শিক্ষা দিয়েছেন। পায়ের ওপর পা তুলে সব কাজ মজুরের দ্বারা করিয়ে নেওয়ার মেজাজ জলাঞ্জলি দেওয়ার তিনি পরামর্শ দিতেন। বাড়ির নারীদেরও তিনি কর্মে অনুপ্রেরণা দিতেন। নটবর নিজে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সমস্ত গৃহকর্মে পারদর্শী ছিলেন। পরিবারে কেউ অর্থাভাবে সামান্যতম কর্মটুকুও করতে পারছেন না—এরকম দেখলে তিনি নিজেই তা সহস্তে করে দিতেন। তিনি কোনো চাকরি করতেন না। কিন্তু মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন বলে তাঁকে অর্থকষ্টে পড়তে হয় নি। তিনি বৈষয়িক এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কেউ বিপদে পড়লে তাঁকে আইনি পরামর্শ দিয়ে অথবা আইনের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতেন।

নটবর রায় চৌধুরী একজন বিচক্ষণ সমাজপতি ছিলেন। তাঁর কথা উপেক্ষা করার মতো সে সময়ে কারও সাহস ছিল না। তখন সমগ্র খেপুত সমাজে (উত্তরবাড় এবং দক্ষিণবাড়) বিধি ছিল পিতামাতার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করতে হলে পঞ্চগ্রামের ষোলো আনা ব্রাহ্মণগণকে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাতে হবে। কিন্তু গ্রামের এক ব্যক্তি পিতার বৃষোৎসর্গ করার জন্য বড়োই ব্যাকুল হলেন। কিন্তু পঞ্চগ্রামের ষোলো আনা ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করার তাঁর আর্থিক সংগতি নেই। নটবর রায় চৌধুরী তাঁকে পঞ্চগ্রামের একটি করে মাত্র পাঁচটি ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানাবার পরামর্শ ছিলেন। এতে সমগ্র খেপুতের ব্রাহ্মণগণ বেঁকে বসলেন। তাঁরা শ্রাদ্ধবাড়িতে উপস্থিত হলেন না। তখন নটবর রায় চৌধুরী সেই কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে একঘরে করে কৃষক, কায়স্থ এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের নিয়ে একটি নতুন আধুনিকতম গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ গড়লেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যখন সমগ্র খেপুত নতুন পথ ধরল—তখন সেইসব 'বেঁকে বসা' কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ভুল স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। সুতরাং দেখা যায়, আজ গোঁড়ামিমুক্ত যে সমাজ আমরা দেখছি—প্রায় শতবর্ষ পূর্বে নটবর রায় চৌধুরীর উদ্যোগে তা খেপুতে গড়ে উঠেছিল। তিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। তখনকার দিনে ডাকযোগে সংবাদপত্র গ্রামে যেত। তিনি আজীবন ডাকযোগে সংবাদপত্র আনিয়ে নিত্য পড়তেন।

সাবেকি জমিদারি আমলের আটচালা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখযোগ্য এক বড়ো বন্যায় ভূমিস্যাৎ হয়ে গেলে—সেই আটচালা পুনর্নির্মাণ করার সংগতি সাবর্ণ পরিবারের সদস্যদের ছিল না। বন্যায় আমন ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অন্নের টান। তার ওপর এই বাড়তি ব্যয়। নটবর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদ্যমে আটচালা পুনরায় নির্মাণ করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বেড়বাগানের এজমাল গাছপালা, ফল-ফসল এবং বাঁশ বিক্রি করে তিনি আটচালা খাড়া করে বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখলেন। অবশ্য এই আটচালা পূর্বের থেকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উভয়দিকে পাঁচ ফুট করে কমিয়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো করা হল।

নটবর পরিবারের প্রত্যেকের আপদে বিপদে এগিয়ে আসতেন বলে তাঁর কাজে ভুল ধরা বা প্রতিবাদ করার মতো কারও মানসিকতা ছিল না। প্রত্যেকেই তাঁর কাজকে অবনত মস্তকে মেনে নিতেন।

নটবর রায় চৌধুরী শেষ বয়সে দক্ষিণের বাড়িতে বাসস্থানের সংকুলান না হওয়ার সাবর্ণ পরিবারের গোলাবাড়ি নামক বাস্তুতে সপরিবারে উঠে গিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র তখন পরলোকগমন করেছেন। তিনি অল্পায়ু ব্যক্তি ছিলেন। নটবর গোলাবাড়িতে গিয়ে বসবাস করার পর শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুলসীচরণও গোলাবাড়িতে উঠে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এই গোলাবাড়িতে জমিদারি আমলে ধানের খামার ও গোলা ছিল। সেজন্য এই বাস্তুটিকে গোলাবাড়ি বলা হয়। এই উভয়বাস্তুর সম্মুখের সাবেকি পুষ্করিণীটিকে সংস্কার করে নেওয়া হয়। পুষ্করিণীটিকে "রামের পুকুর" বলা হয়। রামদুলাল রায় চৌধুরী খেপুত উত্তরবাড় বাড়িতে এসে প্রথমে এই পুষ্করিণীতে স্নান করতেন। সেজন্য এই পুষ্করিণীটিকে 'রামের পুকুরে' বলা হয়। ইশারা পুষ্করিণী তখন ইজারাভুক্ত থাকায় রামদুলাল আত্মমর্যাদাবোধে সেই পুষ্করিণীতে স্নান করতেন না। পরে ইজারামুক্ত হওয়ার পর ইশারা পুষ্করিণী ব্যবহার করতেন। এমনকি ইজারামুক্ত হওয়ার পর তিনি খেপুত উত্তরবাড়িতে কালীপুজা প্রবর্তন করেন। আর ইশারা পুষ্করিণীতে দেবীর পূজার ঘট ডোবানো এবং প্রতিমা বিসর্জনের কার্যসমাধা করতেন।

নটবর রায় চৌধুরী কালীপুজার ব্যাপারেও সর্বময় কর্তা ছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজকর্ম তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন। হিসাবপত্র রক্ষা করা এবং কৌলিক বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য তিনি নিঁখুতভাবে সম্পন্ন করতেন।

তিনি নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ভালো তবলাবাদকও বটে। কালীপূজার রাত্রে তাঁর উদ্যোগে একটি সংগীতের আসর বসত। সেই আসরে এলাকার সংগীতশিল্পীগণ আমন্ত্রিত হতেন এবং তাঁরা সানন্দে সংগীত পরিবেশন করতেন। নটবর নিজেই বেশিরভাগ সময় তবলা সংগত করতেন। নিজেও মাঝে মাঝে শ্যামাসংগীত বা নিধুবাবুর টপ্পা গাইতেন।

এই অভিনব চরিত্রের প্রগতিশীল মানুষটি পরিবারকে শ্রমের মর্যাদাবোধে জাগ্রত

করে স্বাবলম্বী হয়ে নতুন জীবনপথে চলবার দীক্ষা দিয়ে গেছেন। দীর্ঘায়ু নটবর ৮২ বৎসর বয়সে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

নটবর রায় চৌধুরীর মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র তেত্রিশতম পুরুষ নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বাড়ির কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অন্যত্র শিক্ষকতা করতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হন। দূর-দূর গ্রামের মানুষ তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন এবং তাঁদের ঠিকুজিকুষ্ঠি বিচার করিয়ে উপস্থিত বিপদ-আপদ সম্বন্ধে তাঁরা অবগত হতেন। জ্যোতিষী হিসাবে নগেন্দ্রনাথের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার ফলে বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটেছিল। কালীপূজার সময় তিনি বিশেষ উদ্যোগী হতেন এবং সমস্ত কর্ম নিঁখুতভাবে করিয়ে নিতেন। নটবর রায় চৌধুরী শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়লে নগেন্দ্রনাথই খেপুত গ্রামের সমাজপতি হন। তিনিই খেপুত গ্রামের শেষ সমাজপতি। কারণ এরপর গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামপঞ্চায়েতের শাসন কায়েম হয়।

নগেন্দ্রনাথ বাড়ির অন্যান্য কাজকর্ম দেখাশোনা এবং পরিচালনা করলেও পরিবারের এজমাল ফান্ড—খেপুতবাড়িতে যাকে সরকারি ফান্ড বা তহবিল বলা হয়—তার ভার গ্রহণ করেননি। নটবর রায় চৌধুরীর মৃত্যুর দু-বছর পূর্ব থেকেই এই ভার তাঁর যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র (শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র) চৌত্রিশতম পুরুষ তুলসীচরণ রায় চৌধুরী দেখাশোনা করতেন। তুলসীচরণ খেপুতবাড়ির অন্যতম ব্যবসায়ী মানুষ। হিসাবপত্র রক্ষা এবং তাঁর পরিচালন দক্ষতা প্রশংসা যোগ্য।

নটবর রায় চৌধুরী গোলাবাড়িতে বসবাস শুরু করার কয়েক বৎসর পরে তুলসীচরণ সাবেকি ত্রিতল অট্টালিকা ছেড়ে গোলাবাড়িতে বসবাস উঠিয়ে নিয়ে যান। তিনি পরিশ্রমী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। তিনি বাড়ির অর্থনৈতিক পরিচালন দায়িত্বে থাকাকালীন আটচালার মেঝে নতুন করে সিমেন্ট করা হয়। অল্পবয়সে পিতা শরৎচন্দ্রকে হারানোর ফলে সংসারের দায়িত্ব ছোটোবেলা থেকে পুরোপুরি তুলসীচরণকে সামলাতে হয়। ছোটো ভাই অনাদিচরণকে তিনি কলকাতায় রেখে বি.এ. পাশ করান। তুলসীচরণের ভ্রাতৃপ্রেম প্রশংসায় দাবি রাখে। পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল।

তুলসীচরণের দুই পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ শ্যামাপ্রসাদ এবং উমাপ্রসাদ। উভয় ভ্রাতাই ব্যবসায় নিযুক্ত। শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ কর্মঠ এবং উদ্যোগী মানুষ। বর্তমানে তিনি কয়েক বছর কালীপূজার পূজকের আসনে বসে কালীমাতার পূজার কাজ সম্পন্ন করছেন। শ্যামাপ্রসাদের পত্নী শিখা শিক্ষিতা মহিলা। তিনি কলকাতায় স্বাস্থ্যবিভাগে কর্মরতা।

এরপর উত্তরের বাড়ি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি। নিমানন্দের দ্বিতীয় পুত্র—উনত্রিশতম পুরুষ রামচাঁদের দুই পুত্র—মহেশ এবং ত্রিলোচন। মহেশ নিঃসন্তান ছিলেন। ত্রিশতম পুরুষ ত্রিলোচন মূলত অলস ব্যক্তি থাকায় তিনি জমিদারি রাখতে পারেননি। শেষ জীবনে নিজের বিষয়-সম্পত্তির ওপর নির্ভর করেই জীবন অতিবাহিত করেছেন।

ত্রিলোচন রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—দেবেন্দ্র এবং সুরেন্দ্র। দেবেন্দ্রও অপুত্রক ছিলেন। ফলে একত্রিশতম পুরুষ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। ইনিও কেবল বিষয়-সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় ক্রমশ জমিজায়গা বিক্রি হতে থাকে।

সুরেন্দ্রনাথের একটি পুত্র—বত্রিশতম পুরুষ ফটিকচন্দ্র। তিনিও বিষয়-সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফটিকচন্দ্র আনন্দপ্রিয় এবং রসিক ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যেকের প্রয়োজনে এগিয়ে গিয়ে সবরকম কাজে সহায়তা দান করতেন। তিনি অজাতশত্রু ব্যক্তি ছিলেন। পরিবারের কাজকর্মে তিনি আপ্রাণ শ্রমদান করতেন। কালীমাতার পূজার ভোগ বংশের নিয়ম অনুসারে দীক্ষিত পুরুষ বা মহিলা রন্ধন করবেন। সেই নিয়ম অনুসারে ফটিকচন্দ্র সারাজীবন কালীমাতার ভোগরন্ধনের কাজে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রান্নার কাজে প্রথমে তুলসীচরণ রায় চৌধুরীর বিধবা মাতা, হরিহর রায় চৌধুরীর পত্নী এবং যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর বিধবা পত্নী প্রভৃতি মহিলাগণ সহায়তা দান করতেন। পরে ভবতারণ রায় চৌধুরীর কন্যা অনুপমাদেবীও বহুদিন এ কাজে যুক্তা ছিলেন।

উনত্রিশতম পুরুষ রামচাঁদের বংশের তেমন বিস্তার না থাকায় ফটিকচন্দ্র তাঁর সময়ে অধিকাংশ পরিবার সদস্যের সম্পর্কে 'দাদু' ছিলেন। সেজন্য তিনি নিজবংশে এমনকি পাড়ায় 'দাদু' নামে পরিচিত ছিলেন।

ফটিকচন্দ্রের তিন পুত্র—তেত্রিশতম পুরুষ কেশবচন্দ্র, অশোককুমার এবং অলককুমার। জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র এল.আই.সি.আই-এর কর্মচারী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি হাওড়ায় কোনা অঞ্চলে বাড়ি করেছেন। তিনিও পিতার মতো আনন্দপ্রিয় ব্যক্তি। দ্বিতীয় পুত্র অশোককুমার হাওড়া কদমতলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। অশোককুমারের পত্নী শান্তি রায় চৌধুরী পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে স্বাস্থ্যবিভাগের চাকরিতে নিযুক্ত আছেন। তাঁর সংসার খেপুতে থাকে। অশোককুমারও সরল সাদাসিধে মানুষ। কনিষ্ঠ পুত্র অলককুমারও হাওড়া কদমতলায় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তিনিও নির্বিবাদী মানুষ। তিনি মেজোদাদা অশোককুমারের সহিত হাওড়া কদমতলায় একসঙ্গে সপরিবারে বাস করেন। এঁরা তিন ভাই-ই প্রায়ই খেপুতে যান এবং খেপুতের বাটির সহিত যুক্ত। কেশবচন্দ্রের তিন পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ গুরুদাস, চণ্ডীদাস এবং কৌশিকী। এঁরা তিনজনে শিক্ষালাভ করে বর্তমানে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন। অশোককুমার এবং অলককুমারের সন্তান-সন্ততিগণ বর্তমানে নাবালক।

নিমানন্দ রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র ঊনত্রিশতম পুরুষ রামতনু সরল সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র পুত্র ত্রিশতম পুরুষ যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর কয়েক বছর কালীপূজার পূজকের আসনে বসেছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—আশুতোষ এবং মহেন্দ্র। উভয় ভাই নিঃসন্তান থাকায় এই বংশধারা একত্রিশতম পুরুষেই বিলুপ্ত হয়।

বৈকুণ্ঠ রায় চৌধুরীর পুত্র—তেত্রিশতম পুরুষ হরিহর রায় চৌধুরী সরল সাদাসিধে এবং নির্বিবাদী পরিচ্ছন্ন স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অন্য কোনো আয় উপায় না থাকায় তিনি বিষয়-সম্পত্তির ওপর জীবনযাপন করেছেন। ভক্তিপ্রবণ ব্যক্তি হরিহর বাস্তুদেবতা শ্রীরঘুনাথ জীউর নিত্যপূজা মাঝে-মধ্যে করতে ভালোবাসতেন। তখন কালীপূজার সময় বেনেতি মশলা দিয়ে অতি সুন্দর এবং বড়ো-বড়ো ২/৩ ফুট লম্বা সুগন্ধী ধূপ তৈরি করা হত। হরিহর রায় চৌধুরী তাঁর যৌবনকাল থেকে শেষ জীবনে যতদিন তাঁর শারীরিক সংগতি ছিল ততদিন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সেইসব ধূপ বংশের কালীমাতার পূজার জন্য সযত্নে তৈরি করতেন। তিনি কালীপূজার সময় কালীমাতার ম্যারাপের অলৌকিক আলোকসজ্জা রচনা করতেন। তখন বর্তমানের মতো বিদ্যুতের আলো বা জেনেরেটরের প্রচলন গ্রামে-গঞ্জে ছিল না। ডে-লাইট, হ্যাসাক, কার্বাইট গ্যাসের আলো, বাতিদান, চাটুমশাল ইত্যাদির আলোর সাহায্যে পূজাবাড়ির বাইরের দিক আলোকিত করা হলেও মন্দিরের মধ্যে—বিশেষ করে মায়ের ম্যারাপে কেবল তেলের প্রদীপ আর বাতিদানের মোমবাতি সম্বল ছিল। হরিহর রায় চৌধুরী কাচের ফানুসে নারকেল তেলের সঙ্গে বিভিন্ন রং মিশিয়ে নীল, লাল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি বর্ণের অদ্ভুত এক বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা রচনা করতেন। তিনি বার্ধক্যে স্থবির হওয়ার পর থেকে সেইসব ধূপ তৈরি এবং মায়ের ম্যারাপের আলোকসজ্জা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রচলন হয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার।

হরিহর রায় চৌধুরীর পাঁচ পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ দুঃখীরাম, সুকুমার, গণেশ, শিশির এবং অজিত। দুঃখীরাম এবং শিশির বিবাহের পূর্বে মারা যান। বর্তমানে সুকুমার, গণেশ এবং অজিতের বংশধরগণ বাস করতেন।

সুকুমার রায় চৌধুরী ইংরেজ আমলে মিলিটারি অ্যাকাউন্টসে সরকারি চাকরি পান। স্বাধীনতার পর এই বিভাগের নাম হয় ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস্। তিনি উক্ত বিভাগে কর্মরত থেকে বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনি দীর্ঘায়ু ব্যক্তি। তিনি উপার্জনশীল পুত্রদের সহিত হাওড়া শিবপুরে নিজ বাসভবনে বসবাস করেন। গণেশচন্দ্র শিক্ষকতার কার্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি পিতা হরিহর রায় চৌধুরীর মতো পরিচ্ছন্ন এবং নির্বিবাদী মানুষ। গনেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্র ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত। জ্যেষ্ঠপুত্র অসিত কুমার রামরাজাতলায় বাস করেন। অজিত কুমার একটি সওদাগরি অফিসে কর্মরত থেকে

বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনিও একমাত্র উপার্জনশীল পুত্রসহ শিবপুরে নিজ বাসভবনে বাস করেন। এই তিন ভাই-এর বংশধরগণ শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন জীবন- জীবিকায় নিযুক্ত। তবে গণেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র পঁয়ত্রিশতম পুরুষ স্বপনকুমার এয়ারফোর্সে উল্লেখযোগ্য পদে বর্তমানে কর্মরত। তিনি সদাচারী ব্যক্তি। তিনি কলকাতায় নিজ বাসগৃহ তৈরি করেছেন। তিনি বি.এ পাশ করেছেন।

বত্রিশতম পুরুষ হারানচন্দ্রের চার পুত্র—যতীন্দ্রনাথ, কালীপদ, মদনমোহন এবং সুবিরচন্দ্র। সুধীরচন্দ্র বাল্যকালেই মারা যান। জ্যেষ্ঠপুত্র তেত্রিশতম পুরুষ যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী খেপুতের সাবর্ণ পরিবারের প্রথম সরকারি কর্মচারী। তিনি ইংরেজ আমলে বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন। সেজন্য অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় চাকরির প্রয়োজনে গেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যতীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গ্রামের প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে লালবিহারী নাগ, হরিপদ কর, বিনোদবিহারী শাসমল, সুবরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করছি—খেপুতের এই বিদ্যালয়টি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলেও—শিক্ষকের অভাবে এবং স্থানাভাবে মাঝেমধ্যে বন্ধ হয়ে যেত। যতীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে তাঁর আপন মামাতো দাদা দক্ষিণবাড় নিবাসী মন্মথনাথ চক্রবর্তী অর্থসাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। গ্রামবাসী এবং শিক্ষক প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে খেপুত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় দশম শ্রেণির মঞ্জুরি লাভ করে এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ছাত্ররা প্রথম এই বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পান। বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যতীন্দ্রনাথ তিন বছর কোনো বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি।

বিদ্যালয়ের তৎকালীন নিয়ম অনুসারে M.E. (Middle English) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে হেডপণ্ডিত বলা হত। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন উক্ত বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত।

দুঃখের বিষয় ছাত্রের প্রথম দল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বসার পূর্বেই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তবে দশম শ্রেণির অনুমোদনের সংবাদ তিনি কেবল জেনে যান। একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, ছাত্রানুরাগী হেডপণ্ডিত হিসেবে যতীন্দ্রনাথ আজও বয়স্ক মানুষজনের নিকট এবং লোকালয়ে প্রবাদ পুরুষের ভূমিকায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি অতি দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর হাতে লেখা একটি "গোষ্ঠীপত্র" তাঁর মৃত্যুর বহুদিন পরে তাঁর একমাত্র পুত্রের মাধ্যম পাওয়া যায়। গোষ্ঠীপত্রটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) রচিত। তখন যতীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২৭ বছর। কিন্তু ওই বয়সেই অভাবগ্রস্ত সাবর্ণ পরিবারের আচরণ এবং আর্থিক উন্নতির বিষয়ে তিনি যে পরামর্শের উল্লেখ করেছিলেন—আজও তা সম্পূর্ণভাবে পালন

করা সম্ভব হয়নি। কালীপূজার জন্য বৈষয়িক আয় ব্যতীত উপার্জনশীল পরিবার সদস্যগণের চাঁদা ধার্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। বংশের প্রত্যেক সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য তিনি গরিব ছাত্রকে সাহায্য করা এবং প্রত্যেকের খেলাধূলা ব্যায়ামচর্চার বিষয়ে সজাগ থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রথমে উত্তরের বাড়ির বৈষয়িক আয়ের অর্থ ভাগ না করে ফান্ড রচনা করেন। সঞ্চিত সেই ফান্ডের অর্থে উত্তরের বাড়ির খিড়কি পুকুরের সংস্কার করেন। তখন সমগ্র পরিবারে এরূপ ফান্ড রচনা করার মতো পরিবারের সদস্যগণের মানসিকতা গড়ে উঠেনি।

তিনি কলিক পেনের অসুখে ভুগতেন। সেই রোগেই তিনি মারা যান। মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ার আভাস পাওয়া মাত্র তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র তথা ভাইপো অনাদিচরণকে গীতাপাঠ করতে বলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি কার্যসম্পন্ন করার জন্য খেপুত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমুদয় অর্থসাহায্য করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটি তাঁর বিধবা পত্নীকে পেনশনের মতো দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করে অর্থসাহায্য করেন। এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

যতীন্দ্রনাথের পরবর্তী ভ্রাতা কালীপদ ব্যবসার নিমিত্ত কলকাতায় থাকতেন। তিনি খেপুতবাড়িতে খুব যাতায়াত করার সুযোগ পেতেন না। তাঁর সংসার অবশ্য খেপুত-বাড়িতেই থাকত। কালীপদ মাঝেমধ্যে খেপুতে আসতেন এবং কালীপূজার সময় অবশ্যই আসতেন এবং পূজার কাজকর্মে সানন্দে যোগদান করতেন। কালীমাতার মন্দিরের সংস্কারের কার্যে তিনি একসময় কিছু অর্থসাহায্যও করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনমোহন রায় চৌধুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রগণের নিকট যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মদনমোহন সরল সাদাসিধে নিরহংকার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিবৎসল মানুষ ছিলেন। তার মাতৃভক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বিপত্নীক মানুষ ছিলেন। সেজন্য সন্তানদের প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন। বাসগৃহের অকুলান হলে তিনি ভদ্রাসনের মধ্যে গোয়ালপোতায় নতুন বাসগৃহ নির্মাণ করেন।

তারাপদ রায় চৌধুরীর তিনপুত্র—তেত্রিশতম পুরুষ নবনীলাল, নিকুঞ্জবিহারী এবং প্রবোধচন্দ্র।

নবনীলাল কলকাতায় চাকরিরত ছিলেন। কিন্তু প্রতি সপ্তাহের শনিবার তিনি খেপুত-বাড়িতে অবশ্যই যেতেন এবং সংসার ও পরিবার সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজখবর নিতেন। তিনি কর্তব্যপরায়ণ, অতিরিক্ত অতিথিবৎসল মানুষ ছিলেন। তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিপত্নীক মানুষ ছিলেন। সেজন্য তিনি সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল এবং স্নেহশীল ছিলেন। তাঁর খুল্লতাত হরিপদ রায় চৌধুরী বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক অক্ষম হলে

তিনি বেশ কয়েক বছর নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে কালীমাতার পূজার আসনে বসে মায়ের পূজার্চনা করেন। চাকরি থেকে অবসর লাভ করার পর তিনি খেপুতবাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকেন এবং গোষ্ঠীপতি হয়ে গোষ্ঠীর সমস্ত কাজকর্ম দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। তিনি ভবানী রায় চৌধুরী প্রভৃতি অনেক উত্তরসুরিকে হাতেকলমে কাজ শিখিয়ে যান। তিনি খেপুতবাড়ির প্রথম ব্যক্তি যিনি উত্তরসুরীদের সঙ্গে অর্থাৎ নবীনদের সহিত সহমত হয়ে কাজ করেছেন এবং তাঁদের কাজ শিখিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন। খেপুতবাড়ির গঠনমূলক কার্য মূলত তাঁর সময় থেকেই শুরু হয়। পূর্বে কেবল সংস্কারমূলক এবং মেরামতি কাজকর্ম হত। তিনি গোষ্ঠীর সরকারি তহবিল সততার সঙ্গে এবং নির্ভুলভাবে রক্ষা করতেন। নটবর রায় চৌধুরীর মতো তিনি বিবিধ গৃহকর্মে পারদর্শী ছিলেন। তিনি গাছপালা লাগাতে এবং সময়মতো সেগুলির পরিচর্যা করতে ভালোবাসতেন। বাড়ির অনেকের আর্থিক দায়দফায় তিনি গোপনে অর্থসাহায্য করতেন। খেপুত উচ্চ বিদ্যালয়ের দূরদেশের শিক্ষকদের তিনি বাড়িতে রাখতেন। উক্ত বিদ্যালয়ে তিনি কয়েকটি আসবাবপত্রও দান করেছেন। বাড়ির সফল ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হঠাৎ আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

নবনীলালের তিন পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ কার্তিকচন্দ্র, অক্ষয়কুমার এবং চিত্তরঞ্জন।

কার্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী রেলওয়ে বিভাগে প্রথমে সাঁতরাগাছি, পরে কাঁচরাপাড়ায় কর্মরত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি পিতার মতো প্রতি সপ্তাহে খেপুতের বাড়িতে আসতেন। কার্তিকচন্দ্র গ্রামের তরুণ সংঘের একজন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী এবং সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের তিনি একজন সক্রিয় এবং প্রগতিশীল মানসিকতার বংশধর। তিনি পরিবারের কয়েকটি কুসংস্কারের নিরসন ঘটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। খেপুতবাড়িতে পূর্বে পারিবারিক তহবিল—যাকে সরকারি তহবিল বলা হয়—সেই অর্থ দ্বারাই কালীপূজা ইত্যাদি এজমাল খরচ নির্বাহ করা হত। ব্যক্তিগত বা শরিকী কোনো অর্থ চাঁদাস্বরূপ আদায় করার রীতি ছিল না। কিন্তু কার্তিক চন্দ্র রায় চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে ভবানী রায়চৌধুরী, নিজ ভ্রাতা অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী এবং শঙ্কর জীবন রায় চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজনের উদ্যোগে খেপুত তরুণ সংঘের সাহচর্যে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'দেবলা দেবী' নাটক কালীপূজার সময় বাড়িতে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ের সমস্ত ব্যয় তিনি নিজে কয়েকজনের সহায়তায় নির্বাহ করেন। পরবর্তী বৎসরেও অনুরূপভাবে কালীপূজার সময় 'কন্যাদায়' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। অভিনয়ের চাঁদা সংগ্রহ করা থেকেই খেপুতবাড়িতে যুবকগণের চাঁদা দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়। বর্তমানে যুবকগণের এই তহবিলের নাম 'যুবক ফান্ড'। কার্তিকচন্দ্র কালীপূজার পূর্বে বাড়ির

ছোটোদের শুকনো বেগুনগাছ পুড়িয়ে কয়লা তৈরি করে রাখতে বলতেন। তিনি কলকাতা থেকে তুবড়ির জন্য মাটির খোল, বারুদ এবং গন্ধক প্রভৃতি মশলা নিজ খরচে নিয়ে গিয়ে সেই কয়লা দিয়ে নিজ হাতে তুবড়ি তৈরি করে কালীপূজার সময় জ্বালাতেন। বর্তমানে সেই বাজিখেলা খেপুতবাড়িতে একটি বিরাট রূপ ধারণ করেছে। মহকুমার মধ্যে এরকম বর্ণাঢ্য বাজিখেলা প্রায় দেখা যায় না। বর্তমানে খেপুতবাড়িতে কালীপূজার সময় বাজিখেলা দেখার জন্য দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে বহু দর্শক পূজার রাত্রে সমবেত হন।

কার্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁর মেজোকাকা নিকুঞ্জবিহারী বার্ধক্যে অক্ষম হলে কালীমাতার পূজার আসনে বসেন। তিনি বহুদিন ভক্তিসহকারে মাতার পূজা করেছেন। তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনিতে অনেকের মনে ভাব ও ভক্তির সঞ্চার হত। বর্তমানে তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর পূজার আসনে বসতে পারেন না।

কার্তিক চন্দ্র বর্তমানে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায় বাড়ি করে সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছেন। তবে কালীপূজার সময় তিনি অবশ্যই খেপুতবাড়িতে আসেন।

কার্তিকচন্দ্রের চার পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ পঙ্কজকুমার, প্রণবকুমার, প্রকাশকুমার এবং প্রভাতকুমার। জ্যেষ্ঠপুত্র পঙ্কজকুমার কাঁচরাপাড়ায় রেলওয়ে বিভাগে কর্মরত। দ্বিতীয় পুত্র প্রণবকুমার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় চাকরি করেন। আর প্রকাশকুমার এবং প্রভাতকুমার কাঁচরাপাড়ায় ব্যবসায় লিপ্ত।

নবনীলাল রায় চৌধুরীর মধ্যম পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ অক্ষয় কুমার রায় চৌধুরী ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ায় কর্মরত ছিলেন। তিনি একজন নাট্যশিল্পী। খেপুত তরুণ সংঘে এবং বাড়িতে কালীপূজার সময় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। অফিসে রিক্রিয়েশন ক্লাবেও তিনি বেশ কয়েকবার অভিনয় করেছেন। অক্ষয়কুমার প্রথম জীবনে একজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার মহকুমা স্তরে ফুটবল খেলায় তিনি কয়েকবার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অক্ষয়কুমার সৎ, কর্মপ্রিয়, স্নেহশীল এবং অতিথিবৎসল মানুষ।

অক্ষয়কুমারের একটিমাত্র পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ প্রতাপকুমার রায়চৌধুরী। তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কর্মচারী। বর্তমানে তিনি পিতামাতার সহিত কলকাতার আহিড়িটোলা এলাকায় নিজ বাসগৃহে বসবাস করছেন।

নবনীলাল রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী একজন কর্মযোগী পুরুষ। তিনি বিষয়কর্মের সহিত সামাজিক কাজকর্মেও যথেষ্ট পারদর্শী।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি ছিলেন। স্টেট ব্যাঙ্কে কর্মরত থাকাকালীন তিনি ওই ব্যাঙ্কে এমপ্লয়িজ সোসাইটির চার বছর সেক্রেটারি ছিলেন। বর্তমানে তিনি হাওড়া-শিবপুরের নিজগৃহে বাস করেন। ফলে শিবপুর এলাকার বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তিনি সামাজিক কাজকর্মে বিজড়িত। ইয়ুথ হোস্টেল এ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ হাওড়া শাখায় তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছর সভাপতি ছিলেন। পরে তিনি ওই সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখাতেও ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছর চেয়ারম্যান পদে আসীন ছিলেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে আন্তর্জাতিক ইয়ুথ হোস্টেল অব ইন্ডিয়ার কনফারেন্সে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন। দিল্লির স্থানীয় পত্রিকা এই কনফারেন্স কভার করেছেন এবং অনুষ্ঠানের ছবিসহ তা প্রকাশ করেছেন। উক্ত সংস্থার বিভিন্ন স্থানের অধিবেশন এবং অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী যোগদান করেছেন।

এছাড়া হাওড়া পৌরসভার রেট পেয়ার এ্যাসোসিয়েশন কমিটির গত কয়েক বছর ধরে তিনি সদস্য আছেন। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ওয়াকার এ্যাসোসিয়েশনের তিনি সভাপতি। খেপুতে তরুণ সংঘে তিনি কয়েকবার অভিনয়ও করেছেন।

খেপুতের বাড়ির সঙ্গেও চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। গোষ্ঠীর উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর চেষ্টা এবং অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বিধ্বংসী বন্যায় মাটির ঠাকুর ঘর ভূমিস্যাৎ হয়ে গেলে অন্যান্য পরিবারসদস্যগণের সহিত তিনি যথেষ্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মন্দির নির্মাণের জন্য ইটপত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া গোষ্ঠীর যে-কোনো কাজে তিনি সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন। কালীপূজার সময়ও তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সমাধা করেন। বর্তমানে তিনি খেপুত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের গোষ্ঠীপতির পদে আসীন।

চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ দেবজিৎ এবং স্মরজিৎ।

জ্যেষ্ঠপুত্র দেবজিৎ রায় চৌধুরী মেধাবী ছাত্র। লেটার মার্কস নিয়ে তিনি বি.ই. মডার্ন স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি টেক্নোলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেন। বর্তমানে তিনি স্যান্ডোজ কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজার পদে কানপুরে কর্মরত। কর্মস্থল থেকে তিনি কয়েকবার ডেনমার্ক প্রভৃতি স্থানে গিয়েছেন। কালীপূজার সময় খেপুতবাড়িতে তিনি সপরিবারে অবশ্যই আসেন।

চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র স্মরজিৎ রায় চৌধুরী দাদা দেবজিতের মতো বি.ই. মডার্ণ স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের সহিত

উত্তীর্ণ হন। তারপর গোয়েঙ্কা কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক হওয়ার পর কস্টিং ও সি.এ. পড়াশোনা শুরু করেন। এই কলেজে পড়াশোনার সময় তিনি ছাত্র পরিষদের সম্পাদক এবং পরে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্মরজিৎ রায় চৌধুরী পরে সাংবাদিকতা এবং আইনবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উক্ত দুটি বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' খেলাধূলার কলমে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি 'খেলতে খেলতে' পত্রিকার সহসম্পাদক হন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ভারত-ইংল্যান্ড ক্রিকেট টেস্ট সিরিজের ইডেনের খেলা তিনি কভার করেন। এরপর 'ট্রান্সপোর্ট ক্রোনিক্যাল' নামক পত্রিকার একসিকিউটিভ এডিটর হিসেবে কাজ করেন। 'গণশক্তি' পত্রিকার খেলাধূলা বিভাগের সাংবাদিক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। এরপর নতুন কর্মজীবন শুরু হয় 'বর্তমান' পত্রিকার আইন বিভাগের সাংবাদিক রূপে। 'আজকাল' পত্রিকাতেও আইন বিভাগের সাংবাদিক হিসেবে তিনি কাজ করেন।

প্রখ্যাত আইনবিদ্ ভোলানাথ সেনের পরামর্শে আইনি সাংবাদিকতার পথকেই স্মরজিৎ রায় চৌধুরী বেছে নেন। সেজন্য ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গালোরের National Law School of India থেকে তিনি আইন বিদ্যার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। বর্তমানে স্মরজিৎ রায় চৌধুরী 'Asian Age' এবং 'আজকাল' পত্রিকার আইন বিভাগের সাংবাদিক। তা ছাড়া কলকাতা হাইকোর্টে তিনি নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন। ইতিমধ্যে তাঁর 'Human Rights Law and Practice' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া শম্ভুনাথ ঘোষের 'Commentary on Human Rights' গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেছেন।

বড়িশা সাবর্ণ পরিবার কলিকাতার জন্মের ইতিহাস নির্ধারণ সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্টে যে জনস্বার্থ মামলা শুরু করে—বড়িশা পরিবারের পক্ষে সেই মামলা স্মরজিৎ রায় চৌধুরী সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন।

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে ন্যাশানাল ল কনফারেন্সে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন। বক্তব্যের গুরুত্ব বিচার করে স্মরজিৎ রায় চৌধুরীকে একটি শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

কলকাতা দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলের বিভিন্ন প্রোগ্রামে স্মরজিৎকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেও দেখা যায়।

খেপুতের বাড়ির সঙ্গেও তাঁর ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। কালীপূজার সময় তিনি অবশ্যই খেপুতে উপস্থিত হন।

সুরজিৎ রায় চৌধুরীর পত্নী স্বপ্না রায় চৌধুরী কৃতিত্বের সঙ্গে এম.কম. পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন এবং বর্তমানে তিনি হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের কমার্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকার পদে আসীন আছেন।

তারাপদ রায় চৌধুরী দ্বিতীয় পুত্র তেত্রিশতম পুরুষ নিকুঞ্জবিহারী রায় চৌধুরী অতি মেধাবী এবং মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তাঁর সময়ে খেপুত এলাকায় কোনো উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় না থাকায় তিনি প্রতিদিন মাটির রাস্তার ধুলোকাদা মাড়িয়ে দশ মাইল দূরের সোনাখালি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করতেন। সাফল্যের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর হুগলি জেলায় খানাকুলের নিকট গোপালনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রদের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সংসারজীবনে তিনি পিতামাতা, দাদা প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ছোটোদের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতেন। দাদা নবনীলাল রায় চৌধুরী শারীরিক অক্ষম হলে তিনি পূজক হিসেবে কালীমাতার পূজার আসনে বেশ কয়েক বৎসর বসেন। সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকার কারণে শুদ্ধ উচ্চারণ এবং তাঁর বজ্র গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রত্যেকেই কেবল মুগ্ধ নন—ভাবাপ্লুত হতেন। অধিকাংশ মন্ত্র এবং পূজার পদ্ধতি নিকুঞ্জবিহারীর মুখস্থ হয়ে গেছল। তিনি নিজেও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন।

নিকুঞ্জবিহারী কয়েক বৎসর কালীপূজার দায়িত্বও পালন করেন এবং সুনামের সঙ্গে হিসাবপত্রও রক্ষা করেছেন।

নিকুঞ্জবিহারী রায় চৌধুরীর তিন পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ—মনোরঞ্জন, জীবনরঞ্জন এবং সত্যরঞ্জন তিনজনেই স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় চাকরি করছেন। তাঁরা হাওড়া জেলার বাউড়িয়া রেল স্টেশনের নিকট নিজ বসতবাড়ি তৈরি করে সেখানে বসবাস করছেন। কালীপূজার সময় এবং বৈষয়িক কারণে তাঁরা প্রত্যেকেই খেপুত বাড়িতে উপস্থিত হন।

তারাপদ রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র তেত্রিশতম পুরুষ প্রবোধচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। তিনি নিঃসন্তান কাকা হরিপদ রায় চৌধুরীর পালিত পুত্র ছিলেন। হরিপদ রায় চৌধুরী হুগলি জেলার রাজহাটি-সেনহাট মৌজায় শ্বশুরালয়ের সম্পত্তিলাভ করেছিলেন। সেজন্য তিনি সেখানে বসবাস করতেন। ফলে প্রবোধচন্দ্রও কাকার সহিত সেনহাটে থাকতেন। অবশ্য খেপুতবাড়ির সহিত এবং পিতামাতা, ভ্রাতাদের সহিত তাঁর সমস্ত যোগসূত্রই ছিল।

প্রবোধচন্দ্র সেনহাটে শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রসমাজে যথেষ্ট

শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষক সংগঠনের সহিতও যুক্ত ছিলেন। সফল সংগঠক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। জনপ্রিয় এই ব্যক্তি সেনহাটে অনেক সামাজিক কার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। বিভিন্ন সংঘ এবং সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সখের থিয়েটার ক্লাবে তিনি একজন সার্থক চরিত্রভিনেতা ছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের একটি নিজস্ব বইদোকানও ছিল।

খেপুতে কালীপূজার সময় তিনি সপরিবারে উপস্থিত হতে কখনোই ভুলতেন ন. মন্দিরের বিশেষ করে দেবীর ম্যারাপের আলোকসজ্জার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে বিভিন্ন রংয়ের বড়ো বড়ো মোমবাতি কিনে আনতেন। গোষ্ঠীর বাৎসরিক আলোচনার আসরে তিনি অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলি তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করতেন। প্রবোধচন্দ্র অতি মিতভাষী এবং মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন।

প্রবোধচন্দ্রের দুই পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ প্রশান্তকুমার এবং সুশান্তকুমার।

জ্যেষ্ঠ প্রশান্ত কুমার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় বর্তমানে ডেপুটি ম্যানেজার পদে আসীন। তিনি কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি তৈরি করেছেন। সুশান্তকুমার সেনহাটেই আছেন। তিনি বৈষয়িক মানুষ। তা ছাড়া তাঁর নিজস্ব একাধিক ব্যাবসা আছে।

উভয় ভ্রাতা—প্রশান্তকুমার এবং সুশান্তকুমার খেপুতের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে খেপুতের বাড়িতে আসেন। কালীপূজার সময় প্রত্যেকেই সপরিবারে অবশ্যই উপস্থিত হন।

বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরীর দুই পুত্র তেত্রিশতম পুরুষ পঞ্চানন এবং দুলাল চন্দ্র।

জ্যেষ্ঠপুত্র পঞ্চানন রায় চৌধুরী শান্ত, মিতভাষী, নির্বিবাদী সরল মানুষ ছিলেন। তিনি কলকাতায় ব্রেথওয়েট কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

চাকরি করার সময় তিনি বড়িশা সখের বাজারের পূর্বদিকে মুরাদপুরে জমি কিনে বসতবাড়ি তৈরি করেন। সেখানেই বর্তমানে তাঁর পুত্রগণ বসবাস করছেন। পঞ্চানন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাতৃভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রেম উল্লেখযোগ্য। কালীপূজার সময় তিন সপরিবারে অবশ্যই খেপুতে উপস্থিত হতেন।

পঞ্চানন রায় চৌধুরীর তিন পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ আশুতোষ, ভবতোষ এবং সন্তোষ। তিনি ভাই-ই প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে কলকাতায় চাকরি করছেন। পিতা পঞ্চানন রায় চৌধুরী মুরাদপুরে যে বাড়ি তৈরি করে গিয়েছিলেন তিন ভাই-ই সেই বাড়িতে বসবাস করছেন।

বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র দুলালচন্দ্র কলকাতায় দাদা পঞ্চাননের সংসারেই থাকতেন। তিনি কলকাতায় পুলিশ বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় অল্পবয়সে তিনি দুর্বৃত্তের হাতে নিহত হন। দুলালচন্দ্র খুব আমুদে এবং শৌখিন স্বভাবের মানুষ

ছিলেন। তিনি খেপুত তরুণ সংঘের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্যে তিনি সদা প্রয়াসী ছিলেন।

দুলাল রায় চৌধুরীর একটিমাত্র পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ পরিতোষ রায়চৌধুরী। তিনি শিক্ষান্তে বর্তমানে কলকাতায় ব্যাবসা করছেন। বিধবা মাকে নিয়ে সপরিবারে কালীপূজার সময় খেপুতের বাড়িতে উপস্থিত হন।

এরপর দক্ষিণের বাড়ির বংশধরগণের সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

নটবর রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ তারিণীচরণ এবং রামকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠপুত্র তারিণীচরণ মূলত ব্যাবসার কাজে কোলাঘাট, কলিকাতা, খিদিরপুরে বেশি থাকতেন। মাঝে মধ্যে খেপুত বাড়িতে আসতেন। তিনি হিসাবী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। কালীপূজার সময় তিনি অবশ্যই অন্যান্য বংশধরগণের মতো খেপুতে আসতেন। তিনি মায়ের পূজার দিন মন্দিরের কাজকর্ম, ঘটস্থাপন ব্যবস্থা ইত্যাদি কর্ম আন্তরিকতার সহিত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতেন। তিনি কয়েক বছর মায়ের পূজায় পূজকের আসনেও বসেছেন।

তারিণীচরণ রায় চৌধুরীর তিন পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ কালীকিঙ্কর, তারাকিঙ্কর এবং রমাকিঙ্কর। জ্যেষ্ঠপুত্র কালীকিঙ্কর সরকারি অফিসে চাকরি করতেন। তিনি কলকাতা-বেহালা অঞ্চলে নিজ বাসগৃহে বসবাস করেন। অপর দুই পুত্র তারাকিঙ্কর এবং রমাকিঙ্কর নিজ নিজ ব্যবসায় নিযুক্ত আছে। উক্ত তিন ভ্রাতার পুত্রগণ শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত আছেন। প্রত্যেকেই খেপুতবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং কালীপূজার সময় সেখানে সমবেত হন।

নটবর রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কয়েকটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে উত্তীর্ন হন। তখন খেপুত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় দশম শ্রেণির অনুমোদন না পাওয়ায় তিনি হাওড়া-শিবপুরে আত্মীয়বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। সেখানে থেকেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কবি বিষ্ণু দে-র তিনি প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন। বি.এ. পাশ করার পর তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে মিলিটারী অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। চাকরির কিছুদিন পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সে সময় তাঁকে দিল্লিতে বদলি করা হয়। ফলে পিতা নটবর রায় চৌধুরীর পরামর্শ অনুসারে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাগরপুরের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্যে নিযুকত হন। পরে বাড়ির আরও নিকটে চাঁইপাট বিদ্যালয়ে চলে আসেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর খেপুত উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় (Govt. aided School) রূপে স্বীকৃতিলাভ করলে তিনি খেপুত উচ্চবিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষকরূপে যোগদান করেন।

রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ছাত্রমহলে অতি শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ছিলেন। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রায় সমসাময়িক খুড়তুতো ভাই অনাদিচরণের সহিত একযোগে গোলাবাড়ির বাস্তুর নিকট একটি অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠাগারের জন্য পাড়া থেকে বইপত্র চেয়ে আনেন। এদের আগ্রহ এবং প্রচেষ্টায় সাড়া দিয়ে সমসাময়িক আরও কয়েকজন বন্ধু—আশুতোষ পাল, পঞ্চানন মৌলিক, দুর্গাচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। এতে পাঠাগারটির বৃদ্ধি ঘটল বটে—কিন্তু পাঠাগারটি পঞ্চানন মৌলিকের সংরক্ষিত সদরঘরে উঠে গেল। বর্তমানে এই পাঠাগারটি 'খেপুত সাধারন পাঠাগার' নামে দক্ষিণবাড়ে অবস্থিত।

রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্পষ্টভাষী এবং পিতার মতো কর্মযোগী মানুষ ছিলেন। কোনো-না-কোনো কর্মে তিনি সর্বদা লিপ্ত থাকতেন। তিনি কালীপূজার হিসাব রক্ষা এবং কর্তৃত্ব বহুদিন করেছেন। খেপুত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারে নটবর রায় চৌধুরীর নির্দেশিত পথে পরবর্তী বংশধরগণ যাঁরা আলোকশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন—রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী অবশ্য তাঁদের অগ্রজ। রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর সময়ে সমাজপতি রীতি ছিল না। উত্তরবাড় মৌজার সাংসারিক এবং সামাজিক সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি এবং পরামর্শ অবশ্যই কাম্য ছিল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনিই খেপুত বাড়ির প্রথম নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

রামকৃষ্ণ কালীমাতার স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কারাদি পিতা নটবর রায় চৌধুরীর মতো আজীবন নিজ দায়িত্বে গচ্ছিত রাখতেন। তিনি দীর্ঘদিন অর্থাৎ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সাবর্ণ পরিবারের গোষ্ঠীপতি ছিলেন।

রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর চার পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ দেবীপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, বেণুগোপাল এবং কমলেশ।

তৃতীয় পুত্র বেণুগোপাল আংশিক বাক্-প্রতিবন্ধী। তবুও তিনি নিজ ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। অবশিষ্ট তিন পুত্রই মেধাবী। জ্যেষ্ঠপুত্র দেবীপ্রসাদ এম.এ. পাশ করে প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি কানাড়া ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরূপে খড়্গপুর শাখায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে নিজ বাসগৃহে বসবাস করেন। দেবীপ্রসাদ বর্তমানে গোষ্ঠীর হিসাব পরীক্ষক। দ্বিতীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথ এম.এ., বি.এড্ পাশ করে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সফল শিক্ষকরূপে তিনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন গোষ্ঠীর সম্পাদক ছিলেন। কনিষ্ঠপুত্র কমলেশ জীবনবীমা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তিনিও এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেছেন। কমলেশ বর্তমানে গোষ্ঠীর সহ-সম্পাদক পদে আসীন। খেপুতের বাড়িতে সবসময় থাকার জন্য

তিনি পরিবারের সমস্ত কাজকর্ম আন্তরিকতার সহিত দেখাশোনা করেন। বাড়ির অন্যান্য কাজকর্মে এবং কালীপূজায় চার পুত্রই খেপুতবাড়িতে সমবেত হন।

নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর তিন পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ শঙ্করজীবন, শক্তিপদ এবং দেবদাস।

শঙ্করজীবন রায় চৌধুরী প্রথম জীবনে আসাম প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করে অবশেষে কলকাতায় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি কর্মযোগী, পরোপকারী এবং স্পষ্টবক্তা মানুষ ছিলেন। গোষ্ঠীর কল্যাণ এবং উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় শঙ্করজীবন পরলোকগমন করেন।

শঙ্করজীবনের পাঁচ পুত্র—পঁয়ত্রিশ পুরুষ দীপঙ্কর, শুভঙ্কর, ওঙ্কারনাথ, সোমনাথ এবং অমরনাথ। এই পাঁচ ভ্রাতাই শিক্ষিত এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত।

জ্যেষ্ঠপুত্র দীপঙ্কর রায় চৌধুরী কলকাতায় নিজ ব্যাবসা এবং কারখানা পরিচালনা করেন।

দ্বিতীয় পুত্র শুভঙ্কর মূলত খেপুতবাড়িতেই থাকেন। ভবানী প্রসাদ রায় চৌধুরীর পর তিনি গোষ্ঠীর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল তিনি সাফল্যের সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পাদকের কার্যভার নির্বাহ করছেন। তিনি বিশেষ উদ্যোগী কর্মী এবং তিনি উন্নয়নমুখী কর্মে বিশেষ তৎপর। তাঁর আমলে কয়েকটি গঠনমূলক কাজ হয়েছে।

তৃতীয় পুত্র ওঙ্কারনাথ স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার উচ্চপদে কর্মরত। তিনি সম্প্রতি সোনারপুরে নিজ বাসগৃহ তৈরি করেছেন।

চতুর্থ পুত্র সোমনাথও কলকাতায় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় চাকরি করেন। পঞ্চম তথা কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরনাথ কলকাতায় চাকরি করেন।

প্রত্যেক ভাই খেপুতবাড়ির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। কালীপূজার সময় সকলেই অবশ্যই খেপুতবাড়িতে একত্রিত হন।

নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর মধ্যম পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ শক্তিপদ রায় চৌধুরী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে দু-একটি অন্য চাকরি করার পর নিজ মেধাবলে তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার স্ট্র্যান্ড রোড অফিসে চাকরিলাভ করেন। তিনি বরাবরই একই অফিসে কাজ করেছেন, অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়নি।

খেপুতবাড়িতে একত্রিশতম পুরুষের পর থেকে জমিদারি এবং পত্তনিদারি চলে যাওয়ায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশধরগণ আর্থিক দিক থেকে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন। নিম্ন দাসপুর বন্যা প্লাবিত এবং জলাভূমি এলাকা হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক বৎসর বন্যার কবলে পড়ত। ফলে একমাত্র ফসল আমন ধান নষ্ট হত। পাটচাষেরও ক্ষতি হত। জমিজায়গায়

আয়কর ফসল নষ্ট হওয়ায় সাবর্ণ বংশধরগণ জমি বিক্রি করেই জীবনযাপন করতে শুরু করেন। এমন সময় বংশধরগণের অর্থকরী চাকরির একান্ত প্রয়োজন ছিল। এইরকম এক অর্থসঙ্কটের সময়ে শক্তিপদ রায় চৌধুরী খেপুত সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের অনেক যুবককে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চাকরি করে দিয়েছিলেন। তখন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়নি। ফলে আমলাগণের হাতে অনেক সুযোগসুবিধে ছিল। শক্তিপদ বাড়ির বেকার যুবকদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের এবং মর্যাদার কথা না ভেবে তাদের চাকরি করে দিয়েছেন। এরপর খেপুতের সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারে একটা নতুন অর্থনৈতিক জাগরণ আসে। লক্ষ করলে দেখা যাবে—খেপুতের সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের অধিকাংশ বর্তমান বংশধর ব্যাঙ্কের চাকুরে।

শক্তিপদ রায় চৌধুরী উত্তর কলকাতায় সিঁথিতে নিজ বাসগৃহ তৈরি করেছেন। কিন্তু একমুহূর্তও খেপুতের কথা ভুলে থাকেন না। তাঁর কর্মজীবন শুরু হওয়ার সময় থেকে বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি গোষ্ঠীর উন্নয়ন সম্পর্কে সদা তৎপর এবং একটার পর একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কার্য সম্পাদন করে চলেছেন। দীর্ঘদিন তিনি গোষ্ঠীর হিসাবপত্র দেখে এসেছেন এবং অর্থ সংগ্রহের পথ নির্ণয় করেছেন। তিনি কয়েক বছর গোষ্ঠীপতিও ছিলেন।

শক্তিপদ রায় চৌধুরীর তিন কন্যা—শিখা, বুলবুল ও রীতা। তিন কন্যাই শিক্ষিতা। শক্তিপদ তিন কন্যাকেই যোগ্য পাত্রে বিবাহ দিয়েছেন। বুলবুল কলকাতায় কর্মরতা।

নগেন্দ্র রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ দেবদাস রায়চৌধুরী। তিনিও শক্তিপদ রায় চৌধুরীর সহিত কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় কর্মরত ছিলেন।

বর্তমানে দেবদাস রায় চৌধুরী হাওড়ার রামরাজাতলায় নিজ বাড়িতে বসবাস করেন। তিনি অল্পভাষী এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি মাঝে মাঝে খেপুতবাড়িতে আসেন। তবে কালীপূজার সময় তিনি সপরিবারে অবশ্যই খেপুতবাড়িতে উপস্থিত হন।

দেবদাস রায় চৌধুরীর একটি পুত্র পঁয়ত্রিশতম পুরুষ সৈকত রায়চৌধুরী। সৈকত শিক্ষালাভ করে বর্তমানে কলকাতায় কর্মরত।

শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ অনাদি রায় চৌধুরী খেপুত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের এক উল্লেখযোগ্য বংশধর। তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে খেপুত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রথম বছরের পরীক্ষার্থীদের অন্যতম। অনাদিচরণ চারটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উক্ত বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ছাত্রজীবনে একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদও ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার মহকুমা এবং জেলায় বহুবার তিনি ফুটবল খেলার গোলরক্ষক হিসাবে প্রথম

পুরস্কার লাভ করেছেন। খেপুতের বর্তমান যে সাধারণ পাঠাগার তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন অনাদিচরণ। এ বিষয়ে তিনি সমসাময়িক জ্যাঠতুতো দাদা রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর একান্ত সহযোগী কর্মী ছিলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

সাহিত্যের প্রতি অনাদিচরণের বিশেষ অনুরাগ ছিল। এক সময় কলেজে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সাহিত্য শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। সংগীতচর্চাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গুণীশিল্পী এবং সুগায়ক হিসেবে তিনি জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেন। অনাদিচরণ প্রথম জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে সুশীল মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পথপদর্শক। সমাজসেবামূলক কার্যে অনাদিচরণ বরাবর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর বিভাগের অফিসার পদে নিযুক্ত হন। হাওড়া-শিবপুরে তিনি নিজ বাসগৃহে বসবাস করলেও খেপুতবাড়ির সঙ্গে তিনি বরাবর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিলেন। রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী পরলোকগমন করার পর তিনি খেপুতের গোষ্ঠী সংসদের সভাপতি পদে আমরণ আসীন ছিলেন। পরিবারের উন্নয়নমূলক কার্যে তিনি সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। খেপুতে তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী গোষ্ঠী সংসদ' প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী হন। তিনি নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিকেও তিনি বিচক্ষণতা এবং আন্তরিকতার স্পর্শে অনুকূল করতে সক্ষম হয়েছেন।

অনাদি রায় চৌধুরী প্রথম বড়িশা সাবর্ণ পরিবারের সহিত ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সংযোগ স্থাপন করেন—এ বিষয়ে আটচালা বাড়ির সংগীতজ্ঞ বেচু রায় চৌধুরীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। অনাদিচরণ প্রথমে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর থেকে বেচু রায় চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন খেপুতে কালীপূজার সময় বড়িশাবাড়ির প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছেন। অবশ্য বেচু রায় চৌধুরী প্রায় প্রত্যেক বৎসর যেতেন এবং পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। অনুরূপভাবে খেপুতবাড়ি থেকেও প্রতিনিধি হিসেবে যে-কেউ আটচালা বাড়ির দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করতে আসতেন। অনাদিচরণ এবং তাঁর পুত্রগণ অবশ্য প্রত্যেক বছরই যোগদান করেন। অনাদিচরণের কনিষ্ঠ পুত্র অমিতাভ রায় চৌধুরী বড়িশা আটচালা বাড়ি তথা ওখানের পরিবার পরিষদের সঙ্গে বিশেষভাবে বিজড়িত।

শিবপুরে অনাদিচরণ South Howrah Youth Hostel প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের তিনি আমরণ সভাপতি ছিলেন।

অনাদিচরণ রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ অমলকুমার এবং অমিতাভ।

অমল কুমার রায় চৌধুরী বরাবর মেধাবী ছাত্র। কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে শারীরবৃত্ত (Physiology) বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। তারপর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি উক্ত বিষয়ে সাফল্যের সহিত এম.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। গবেষণার সময় কিছুদিন বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের Central Drug Laboratory সংস্থায় Asstt. Pharmacologist পদে যোগদান করেন। পরে ভারতীয় সেনা বিভাগে Research & Development কার্যালয়ে Junior Class I Scientific Officer পদে যোগ দেন। এরপর তিনি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায় থেকে পিএইচ.ডি. করেন। তারপর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে চলে আসেন Indian Council of Medical Research-এ। এই সংস্থায় তিনি বর্তমানে ডাইরেক্টরের পদে আসীন।

ড. অমল কুমার রায় চৌধুরী চাকরি এবং গবেষণার প্রয়োজনে ভারতের বহু জায়গায় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরেছেন। এমন কি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উদ্ভাবনের কার্যে U.S.A., U.K., Japan, China, Thailand, Germany, France, Canada প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। তিনি বহু পুরস্কারও লাভ করেছেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ড. অমল কুমার রায় চৌধুরী Fellow, Royal Society of Microscopy উপাধি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সভাপতি।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও অমলকুমার কালীপূজার সময় খেপুতবাড়িতে সপরিবারে আসতে ভুলেন না। পূজায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সকলের সঙ্গে মিশতে তিনি ভীষণ উৎসুক।

অমলকুমারের পুত্র ছত্রিশতম পুরুষ অয়নকুমার রায় চৌধুরী পিতার মতই মেধাবী ছাত্র। প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অয়নকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বৎসরের কোর্সের পাঠ শেষ করে LLB ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি কলকাতার অভিজাত Fox and Mondal নামক এক Law Farm-এ Law Assistant হিসেবে কাজে যোগদান করেন এবং কলকাতা উচ্চ আদালতে Practice করতে শুরু করেন। কিছুদিন মুম্বাই-এর National Security Depository সংস্থায় Law Officer পদে কাজ করেন। ওই সময়ে পুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Post Graduate Diploma in Intellectual Property Right Law পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে Bangalore School of Law থেকে P.G. Diploma লাভ করেন। এরপর তিনি চলে যান জার্মানি। সেখানে Max Plumg Institute থেকে Master of

Law (LLM) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে অয়নকুমার লন্ডনে সেন্ট ক্যুইন মেরি কলেজের School of Law-তে Ph.D. ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণাকার্যে ব্যাপৃত আছেন।

অয়নকুমার হাওড়া-শিবপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। তবু এত ব্যস্ততার মধ্যে কালীপূজার সময় খেপুতবাড়িতে প্রত্যেকের সঙ্গে মিশে পূজার আনন্দ ভাগ করে নিতে ভুলেন না।

অয়নকুমারের মাতা অর্থাৎ ড. অমলকুমার চৌধুরীর পত্নী পারমিতা রায় চৌধুরী উচ্চ শিক্ষিতা। তিনি শিবপুরে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা পদে কর্মরতা।

অনাদিচরণের দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র পঁয়ত্রিশতম পুরুষ অমিতাভ রায়চৌধুরীও বেশ মেধাবী এবং কৃতী ছাত্র। বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি অনার্সসহ বি. এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর এম. এসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি শিক্ষকতার পদ বেছে নেন। পরে বি.এড্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে তিনি দি হাওড়া দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (মেন)-এর প্রধান শিক্ষক। অমিতাভর নীতি ও আদর্শবোধ প্রশংসার দাবি রাখে। শিক্ষক হিসেবে তিনি বেশ সফল এবং সার্থক। ছাত্রসমাজে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। অমিতাভ খেপুতবাড়ির সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত।

অমিতাভ বড়িশা সাবর্ণ পরিবারের সহিত অনেকদিন থেকেই অর্থাৎ পিতা অনাদিচরণ রায় চৌধুরীর আমল থেকেই বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তিনি প্রতি বছর হাওড়া-শিবপুরের বাড়ি থেকে দুর্গাপূজায় বড়িশা আটচালা বাড়িতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বড়িশাবাড়ির কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অনুষ্ঠানেও তিনি আমন্ত্রিত হন এবং তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে সেইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অমিতাভ রায় চৌধুরী বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের অন্যতম সহ সম্পাদকও বটে।

অমিতাভ রায় চৌধুরীর একটিমাত্র পুত্র ছত্রিশতম পুরুষ অর্ণব রায় চৌধুরী বাল্যকাল থেকেই বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের। ছাত্র হিসেবেও তিনি বেশ মেধাবী এবং বুদ্ধিমান। সাফল্যের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বর্তমানে তিনি বোলপুর শান্তিকেতনে বি.এসসি এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করছেন। অর্ণবকুমার কালীপূজার সময় পিতামাতার সহিত খেপুতবাড়িতে গিয়ে আনন্দোৎসবে যোগদান করতে ভুলেন না।

উত্তরের বাড়ির বিষয়ে আলোচনা করব। যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর একটি মাত্র পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ ভবানীপ্রসাদ। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিভিন্ন সংঘাত এবং অনটনের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল বিধবা মাতার স্নেহ-যত্ন এবং অনুপ্রেরণায় অতিবাহিত হয়। ভবানী প্রসাদের মাতৃভক্তি প্রশংসার দাবি রাখে। পিতা যতীন্দ্রনাথের সুকৃতির ফলে এবং নিজস্ব মেধাবলে তিনি খেপুত উচ্চবিদ্যালয়ে বরাবর বিনা বেতনে পড়াশোনা করেন

এবং ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নম্বরসহ সেকেন্ডারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর স্নাতক হন এবং হিন্দি ভাষায় কোবিদ পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। এই সময় প্রথমে তিনি খেপুত উচ্চবিদ্যালয়ে কিছুদিন করণিক পদে নিযুক্ত থাকার পর হিন্দি শিক্ষকরূপে উক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। পরে কলকাতায় হিন্দি শিক্ষকরূপে চাকরি পাওয়ায় তিনি সেখানে চলে যান। তৎকালীন সুযোগবলে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈশ ক্লাসে দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে চার বছর নিয়মিত পড়াশোনা করেন। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় বসার ঠিক পূর্বে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বি.এড্ পড়াশোনার জন্য তাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইগ্রেশন নিতে হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাশ ফার্স্ট হন। কারণ সে বছর মাত্র দুজন প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতার বহুমুখী উচ্চতর বিদ্যালয় এ.এস. রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠে ইংরেজি ও তর্কবিদ্যার শিক্ষকরূপে মনোনীত হন। কয়েক বছর পরে মাতার শরীর ভেঙে পড়ায় নিজগ্রামের পাশে আরিট বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এই বিদ্যালয় থেকে তিনি বি.এড. পড়ার জন্য কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভরতি হন। কলেজে তিনি ক্লাসের সম্পাদক, সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদক, নাট্য পরিচালক এবং ম্যাগাজিন সম্পাদকের পদে মনোনীত হন। ফাদারের আদেশ অনুসারে তিনি সেন্ট জেভিয়ারের জীবনীর বাংলানাট্যরূপ দান করেন এবং নাটকটি কলেজের বি.এড. ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে কলেজের নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। কলেজের ম্যাগাজিনে তাঁর 'Under One Roof' নামে একটি 'Short Story' প্রকাশিত হয়। পরে ওই গল্পটির বঙ্গানুবাদ মেদিনীপুর জেলার এক পত্রিকায় 'এক আকাশের তলে' নামে প্রকাশিত হয়। সেবছর পশ্চিমবঙ্গের বি.এড. কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। ওই প্রতিযোগিতায় ভবানী রায় চৌধুরীর 'Building a Better World' রচনাটি প্রথম স্থান অধিকার করে।

শিক্ষক হিসেবে ভবানীপ্রসাদ বিশেষ খ্যাতি এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁর হাতে গড়া বহু ছাত্রছাত্রী জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অনেকে যোগ্যতার বিচারে ভারতের বাইরেও প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ঘাটাল মহকুমার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'খেপুত তরুণ সংঘে'র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নাট্যশিল্পী, নাট্যকার হিসেবে তিনি ব্লক ও মহকুমা স্তরে কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি নির্দেশে গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় এবং এই বাহিনীর মনোনীত সদস্য হিসাবে ভবানীপ্রসাদ সোনাখালিতে সরকারি

তত্ত্বাবধানে ১৫ দিনের ট্রেনিং গ্রহণ করেন। এই ট্রেনিং-এর ভিত্তিতে ইউনিয়ন বোর্ডের অবলুপ্তি ঘটিয়ে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার কালে তিনি গ্রামের উত্তরবাড় মৌজার পাড়া বা মহল্লা ভাগ করার দায়িত্ব পান। সেই সময় তিনি উত্তরবাড় মৌজার নিজেদের পাড়ার 'রায়চৌধুরী পাড়া' নামকরণ করেন,—যা সরকারি গেজেটে স্বীকৃত এবং এখনও ওই নামেই রাজনৈতিক নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে পাড়ার পরিচিতি নির্ণীত হয়ে আসছে। এই সময় গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচনে খেপুত রায় চৌধুরী বাড়ি থেকে গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য পদে রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধি হন। এরপর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভবানী প্রসাদ সাবর্ণ বাড়ির দ্বিতীয় জনপ্রতিনিধি রূপে ব্লক স্তরে নির্বাচিত হয়ে পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হন। ১৯৭৮ এর প্রবল বিধ্বংসী বন্যায় নিম্ন দাসপুরের হাজা মৌজায় ১৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৫টিরও বেশি জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হয়। তিনি সরকারি অনুদান এবং ইউনিসেফ, কাসা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক সংস্থার অর্থসাহায্যে সেই বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলির পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হন। সেই সঙ্গে বহু সংঘ এবং পাঠাগারের উন্নয়ন কার্যেও হস্তক্ষেপ করেন। এর পরের নির্বাচনে ভবানীপ্রসাদ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান পদে নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন।

ভবানীপ্রসাদ গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও বিশেষভাবে বিড়জিত ছিলেন। গ্রামের ও আশপাশের বিদ্যালয়গুলির কার্যনির্বাহ সমিতির তিনি সভাপতি বা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রামের পাঠাগার, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সর্বদাই যুক্ত থাকতেন।

সাহিত্যচর্চা ভবানীপ্রসাদের প্রধান 'হবি'। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছোটো গল্প "কালো মেয়ে" প্রকাশিত হয় খড়্গপুরের 'বর্তিকা' পত্রিকায়। এ পর্যন্ত দেড়শোর বেশি তাঁর গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'জপমালা' ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন 'যুগান্তর' পত্রিকায় গ্রন্থটি বিশেষ প্রশংসিত হয়। এই গ্রন্থটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, তমলুক হ্যামিল্টন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালোবরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ১৫/১৬ জন প্রখ্যাত এবং গুণী ব্যক্তি উচ্চ প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেন। সেই প্রশংসাপত্রগুলি পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রিত হয়।

ভবানী রায় চৌধুরীর বেশ কয়েকটি সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বর্তমান, আজকাল, আনন্দবাজার পত্রিকাতেও ফিচার লিখেছেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার সাহিত্যিক হিসেবে কয়েকটি মানপত্রও লাভ করেছেন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বঙ্গ ভঙ্গ শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক তিনি বিশিষ্ট গল্পকার হিসেবে মানপত্র পান।

প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে আসছেন। তাঁর পুস্তকগুলি ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

খেপুত সাবর্ণ রায় চৌধুরী বাড়ির কাজ তিনি হাতেকলমে শ্রদ্ধেয় নবনীলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শেখেন। তিনি সততা এবং বিচক্ষণতার সহিত পরিবারের সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। বার্ধক্যহেতু তিনি অপারগ হলে তাঁর পরামর্শমতো পরিবারের কাজকর্ম ভবানী প্রসাদ নির্বাহ্ করতেন। পরে ভবানী প্রসাদ পরিবারের সম্পাদক পদে মনোনীত হন এবং দীর্ঘদিন পরিবারের সম্পাদক, সহসভাপতি এবং সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। তিনি গঠনমূলক কর্মী হিসেবে বিশেষ পরিচিত। তাঁর আমলে পরিবারের কয়েকটি উন্নয়নমূলক কার্য সমাধা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের বিধ্বংসী বন্যায় মাটির ঠাকুরঘর, ভাঁড়ার ঘর, ভোগঘর প্রভৃতি পারিবারিক গৃহগুলি ভূমিস্যাৎ হয়ে গেলে সেগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রত্যেক সদস্য সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ভবানীপ্রসাদের বিশেষ তদারকিতে সে সব পুনর্নির্মাণের কাজ সমাধা হয়।

ভবানীপ্রসাদ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি পুত্রদের সহিত তাঁদের কেনা বাড়িতে বড়িশায় থাকেন। তবে বাড়ির কার্যে মাঝে মধ্যে অবশ্যই খেপুতে যান। ভবানীপ্রসাদ বড়িশার পরিবার পরিষদের অন্যতম সহ্-সভাপতি পদে সম্প্রতি মনোনীত হয়েছেন।

ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ শৈলজানন্দ এবং রঘুনাথানন্দ।

শৈলজানন্দ রায় চৌধুরী প্রথম থেকেই মেধাবী ছাত্র। প্রথম বিভাগে লেটার মার্কসসহ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি.এসসি অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এম.এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বি.এসসি পড়ার সময় ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে সে বছর All India Science Congress কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। শৈলজানন্দ উক্ত কলেজের পক্ষ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর নাম উক্ত কংগ্রেসের পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হয়। শিক্ষা গ্রহণের পর শৈলজানন্দ প্রথমে কয়েক বছর ফার্মে টেকনিক্যাল একজিকিউটিভ পদে চাকরি করেন এবং আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে চাকরির প্রয়োজনে যান। বর্তমানে তিনি পিতা-পিতামহের ধারায় শিক্ষকতার পথ বেছে নেন এবং প্রখ্যাত আকাশ ইনস্টিটিউটের মেডিক্যাল এন্ট্রান্স কোর্সের কেমেস্ট্রি ফাকাল্টির লেকচারার পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি বর্তমানে বড়িশায় বসবাস করছেন।

শৈলজানন্দের পত্নী কুহু রায় চৌধুরী বি.এ. অনার্স। তিনি বরাবর মেধাবী ছাত্রী। সরকারি স্টাইপেন্ডে তিনি ধাতৃবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হসপিট্যালে কর্মরতা।

ভবানীপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ রঘুনাথানন্দ রায় চৌধুরী হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ থেকে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি এই কলেজের ছাত্র সংগঠনের সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। AMIE কোর্সে কিছুদিন পড়াশোনার পর তিনি "নিট", "সি.এম.সি" সংস্থার পাঠক্রম অনুসারে কম্পিউটর টেকনোলজির হার্ডওয়্যার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সম্পূর্ণ করেন। বর্তমানে তিনি একটি বিশিষ্ট বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। বর্তমানে তিনিও বড়িশা বাড়িতে বসবাস করছেন।

কালীপদ রায় চৌধুরীর একটিমাত্র পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী কোলাঘাটে ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি খেপুতবাড়িতেই ছেলেদের সংসারে সানন্দে দিনাতিপাত করছেন। তিনি নিরহংকার এবং পরোপকারী মানুষ। অন্যের আপদে-বিপদে এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করাই তাঁর এখন প্রধান কাজ। পরিবারের যাবতীয় কার্যে তিনি সাধ্যমতো সহযোগিতা অবশ্যই করেন। কালীপূজার সময় কয়েকবছর কর্তৃত্বও করেছেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের প্রবল বন্যায় সাবেক মাটির ঠাকুরঘর ভূমিস্যাৎ হয়ে গেলে পরিবারের সকল সদস্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু পরবর্তী বৎসর কালীপূজার মধ্যেই মন্দিরটির নির্মাণকার্য সমাধা করার জন্য কিছু অর্থ এবং সামগ্রীর সাময়িকভাবে অকুলান পড়লে জয়কৃষ্ণ কোলাঘাটে তাঁর পরিচিত হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ীর নিকট ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর অনুরোধে লোহার রড প্রভৃতি জিনিসগুলি নিজ দায়িত্বে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে দেন। এতে মন্দিরটি সময়মতো নির্মাণ করা সম্ভব হয়। কালীপূজার সময় সকল সদস্য উপস্থিত হলে অর্থ সংগৃহীত হয় এবং কালীপূজার পরদিনই পরিবারের সততা এবং সুনাম রক্ষার্থে জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরীর মাধ্যমে উক্ত ব্যবসায়ীর বকেয়া অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী বর্তমানে খেপুতবাড়ির সহ-গোষ্ঠীপতি।

জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরীর তিন পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ রামপ্রসাদ, মানবেন্দ্র এবং মৃত্যুঞ্জয়।

রামপ্রসাদ এবং মৃত্যুঞ্জয় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। মধ্যম পুত্র মানবেন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারের নৌবিভাগের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি চাকরির প্রয়োজনে জলপথে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বন্দরে ও শহরে ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন।

এঁরা তিন ভাই-ই খেপুতবাড়িতে একত্রে বসবাস করেন। এঁদের পিতৃমাতৃ ভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রেম উল্লেখযোগ্য।

মদনমোহন রায় চৌধুরীর তিন পুত্র—চৌত্রিশতম পুরুষ জগবন্ধু, চন্দ্রশেখর এবং নন্দলাল।

জ্যেষ্ঠপুত্র জগবন্ধু রায় চৌধুরী পিতার মতো আজীবন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ছাত্রসমাজে তিনি অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নির্বিবাদী,

শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি কয়েক বছর পরিবারের কালীপূজার কর্তৃত্ব সততা এবং মিতব্যয়িতার সহিত সম্পন্ন করেন। তিনি কর্তব্যকর্মে সর্বদা সজাগ ছিলেন। বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ হওয়ার তিনি পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হন। তাঁর পিতৃভক্তি প্রশংসাযোগ্য। জগবন্ধু কর্মরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

জগবন্ধু রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—পয়ঁত্রিশতম পুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ এবং শিবনারায়ণ।

জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। পিতা জগবন্ধু কর্মরত অবস্থায় পরলোকগমন করলে লক্ষ্মীনারায়ণ সরকারি নিয়ম অনুসারে পিতার পরিবর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি পান। বর্তমানে লক্ষ্মীনারায়ণ চাকরির প্রয়োজনে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এলাকায় সপরিবারে বসবাস করছেন।

কনিষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ রায় চৌধুরী গ্রামে নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। বিধবা মাতা তাঁর নিকটেই থাকেন, শিবনারায়ণের মাতৃভক্তি প্রশংসার দাবি রাখে।

মদনমোহনের মধ্যম পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ চন্দ্রশেখর প্রথম জীবনে বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন। তিনি পরিশ্রমী এবং কর্মযোগী পুরুষ। কর্মের প্রতি অনুরাগ এবং অধ্যবসায়ের ফলে তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় চাকরি পান। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত। গঠনমূলক কর্মে বরাবর তিনি উৎসাহী। পরিবারের কালীপূজার যাবতীয় কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। যতদিন শারীরিক সুস্থ ছিলেন, ততদিন কালীপূজার ভাঁড়ার ঘর থেকে মন্দিরের পূজার সামগ্রী পর্যন্ত তিনি প্রত্যেকটি কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন এবং নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন।

চন্দ্রশেখর রায় চৌধুরীর চার পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ সত্যনারায়ণ. দিলীপ, অনুপ এবং শ্যামল।

সত্যনারায়ণ রায় চৌধুরী পিতার মতো কর্মী মানুষ। কালীপূজার এবং পরিবারের সমস্ত কর্মে তিনি আন্তরিকভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকলেও পরিবারের কাজকর্মের দায়িত্ব তিনি অবশ্যই পালন করেন। তিনি সততার সঙ্গে সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন।

দ্বিতীয় পুত্র দিলীপকুমার রায় চৌধুরী কলকাতায় নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তিনি মাঝেমধ্যে খেপুতের বাড়িতে যান।

তৃতীয় এবং চতুর্থ পুত্র যথাক্রমে অনুপকুমার রায় চৌধুরী এবং শ্যামল কুমার রায় চৌধুরী গ্রামেই নিজ ব্যবসায়ে যুক্ত আছেন। তাঁরা উভয়েই পরিবারের সমস্ত রকম কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করেন এবং কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অনুপকুমার বি.এ পাস (অনার্স সহ) করেন। অনুপকুমার বর্তমানে গোষ্ঠীর সহ-সম্পাদক।

মদনমোহন রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র চৌত্রিশতম পুরুষ নন্দলাল শান্তস্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি খড়্গাপুরে ব্যাবসাকর্মে লিপ্ত ছিলেন। তিনি অতি ভক্তিপরায়ণ, নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পরলোকগত হয়েছেন। কালীপূজার সময় তিনি সোনার এবং রুপোর অলংকার দেবীর মূর্তিতে অতি যত্নসহকারে সাজাতেন। বিসর্জনের পূর্বে সেগুলি পুনরায় খুলে ফর্দ মিলিয়ে বাক্সে গচ্ছিত করে রাখতেন। ছাত্রজীবনে তিনি এলাকার নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। মহকুমা এবং জেলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকবার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান।

নন্দলালের দুই পুত্র—পঁয়ত্রিশতম পুরুষ প্রদীপকুমার এবং প্রবীরকুমার।

জ্যেষ্ঠ প্রদীপ কুমার গ্রামে ব্যবসায়ে লিপ্ত। ব্যবসার কর্ম এবং পরিচালনা ব্যতীত তিনি সমগ্র পরিবারের কাজকর্ম দেখাশোনা করা এবং তদারকি করা থেকে কখনোই বিরত নন। রায় চৌধুরী পরিবারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সমস্যা তিনি অবশ্যই আন্তরিকতার সঙ্গে সমাধান করেন। তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম উল্লেখযোগ্য।

কনিষ্ঠ প্রবীরকুমারও গ্রামে ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। উভয় ভ্রাতাই একযোগে ব্যাবসা দেখাশোনা করেন। উভয় ভ্রাতাই একই সংসারে বসবাস করেন।

মদনমোহন রায় চৌধুরী গোয়ালপোতায় যে বাসগৃহ নির্মাণ করে গেছলেন বর্তমানে তাঁর বংশধরগণ সেই গোয়ালপোতার বাস্তুতেই পৃথক পৃথক বাসগৃহ নির্মাণ করে বসবাস করছেন।

আর কয়েকটি কথা

খেপুত বাড়িতে বর্তমানে লোকসংখ্যা চারশোর বেশি এবং পরিবারের সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু খেপুতে স্থায়ীভাবে বর্তমানে বাস করেন মাত্র কুড়িটির মতো পরিবার এবং এই পরিবারগুলির লোকসংখ্যা প্রায় একশো। তবে অনুষ্ঠানে এবং কালীপূজায় প্রত্যেক পরিবার এবং বংশধর খেপুতবাড়িতে উপস্থিত হন। জীবনজীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা কলকাতা এবং অন্যত্র বসবাস করলেও তাঁদের নিজ-নিজ বৈষয়িক কারণে তাঁরা মাঝে-মধ্যে খেপুতের বাড়িতে আসেন।

খেপুতবাড়ির মাঠের জমিজায়গার পরিমাণ হ্রাস পেলেও ৭৪ বিঘা যে ভদ্রাসন আছে—তা আজও অক্ষুণ্ণ। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার উক্ত ভদ্রাসন এবং বাস্তুর ভূমিসংক্রান্ত কোনো বিবাদ সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশধরগণের মধ্যে নেই। তাঁদের এই সদ্ভাব এবং সহমিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে উল্লেখ করেছি—খেপুতবাড়িতে ভদ্রাসনের অংশ মূলত তিন প্রকার—উত্তরের বাড়ির এজমাল, দক্ষিণের বাড়ির এজমাল এবং সর্ব এজমাল অর্থাৎ উভয় বাড়ির যৌথ

সম্পত্তি। উভয় বাড়ির যৌথ সম্পত্তির আয় মূলত সরকারি ফান্ডে অর্থাৎ কালীপূজার ফান্ডে জমা থাকে। ফান্ডের ওই টাকা কালীপূজা এবং উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ব্যয়িত হয়। অবশ্য বংশধরগণও সাধ্যমতো আর্থিক চাঁদা দেন—যেটাকে যুবক ফান্ডের চাঁদা বলা হয়। উভয় বাড়ির যৌথ সম্পত্তির আয়ের মধ্যে ইশারা পুষ্করিণীর বার্ষিক জমার টাকা, বাঁশ প্রভৃতি গাছপালা এবং তার ফল ইত্যাদি বিক্রির টাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীমাতার আরেকটি আয় আছে। কুকুর এবং শিয়াল কামড়ালে মানুষ মায়ের স্বপ্নপ্রদত্ত ঔষধ এবং মন্ত্রে নিরাময় হন এবং তাঁরা কালীমাতার মন্দিরে পূজা দেন। এ পর্যন্ত এই চিকিৎসার কোনো কুফলের সংবাদ পাওয়া যায়নি। অবশ্য বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে এই আয় ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে।

বার্ষিক কালীপূজা ব্যতীত বাস্তুদেবতা শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ আছেন। আছেন লক্ষ্মী এবং মঙ্গলচণ্ডীর কৌটা। নিত্য এই দেবতাগুলির পূজা হয়। নিত্য অন্নভোগ এবং সন্ধ্যারতির বিধি আছে। প্রত্যেক শরিক তাঁদের নিজ নিজ বাড়ির বেড়বাগানের অংশমতো বাস্তু দেবতার সেবা এবং ভোগ প্রদান কার্য নির্বাহ করেন। এই কর্মটিকে 'ঠাকুরপালা' বলা হয়। ঠাকুর পালা উত্তরের বাড়ির ছ-মাস এবং দক্ষিণের বাড়ির ছ-মাস। তবে কোনো বাড়ির একটানা ছ মাস নয়। এক মাস উত্তরের বাড়ির, পরের মাস দক্ষিণের বাড়ির। যেসব শরিক অন্যত্র বসবাস করছেন তাঁদের ঠাকুরপালা আছে এবং তাঁরা তা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নির্বাহ করেন।

কালীমাতার নিত্যভোগের বিধি নেই। তবে কেউ মানসিক করে দেবীকে অবশ্যই আমিষ ভোগ দিতে পারেন,—শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর দিন কালীমাতার তৃণমূর্তির শ্রীচরণে মৃত্তিকা লেপন করা হয়। ওইদিন থেকে কালীপূজার দিন পর্যন্ত দেবীর অবশ্যই আমিষ ভোগ নিবেদন করার অনিবার্য রীতি আছে।

খেপুতবাড়ির বংশধরগণ যে যেখানেই থাকুন না কেন জন্ম অথবা মৃত অশৌচ তাঁরা অবশ্যই পালন করেন। এই রীতি খেপুতবাড়িতে এখনও অনিবার্যভাবেই চালু আছে।

খেপুত উত্তরবাড় মৌজায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার মাটির ঘরে বাস করতে করতেই চিতুয়া বা চেতুয়া পরগনার আংশিক জমিদারি গ্রহণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে ত্রিতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। নিম্ন দাসপুরের জলা এলাকায় মাটির হাঁটাপথ ব্যতীত তখন গোরুরগাড়ির পথও সর্বত্র ছিল না। ভরসা কেবল নদীপথ আর পালকি। এরকম প্রতিকূল পরিবেশেও সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ত্রিতল অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। ওই সময় দাসপুর এলাকার আর দ্বিতীয় ত্রিতল অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল কি না জানা নেই।

যে অখণ্ড ভদ্রাসনের মধ্যে খেপুত উত্তরবাড়বাড়ির প্রথম পুরুষ রামদুলাল রায় চৌধুরী বসবাস করেন—আজও তাঁর বংশধরগণ সেই ভদ্রাসন অখণ্ড রেখেছেন। অন্য কোনো বংশের বসবাস বা মালিকানা অখণ্ড ৭৪ বিঘা ভদ্রাসনের মধ্যে নেই। এটা একটা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। ভদ্রাসনের মধ্যস্থলে অর্থাৎ আটচালার পশ্চিমদিকে সুপারি গাছের বাগান রচিত হয়েছিল। সুপারির অপর নাম গুয়া। সেই বাগানে বর্তমানে সুপারি গাছ নেই। কিন্তু আজও বাগানটি গুয়া বাগান নামে পরিচিত।

রামদুলাল শ্রীরঘুনাথ জীউ নামক নারায়ণ শিলা এবং লক্ষ্মী ও মঙ্গলচণ্ডীর কৌটা মাটির ঘরে রেখে তাদের পূজার্চনা শুরু করেছিলেন—সেটিকে মন্দির বা দেবালয় বলা চলে না। এতদঞ্চলের ভাষামতো সেই দেবগৃহকে ঠাকুরঘর বলা হত। বর্তমানে বাস্তুর পশ্চিমদিকে সেই ঠাকুর ঘর মন্দিরে পরিণত হয়েছে।

মন্দিরের মধ্যস্থলে ম্যারাপে কালীমাতার তৃণমূর্তি ডাকিনী-যোগিনী ও শিবাসহ সারাবছর অবস্থান করেন। খেপুত-উত্তরবাড়বাড়িতে শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা শুরু হয় সম্ভবত ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে খেপুত-উত্তরবাড়বাড়ির সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারে এই কালীপূজা ২০৮ বছর পূর্ণ করল। এই কালীমাতার রূপ কালীঘাটের কালীমাতার রূপের আদলে নির্মিত হয়। বৈষ্ণবী রূপ। দিঘল ত্রিনয়ন। কালীকে কালো দেখায় তিনি বহু দূরে তাই। তাঁকে ধ্যানে-জ্ঞানে জানতে পারলে তিনি কালো নয়—আলোময়। তাঁর জ্যোতিতে চোখ ঝলসে যায়। যিনি কালের সঙ্গে রমণ করেন তিনিই কালী। কালীই ব্রহ্ম। কালীর বিভিন্ন রূপ। শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী, শ্যামাকালী। —শ্যামাকালীর কোমল ভাব। তিনি বরাভয়দায়িণী। গৃহস্থবাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। খেপুত-উত্তরবাড়ের বাড়িতে এই শ্যামাকালীরই পূজা হয়।

পূজার পরদিন বংশধরগণ স্তব মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রতিমা প্রদক্ষিণ করেন। তারপর অনুষ্ঠিত হয় নিরঞ্জন পূজা। নিরঞ্জন পূজার পর একটি বড়ো বারকোশের ওপর (কাঠের বড়ো থালাবিশেষ) নির্মাল্য সাজানো হয়। নির্মাল্যে থাকে দেবীর গলার ধাতৃমালা, রঙ্গনফুলের মালা, মাথার অর্ঘ্য। এগুলি বারকোশের মধ্যস্থলে গোল করে সাজিয়ে রেখে তার মাঝখানে জ্বলন্ত জাগ প্রদীপ রাখা হয়। "নমো নির্মাল্যবাসিনৈ নমঃ" বলে পূজা করা হয়। তারপর পূজক সেটি মাথায় করে দক্ষিণের বাড়ির সাবেকের সেই জমিদারি আমলের অট্টালিকার নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আসেন। মাথায় করে নির্মাল্য নিয়ে যাওয়ার সময় পথে প্রথমে একজন গঙ্গাজল দেন। তারপর পূজক মাথায় নির্মাল্য নিয়ে ধীরে ধীরে সাবধানে চলেন। সঙ্গে থাকে চামর, কাঁসর-ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনি আর বাজনা-বাদ্য। যথাস্থানে নির্মাল্য রক্ষিত হওয়ার পর পরস্পর প্রণাম এবং আলিঙ্গন বিনিময় করেন। পুরোহিতমশায়ও সঙ্গে যান। তাঁকে সর্বাগ্রে প্রণাম করার বিধি। সেই

সঙ্গে আগামী বছর আবার নির্দিষ্ট তিথিতে শ্রীশ্রীকালীমাতার আগমনের আহ্বান ও প্রার্থনা করে মাকে প্রত্যেক বংশধর স্মরণ করেন, বলেন—'আবার এসো মা'।

বর্তমানে গোষ্ঠীর সমস্ত কিছু পরিচালনা করার জন্যে একটি 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী গোষ্ঠী সংসদ'' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সংস্থা কালীপূজার সময় সাধারণ সভা আহ্বান করেন এবং সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন। এই সময় সমস্ত সমস্যার সমাধানের বিষয়গুলিও আলোচিত হয়। কোনো উন্নয়নমূলক কার্য থাকলে তা রূপায়ণের জন্য সংস্থা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিশেষ প্রয়োজনে বৎসরের অন্যান্য সময়েও সভা আহ্বান করা হয়।

শ্রীশ্রীকালীমাতার নামে কোনো দেবোত্তর সম্পত্তি নেই। তবে ভক্তগণ দেবীর কাছে মানসিক করে সফল হলে পূজা দেন। মহিলাগণ কালিকাব্রত গ্রহণ করে উদ্‌যাপনের সময় ছাগ মানসিক করেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজার সময় ব্যতীত অন্য সময় দেবীর নিকট ছাগ বা কোনোকিছু বলি দেওয়ার বিধি নেই। বার্ষিক পূজার সময় ছাগ এমনকি মেষ ও মহিষও কোনো কোনো বৎসর বলি হয়।

রামদুলাল রায়চৌধুরী কালীপূজার প্রবর্তন করার পর তাঁর কয়েকটি মৌজার জমিদারি বৃদ্ধি পেয়েছিলেন। ফলে তিনি দেবীকে অতি ভক্তিসহকারে পূজা করতেন। তাঁর বংশধরগণ অদ্যাবধি সেই রীতি অনুসরণ করে আসছেন। দেবীও সাবর্ণ বংশধরগণের প্রতি সদা বরদায়িনী রূপে মন্দিরে বিরাজ করছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় এক বছর এক রাতে ডাকাতদল জমিদারি বাড়ি লুঠ করার জন্য আসে। কিন্তু ডাকাত দলের প্রত্যেকেই চোখের জ্বালাযন্ত্রণায় 'গেলুম্‌রে-গেলুম্‌রে' বলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। শোনা যায়, ইষ্টদেবী কালীমাতাই ডাকাতদলের চোখে বালি বা অন্য কিছু নিক্ষেপ করায় তাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নি। সেই থেকে অদ্যাবধি খেপুত বাড়িতে কোনো চুরি বা ডাকাতি হয়নি। একবার দক্ষিণের বাড়ির একটি রান্নাঘরে আগুন লাগে। ওই রান্নাঘরের পাশেই ছিল উত্তরের বাড়ির তারাপদ রায় চৌধুরী খড়ের চালের দোতলা কোঠা বাড়ি। সেই ঘরে আগুন লাগে লাগে আর কি। অসহায় তারাপদ ঠাকুর ঘরে গিয়ে কালীমাতাকে চোখের জলে ডাকতে লাগলেন। আশ্চর্য বিষয় হঠাৎ প্রবল বাতাসে রান্নাঘরের আগুন নিভে গেল। সকলে মায়ের কৃপায় বিপদমুক্ত হলেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, একত্রিশতম পুরুষ থেকে খেপুত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের জমিদারি চলে যেতে শুরু হয়। কিন্তু যতদিন জমিদারি ছিল—তাঁরা প্রত্যেকেই প্রজাবৎসল ছিলেন। জোরজুলুম করে হাজা মৌজায় তাঁরা কখনোই রাজস্ব আদায় করেননি। অথবা কাউকে বরকন্দাজ দ্বারা বা আইনি শাসনে নির্যাতন করেননি। বংশধরগণ প্রজা ও প্রতিবেশীদের মধ্যে হৃদ্যতা এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। তাঁরা সুখে-দুঃখে জাতিবর্ণ

নির্বিশেষে রায় চৌধুরী পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নিজেদের মনে করতেন। আজও তাঁরা তা মনে করেন।

কালীপূজার সময়—এমনকি বাড়ির কোনো ব্যক্তিগত বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন অথবা শ্রাদ্ধাদির মতো শোকের অনুষ্ঠানেও তাঁরা টহলে হিসেবে সমস্ত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কর্তব্যবোধ এবং আন্তরিকতার প্রতি তাঁদের বরাবর আস্থা ছিল এবং এখনও আছে।

'সাবর্ণ রায় চৌধুরী গোষ্ঠীসংসদ' বর্তমানে খেপুতবাড়ির সমস্ত রকম কাজকর্ম এমনকি প্রতিবেশীদের প্রতি সৌহার্দ রক্ষা করা এবং গ্রাম্য কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বর্তমানে এই গোষ্ঠীসংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নরূপ—

গোষ্ঠীপতি	ঃ	শ্রী চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী
সহ-গোষ্ঠীপতি	ঃ	শ্রী জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী
সম্পাদক	ঃ	শ্রী শুভঙ্কর রায় চৌধুরী
সহ-সম্পাদক	ঃ	শ্রী অনুপকুমার রায় চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	শ্রী কমলেশ রায় চৌধুরী
হিসাব পরীক্ষক	ঃ	শ্রী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

পরিবারের প্রত্যেক সাবালক বংশধরই এই গোষ্ঠীসংসদের সদস্য।

একটা কথা উল্লেখ করতে হয়—রামদুলাল রায় চৌধুরী খেপুতবাড়ির জন্য হাওড়া জেলায় রূপনারায়ণ নদের পূর্ব-তীরে ভাটোয়া গ্রামে যে মুখোপাধ্যায় বংশকে কুল পুরোহিত রূপে নির্ণয় করে গেছলেন—আজও সেই পরিবার খেপুতবাড়ির কুলপুরোহিত আছেন।

কিন্তু খেপুতবাড়ির যে গুরুবংশ হাওড়া জেলার নারিট-গাজিপুর এলাকায় অবস্থিত ছিলেন তা বর্তমানে দীক্ষা প্রদান কার্যে বিরত থাকায় পরিবারের অনেকে ভিন্ন-ভিন্ন গুরুদেবের নিকট ইষ্টদেবী দক্ষিণাকালীর শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হতে বাধ্য হচ্ছেন।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের দীপ্তিমান ধর্মপুরুষ রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী প্রায় চারশো বছর পূর্বে যে আচরণবিধি, ধর্মবোধ, মনুষ্যত্ব এবং মানবপ্রীতির ভিত তৈরি করে দিয়ে গেছলেন—তাঁর বংশধরগণ যে-যেখানেই থাকুন আজও তা অনুসরণ করেছেন।

সাতাশতম পুরুষ থেকে বর্তমানে ছত্রিশতম পুরুষ পর্যন্ত দশ পুরুষ কাল খেপুত উত্তরবাড় মৌজায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণ সদাশয়তা, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা এবং অন্তরস্পর্শী আচরণের মাধ্যমে বংশের ঐতিহ্য আজও অম্লান রেখেছেন। আশাকরি ভবিষ্যতেও রাখবেন।

খেপুত-উত্তরবাড়
বংশতালিকা—৬
২৫। রায় কেশবরাম মজুমদার চৌধুরী
(১৬৫০-১৭২৬)
২৬। ৬ষ্ঠ পুত্র কুশল রায়চৌধুরী
(জন্ম ১৭১৭)
২৭। ১ম পুত্র রামদুলাল রায় চৌধুরী (খেপুত উত্তরবাড় বাড়ির ১ম পুরুষ
(১৭৩৯(?)-১৮২২)
(উত্তরের বাড়ি)
২৮। নিমানন্দ
(১৭৬০-১৮১১)
লক্ষ্মীনারায়ণ
(১৭৬৪-১৮৪০)
(দক্ষিণের বাড়ি)
২৯। ভক্তরাম
১৭৮৪-১৮৪৮)
রামচাঁদ
(১৭৮৬-১৮৬০)
(ক)
রামতনু
(১৭৮৯-১৮৪০)
(খ)
৩০। পার্বতী
১৮০৭-১৮৬২

৩০। পার্বতী (১৮০৭-১৮৬২)
৩১। পীতাম্বর (১৮৩২-৯০)
যদুনাথ (০-১৮৫০)
ত্রৈলোক্য (১৮৪০-১৮৮৪)
রাজকৃষ্ণ (১৮৪৪-১৮৯৫)
৩২। বৈকুণ্ঠ (১৮৫৯-১৯১৫)
৩৩। হরিহর ১৮৮০-১৯৫২)
(গ)
হারাণচন্দ্র (১৮৬০-১৯২০)
৩৩। যতীন্দ্র (১৮৮৩-১৯৩৭)
(ঘ)
কালীপদ (১৮৮৫-১৯৭২)
(ঙ)
মদন (১৮৯৫-১৯৬৮)
(চ)
সুধীর
০
বিধু (১৮৫৬-১৯০৬)
শশী (১৮৯৬-০)
চাঁদপুর
৩৩। নবনী (১৮৯৬-১৯৬৭)
(ছ)
নিকুঞ্জ (১৯০৫-১৯৭৮)
(জ)
প্রবোধ (১৯১২-১৯৯৪)
(ঝ)
৩২। তারাপদ (১৮৭২-১৯২৭)
হরিপদ (১৮৭৯-০)
রামপদ
বিষ্ণুপদ (১৮৮৭-১৯৩০)
৩৩। পঞ্চানন (১৯২০-৯৯)
(ঞ)
দুলাল চন্দ্র (১৯২৮-৬৭
(ট)

(ক) ২৯। রামচাঁদ (১৭৮৬-১৮৬০)
৩০। মহেশ (১৮১৬-৩৮)
ত্রিলোচন (১৮২২-৮৪)
৩১। দেবেন্দ্র (১৮৪৪-০)
সুরেন্দ্র (১৮৬০-১৯১২)
৩২। ফটিক (১৯০৯-৮৪)
৩৩। কেশব (১৯৩৭)
অশোক (১৯৫২)
অলক (১৯৫৮)
অয়ন (১৯৯২)
গুরুদাস (১৯৬৯)
চন্ডীদাস (১৯৭৫)
কৌশিক (১৯৮২)
মৌমিতা (১৯৯১)
সৌমী (১৯৯৯)
(গ) ৩৩। হরিহর (১৮৮০-১৯৫২)
৩৪। দুঃখীরাম
সুকুমার (১৯১৯)
গণেশ (১৯২৬)
শিশির
অজিত (১৯৩৭)
৩৫। অনিমেষ (১৯৭৩
৩৫। তপন (১৯৪৬)
তাপস (১৯৫৪)
৩৬। সর্বদীপ (১৯৯০)
৩৫। অসিত (১৯৫৮)
স্বপন (১৯৬০)
অরুণ (১৯৬২)
৩৬। ইপ্সিতা (১৯৮৮)
৩৬। সিদ্ধার্থ (১৯৯৯)
(খ) ২৯। রামতনু (১৭৮৯-১৮৪০)
৩০। যজ্ঞেশ্বর (১৮১৪-০)
৩১ আশু (১৮৩৫-০)
মহেন্দ্র (১৮৩৯-০)
০
০

(ঘ) ৩৩। যতীন্দ্র (১৮৮৩-১৯৩৭)
৩৪। ভবানী (১৯৩৪)
৩৫। শৈলজানন্দ (১৯৬৮)
রঘুনাথনন্দ (১৯৭৪
৩৬। সন্নিধ (১৯৯৮)
অভীষ্ট (২০০৩
(ঙ) ৩৩। কালীপদ (১৮৮৫-১৯৭২)
৩৪। জয়কৃষ্ণ (১৯৩৭)
৩৫। রামপ্রসাদ (১৯৬০)
মানবেন্দ্র (১৯৬৫)
মৃত্যুঞ্জয় (১৯৭১
৩৬। দেবব্রত (১৯৯৬)
অঙ্কন (২০০০)
সায়ন (২০০৩)
(চ) ৩৩। মদনমোহন (১৮৯৫-১৯৬৮)
৩৪। জগবন্ধু
চন্দ্রশেখর
নন্দলাল
৩৫। লক্ষ্মীনারায়ণ (১৯৫৫)
শিবনারায়ণ (১৯৫৮)
৩৬। শান্তনু (১৯৯৬)
৩৬। বিশ্বজিৎ (১৯৮০)
অভিজিৎ (১৯৮৫)
৩৫। সত্যনারায়ণ (১৯৫৯)
৩৬। কল্যাণ (২০০৪)
দিলীপ (১৯৬৫)
অনুপ (১৯৭৩)
শ্যামল (১৯৭৬)
(জ) ৩৩। নিকুঞ্জবিহারী (১৯০৫-১৯৭৮)
৩৪। মনোরঞ্জন (১৯৫২)
জীবনরঞ্জন (১৯৫৮)
সত্যরঞ্জন (১৯৬০)
৩৫। সর্বাণী (১৯৮৫)
মলয় (১৯৮৯-২০০৪)
৩৫। অর্কজ্যোতি (১৯৯৮)
কিশলয়
৩৫। প্রদীপ (১৯৬৭)
প্রবীর (১৯৭৪)
৩৬। প্রীতম (২০০৪)

(ছ) ৩৩। নবনীলাল (১৮৯৬-১৯৬৭)
৩৪। কার্তিক (১৯২৬)
অক্ষয় (১৯৩১)
চিত্তরঞ্জন (১৯৩৫)
৩৫। পঙ্কজকুমার (১৯৫১)
প্রণব (১৯৫৩)
প্রকাশ (১৯৫৭)
প্রভাত (১৯৬০)
৩৫। প্রতাপ (১৯৬৪)
৩৫। দেবজিৎ (১৯৬৫)
স্মরজিৎ (১৯৬৯)
৩৬। সুমন্ত (১৯৮৮)
প্রিয়া (১৯৯৩)
রীয়া (১৯৯৫)
৩৬। রানা (২০০১)
৩৬। ঋযিকা (১৯৯৮)
৩৬। স্বাগতালক্ষ্মী (২০০
(ঝ) ৩৩। প্রবোধকুমার (১৯১২-১৯৯৪)
৩৪। প্রশান্ত (১৫২)
সুশান্ত (১৯৬২)
৩৫। প্রসেনজিৎ (১৯৮৮)
আদিত্য (২০০০

(ঞ) ৩৩। পঞ্চানন (১৯২০-৯৯)
৩৪। আশুতোষ (১৯৫২)
ভবতোষ (১৯৫৫)
সন্তোষ (১৯৫৮)
৩৫। অর্ণব (১৯৮৫)
রাহুল (১৯৯০)
৩৫। চন্দন (১৯৯৩)
৩৫। হিমাদ্রি (২০০২)
(ট) ৩৩। দুলালচন্দ্র (১৯২৮-৬৭)
৩৪। পরিতোষ (১৯৬২)
৩৫। জুহি (২০০১)

(২) ২৮। লক্ষ্মীনারায়ণ (১৭৬০-১৮২৩)
দক্ষিণের বাড়ি
২৯। আনন্দপ্রসাদ (পদ্মলোচন)
(১৭৮৬-১৮৪৫)
৩০। গঙ্গাধর
(১৮০৮-৭০)
মুক্তারাম
(১৮১০-৮৩)
চুনীলাল (১)
(১৮১২-৮৪)
রামমোহন (২)
(১৮১৪-৮৬)
রাধামোহন
(১৮১৮-৭০) (৩)
৩১। রামচন্দ্র
(১৮৩০-৪০)
ঈশ্বরচন্দ্র
(১৮৩৬-৬০)
নবীনচন্দ্র
(১৮৪০-৬৫)
রামচন্দ্র
(১৮৪৫-১১)
কৃষ্ণচন্দ্র
(১৮৫৪-৭২)
৩১। গোকুল
(১৮৩১-৫০)
কাশীনাথ
(১৮৩৩-৬৩)
বিশ্বনাথ
(১৮৩৫-০)
৩২। ব্রজনাথ
(১৮৫৬-১৯০২)
প্রাণনাথ
(১৮৫৭-০)
প্রসন্ন
(১৮৬০-১৯১৯
কালীপদ
(১৮৬২-৮২)
উমেশ
(১৮৬৬-৯০)
৩৩। অখিল
(১৮৭৭-১৯১৫)
শিবকৃষ্ণ
(১৮৮০-০)
৩৩। নটবর
(১৮৭৬-১৯৫৮)
(৫)
শরৎচন্দ্র
(১৮৮৪-১৯১৬)
(৬)
৩৪। পশুপতি
৩৪। বঙ্কিম
(১৯১০-৮২)
(৭)

(১) চুনীলাল
(১৮১২-৮৪)
৩১। গুরুদাস
(১৮৩৩-০)
৩২। কাশীনাথ
(১৮৫৪-০)
৩৩। ভবতারণ
(১৮৭৫-১৯২৮)
অনুপমা (কন্যা)
রামধন
(১৮৩৫-০)
০
রামগোপাল
(১৮৪০-১৯০২)
৩২। শ্যামাপদ
(১৮৬২-১৯২২)
০
হরিনাথ
০
শ্রীনাথ
(১৮৪৭-৯৯)
৩২। কালীপ্রসন্ন (নারাণ)
(১৮৬৯-১৯২১)
৩৩। সতীশ
(১৮৮৫-০)
৩৪। বিভূতি
(১৯১৫-০)
(বারুইপুর)
যতীন
০
নগেন
(১৮৯২-১৯৬২)
(৪)
ধীরেন
০

(২) ৩০। রামমোহন
(১৮১৪-৮৬)
৩১। পোষ্যপুত্র
চুনীলালের ৫ম পুত্র শ্রীনাথ।
পরে নিজের পুত্র
উমাচরণ (পত্নী প্রসন্নময়ী)
(১৮৩৯-০)
০
(৩) ৩০। রাধামোহন (১৮১৮-৭০)
৩১। পূর্ণানন্দ
(১৮৪০-৮৯)
৩২। তিনকড়ি
(১৮৬০-০)
ফকির
(১৮৮১-০)
০
সর্বানন্দ
(১৮৪২-৬০)
০
ঈশান
(১৮৪৫-৬৫)
০
(৪) ৩৩। নগেন্দ্রনাথ
(১৮৯২-১৯৬২)
৩৪। শঙ্করজীবন
(১৮২৭-৮২)
শক্তিপদ
(১৯২৯)
দেবদাস (১৯৪২)
৩৫। সৈকত (১৯৭৮)
৩৫। শিখা
(১৯৫৩)
বুলবুল
(১৯৫৫)
রীতা
(১৯৫৮)
৩৫। দীপঙ্কর
শুভঙ্কর
১৯৫৬
ওঙ্কারনাথ
(১৯৫৮)
সোমনাথ
(১৯৬
অমরনাথ
(১৯৭০)

(৫) ৩৩। নটবর
(১৮৭৬-১৯৫৮)
৩৪। তারিণীচরণ
(১৯০২-৬৮)
রামকৃষ্ণ
(১৯১৭-৮০)
৩৫। কালীকিঙ্কর
(১৯৪২)
তারাকিঙ্কর
(১৯৪৮)
রমাকিঙ্কর
(১৯৫৫)
রবীন্দ্রনাথ
(১৯৫৫)
বেণুগোপাল
(১৯৫৯)
কমলেশ
(১৯৬৩)
সুমন (১৯৯২)
৩৬। সৌমেন
৩৬। সাগ্নিক
(১৯৯১)
৩৫। দেবীপ্রসাদ
(১৯৫২)
৩৬। সৌরদীপ
(১৯৯৫)
৩৬। সোমনাথ
(১৯৭১)
সুব্রত
(১৯৭৪)
দেবব্রত
(১৯৭৭)

(৬) ৩৩। শরৎচন্দ্র
(১৮৮৪-১৯১৬)
৩৪। তুলসীচরণ
(১৯১২-৮৫)
অনাদিচরণ
(১৯১৮-৯৩)
৩৫। শ্যামাপ্রসাদ
(১৯৫১)
৩৬। কৌশিকী
উমাপ্রসাদ
(১৯৫৪)
শীর্ষেন্দু
৩৫। অমল (১৯৪৮)
অয়ন (১৯৭৪)
অমিতাভ (১৯৫২
অর্ণব (১৯৮২)
(৭) ৩৪। বঙ্কিম
(১৯০১-৮২)
৩৫। বিকাশ
(১৯৩৪)
বিভাস
(১৯৪০)
বিনয়
(১৯৪৬)
নীলাদ্রি
(১৯৮৫)
৩৬। বিশ্বরূপ
(১৯৬০)
গৌতম
(১৯৭২)
বিশ্বজিৎ
(১৯৭২)
বিশ্বদীপ
(১৯৭৩)
কল্যাণ
(১৯৮২)

১। ঠাকুরমন্দির ২। আটচালা ৩। বলিদানের স্থান ৪। ভোগঘর ৫। ভাঁড়ারঘর
৬। ত্রিতল অট্টালিকা ৭। দক্ষিণের আড়ি ৮। উত্তরের বাড়ি ৯। উত্তরের খিড়কি পুকুর
১০। দক্ষিণের বাড়ির খিড়কি পুকুর ১১। সদর পুকুর ১২। গোয়ালপোতার বসত বাড়ি
১৩। গোলাবাড়ি ১৪। রামের পুকুর ১৫। নওবতখানা ১৬। ইশারা পুকুর

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণ শুধু বঙ্গদেশে কেন—সারা বিশ্বে বর্তমানে ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করছেন। তাঁরা সাবর্ণ গোত্রীয় মহর্ষি বেদগর্ভের নীতি ও ধর্মধারা অবলম্বন করে আপন-আপন জীবনচর্চা এবং কৃৎকৌশলের মাধ্যমে জীবনযাপনে নিযুক্ত। পরিবার বা গোষ্ঠীগত মাপকাঠিতে বেদগর্ভের অধস্তন বংশধরগণের সংখ্যা বড়িশাবাড়িতে অধিক। এখানে সাধক কামদেব এবং তাঁর সাধ্বী পত্নী পদ্মাবতীর সুযোগ্য সন্তান রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীর কর্ম ও কর্মধারার অনেক জীবন্ত সাক্ষ্য এখনও বর্তমান। বিশেষ করে তাঁর বংশধরগণের ধমনিতে লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরীর অমর জীবনকাহিনি আজও কথা বলে,—বংশধরগণের মনে সাড়া জাগায়, পবিত্র কর্মময় জীবনপথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

কিন্তু কীভাবে, কোন্ পথে তাঁরা এগিয়ে যাবেন বর্তমান রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন বাড়িতে বিভক্ত ভাঙা-ভাঙা জীবন ও মন নিয়ে সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হতে থাকে কয়েকজন প্রবীণ-নবীন অগ্রণী বংশধরের মাথায়। বিচ্ছিন্নতার পরিমাণ আর দূরত্ব না বাড়িয়ে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন। কোনো গঠনমূলক কাজ করতে হলে সর্বাগ্রে আবশ্যক ঐক্যবধ্যতা আর পারস্পরিক প্রীতি। ...... বিভেদ বা অনৈক্য নয়।

বড়িশার বিভিন্ন বাড়ির অগ্রণী চিন্তাশীল কর্মঠ কয়েকজন বংশধর কিছুদিন যাবৎ এরকম চিন্তায় ক্লান্ত-কাতর হয়ে অবশেষে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একমত হয়ে একটি পরিবার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৪০৪ বঙ্গাব্দে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বড়িশার বিভিন্ন বাড়ি থেকে এগিয়ে আসেন শ্রী গোরাচাঁদ রায় চৌধুরী, শ্রী কানুপ্রিয় রায় চৌধুরী, শ্রী রঞ্জন রায় চৌধুরী, স্বর্গত বেচু রায় চৌধুরী, কালীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, মৃগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন। অবশেষে তাঁরা 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ' নামক একটি গঠনমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই পরিবার পরিষদ মূলত সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারগুলির একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান।

সংগঠকগণ 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ'-এর কয়েকটি মূল উদ্দেশ্যও লিপিবদ্ধ করলেন। সেগুলি হল—

১। দূরদূরান্তে যেসব বংশ এবং বংশধর বসবাস করছেন তাঁদের নিয়ে পরিবারগত যোগসূত্রের মহিমায় গাঁথা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্পর্ক গড়ে তোলা।

২। বড়িশা, হালিশহর, নিমতা, বিরাটি, খেপুত, উত্তরপাড়া এবং অন্যান্য যেসব জায়গায় পরিবারের বংশধরগণ বসবাস করছেন এবং সেসব স্থানে জমিদারি আমলের মন্দির, পূজামণ্ডপ, দুর্গাদালান ইত্যাদি ঐতিহ্যময় যে নিদর্শন রয়েছে, সেগুলির সরাসরি সন্ধান করা এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া।

৩। পূর্বপুরুষগণের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত মন্দির ও স্থাপত্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের প্রথা, পূজাপদ্ধতি, রীতিনীতিগুলি আগামী প্রজন্মকে জানানো এবং শেখানো। সেই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে উক্ত বিষয়গুলির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করাও উদ্দেশ্য।

৫। পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং দুঃস্থদের সাহায্য করা।

৬। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুণীজনদের সম্মান প্রদর্শন করা।

৭। সর্বোপরি সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের সহিত জড়িত সঠিক ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরা। ইতিহাস সচেতনতা বাড়ানো এবং পরিবারের Antique (অতি পুরাতন) জিনিসপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ করা।

৮। বিভিন্ন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং ইতিহাসবিদদের সাহায্যে সর্বক্ষণ গবেষণার মাধ্যমে বংশের সঙ্গে বিজড়িত ইতিহাসের নতুন তথ্য আবিষ্কাব করা।

৯। উক্ত কাজগুলি ঠিকমতো সম্পাদন করার জন্য সাবর্ণ সংগ্রহশালা স্থাপন করা।

১০। বার্ষিক পত্র 'সাবর্ণবার্তা', ওয়েবসাইট এবং গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে পরিবারের ইতিহাস ও কথা মানুষের সামনে তুলে ধরা।

বলাবাহুল্য, 'সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ' ইতিমধ্যে তার অনেকগুলি উদ্দেশ্য পূরণের পথে এগিয়ে চলেছে এবং সাফল্য অর্জন করেছে।

বর্তমানে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদে উল্লিখিত সমস্ত স্থানের বংশধরগণের অনেকে সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এবং পরিষদের উদ্দেশ্য সফলের কাছে ব্রতী হয়েছেন।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের বর্তমান কার্যনিবাহী কমিটির সদস্যগণ ঃ

সভাপতি : শ্রী ফণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

কার্যকরী সভাপতি : শ্রী নির্মল রায় চৌধুরী।

সহ-সভাপতি : সর্বশ্রী মৃগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, রতিকান্ত রায় চৌধুরী, মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, সমর রায় চৌধুরী, সৌমেন রায় চৌধুরী, বলরাম রায় চৌধুরী, রঞ্জন রায় চৌধুরী, আলোক রায় চৌধুরী, সনাতন রায় চৌধুরী, গোরাচাঁদ রায় চৌধুরী, স্বপন রায় চৌধুরী, মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী, কণক রায় চৌধুরী, সুনীল রায় চৌধুরী, মনোজ রায়

চৌধুরী, ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, বারীণ রায় চৌধুরী, বিমল রায় চৌধুরী, শুভব্রত রায় চৌধুরী।

সাধারণ সম্পাদক : কানুপ্রিয় রায় চৌধুরী।

যুগ্ম সম্পাদকগণ : সর্বশ্রী শ্রীকুমার রায় চৌধুরী, দেবর্ষি রায় চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদকগণ : সর্বশ্রী মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী, প্রদীপ রায় চৌধুরী, মোহন রায় চৌধুরী, কল্যাণ রায় চৌধুরী, অমিতাভ রায় চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সুভাষ রায় চৌধুরী, কুমার কৃষ্ণ রায় চৌধুরী, বরুণ রায় চৌধুরী, শুভেন্দু রায় চৌধুরী, প্রসূণ রায় চৌধুরী, গার্গী রায় চৌধুরী।

আইন-সংক্রান্ত বিভাগ (Legal Shell) : শ্রী স্মরজিৎ রায় চৌধুরী।

সদস্যগণ : সর্বশ্রী হিতব্রত রায় চৌধুরী, প্রদীপ রায় চৌধুরী, জয়দীপ রায় চৌধুরী, তীর্থঙ্কর রায় চৌধুরী, ফাল্গুণী রায় চৌধুরী, সঞ্চিতা রায় চৌধুরী, শর্মিষ্ঠা রায় চৌধুরী, সুচরিতা রায় চৌধুরী, পাপিয়া রায় চৌধুরী, মিঠু রায় চৌধুরী, সঞ্চারী রায় চৌধুরী, অসীম রায় চৌধুরী, অম্বর রায় চৌধুরী।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের ঐতিহাসিক জয়

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ গঠিত হওয়ার পর এই পরিষদ যেসব কাজ করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলিকাতা উচ্চ আদালতের রায়ে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট কলিকাতা নগরের জন্ম তারিখকে অসত্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে নস্যাৎ করা।

জোব চার্নক কলিকাতার পদার্পণ করলেন—আর সেই সঙ্গেই কলিকাতার মতো এক মহানগরীর জন্ম সূচিত বা ঘোষিত হল—এরূপ মনে করার মধ্যে যে বাতুলতা তথা অসত্যপ্রিয়তা থাকতে পারে তা অতি অর্বাচীন ব্যক্তিগণেরও অনুমান করতে বিলম্ব হবে না। কোনো জীব বা প্রাণী অথবা কলকারখানার উৎপন্ন কোনো বস্তুসামগ্রীর বিশেষ ক্ষণে বা দিনে জন্ম চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু গ্রাম-শহর-নগর-পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী বিশেষ দিনে জন্মায় না। জন্মায় দিনেদিনে, কালে কালে যুগে যুগে। Rome was not built in a day—এ কথা কার অজানা? তবু কেন কলকাতার উৎসবপ্রেমিক জনগণ এতদিন একটা নিছক উৎসবের আকর্ষণে মিথ্যার লেজ ধরে ছুটছিলেন তা ভাবতেও অবাক হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকগণও ইংরেজপ্রেমে এতদিন সরকারি অর্থে ভ্রান্তিবিলাস করে এসেছেন। 'কলকাতা ছিল কলকাতাতেই'—একথা তাঁরা কষ্ট করে একটু ভাবলেই বুঝতে পারতেন।

এই অসত্যের অপমৃত্যু ঘটানোর জন্য অবশ্য বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিষদ ভূয়সী প্রশংসার দাবি করতে পারেন।

জলা-জঙ্গলাকীর্ণ নিম্ন বঙ্গ ক্রমশ সমতট বা সমতল ভূমিতে পরিণত হওয়ার প্রায় প্রথমাবস্থা থেকেই সাবর্ণ বংশধরগণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে জমি ভরাট করে বসতি, ব্যাবসা এবং চাষাবাদের প্রচলন করে এসেছেন। শেঠ-বসাক-মল্লিকগণের ব্যবসায়িক কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। সাবর্ণ বংশধরগণই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে হালিশহর, নিমতা, বিরাটি, দমদম, বরানগর, গোবিন্দপুর, কলিকাতা-সুতানুটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। দমদমের কাছাড়িবাড়ি, ডালহৌসিতে লালদিঘির পাড়ে কাছাড়িবাড়ি, লালদিঘির নামকরণ, বড়িশার কাছাড়িবাড়ি —কালীক্ষেত্র কালীঘাটের তথা কালীমাতার মহিমা প্রচার এবং ভক্তসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা,—হালদারদের পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ .... এসবই তো জোব চার্নকের জন্মের বহু পূর্ব থেকে ঘটে আসছে। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস পিপ্‌লাই তাঁর 'মনসামঙ্গল কাব্যে' কলিকাতার উল্লেখ করেছেন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থেও কলিকাতার অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জোব চার্নকের নাম আসে কীভাবে? তা ছাড়া জোব চার্নকের জামাতা চার্লস আয়ার ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে গোবিন্দপুর, কলিকাতা, সুতানুটির প্রজাস্বত্ত্ব ক্রয় করেন। জোব চার্নক এই ঘটনার পাঁচ বছর পূর্বে পারা রোগে পরলোক গত হয়েছিলেন।

ফলে দেখা যায়, ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট কলিকাতার স্বত্বাধিকারী সাবর্ণ চৌধুরীগণ। তাঁরাই এই অঞ্চলের সংগঠক এবং প্রশাসক। সুতরাং তাঁদের জমিদারির মধ্যেই জোব চার্নক কলিকাতা নগরের রাতারাতি জন্ম সূচনা করে ফেললেন বলে প্রমাদ গোনা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহা আনন্দ এবং গৌরবের বিষয়—এই ভুলটা প্রথম ধরতে পারলেন সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বংশধরগণ। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের উদ্যোগেই কলিকাতা উচ্চ আদালতে ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। এই জনস্বার্থ মামলায় গবেষক রাধারমণ রায়, ঐতিহাসিক সুধীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজীবী দীপক সেন, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সুবীর দত্ত, বড়িশা বিবেকানন্দ মহিলা কলেজের অধ্যাপিকাগণ—স্বপ্না রায়, সঞ্চিতা দত্ত, ছন্দা বসাক, উমা দেবী—মোট ৯ জন বুদ্ধিজীবী কলিকাতা উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করে জানতে চান কোন্ ঐতিহাসিক সত্যের ওপর ভিত্তি করে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্টকে কলিকাতার জন্মতারিখ ঘোষণা করা হয়—তা জনসাধারণকে জানানো হোক এবং এই বিকৃত ইতিহাস সংশোধন করে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা হোক।

তৎকালীন মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী অশোককুমার মাথুর এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রী গিরীশ গুপ্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের পক্ষে প্রখ্যাত আইনবিদ তৎকালীন সাংসদ মাননীয় শ্রী অজিত কুমার পাঁজা, আইনজীবী তথা খেপুত সাবর্ণ রায় চৌধুরীর বাড়ির সদস্য মাননীয় শ্রী স্মরজিৎ রায় চৌধুরী এবং উল্লিখিত নাগরিকবৃন্দের পক্ষে প্রখ্যাত আইনজীবী মাননীয় শ্রী ভাস্কর সেন সওয়াল করেন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তৎকালীন এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল জবাব দেন।

অবশেষে ২০০২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে কলিকাতা উচ্চ আদালত পাঁচজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন। ওই তদন্ত কমিটিতে ছিলেন—মাননীয় ড. নিমাই সাধন বসু, মাননীয় শ্রী বরুণ দে, মাননীয় শ্রী প্রদীপ সিন্‌হা, মাননীয় শ্রী সুশীল চৌধুরী এবং মাননীয় শ্রী অরুণ দাশগুপ্ত।

বিশেষ তদন্ত এবং অনুসন্ধান করে ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর উক্ত তদন্ত কমিটি যে প্রতিবেদন আদালতে পেশ করেন—সেই প্রতিবেদন ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী অশোককুমার মাথুর এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস আদালত কক্ষে উভয় পক্ষের জনসমক্ষে পড়ে শোনান—।

"In the final analysis, neigther Job Charnok can be regarded as the founder of Calcutta, nor the claim that Calcutta was born on 24th August, 1690. ....Its origin is a part of a general process of rural settlement, clusters of which agglomerated in the last decade of the 17th century, into the English Company's trading factory. This grew into the town in the 18th century ...."

এরপর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং কলিকাতা পৌরসভার সম্পূর্ণ সমর্থনে কলিকাতা উচ্চ আদালত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ এবং ৯ জন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে রায়দান করলেন। উক্ত তারিখটি কলিকাতার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল তারকা চিহ্নিত বিজয় দিবস হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে রইল।

এই ঐতিহাসিক জয়কে উপলক্ষ্য করে বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ একটি 'বিজয় উৎসব সভা' ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শেরিফ মাননীয় শ্রী প্রবীর রায় এবং ১২৬ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা মাননীয় শ্রী শ্যামাদাস রায় যোগদান করেন।

এই ঐতিহাসিক জয়কে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯টায় বিরাট সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বড়িশার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ব্যান্ডের সুরলহরী, অসংখ্য মহিলার শঙ্খধ্বনি জনপথকে বিহ্বল করে তোলে। এই বিজয় শোভাযাত্রার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল অস্টিন, মরিসসহ বেশ কয়েকটি ভিন্টেজ গাড়ি।

সন্ধ্যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত দ্বাদশ শিবমন্দির প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী কল্যাণময় গাঙ্গুলী, ইতিহাসবিদ্ এবং গবেষক মাননীয় রাধারমণ রায়। সভায় পৌরোহিত্য করেন তৎকালীন সাংসদ শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বিধায়ক শ্রী পরশ দত্ত। অনুষ্ঠান শেষে আতস বাজির রোশনাই এই 'ঐতিহাসিক জয়'কে রাতের আকাশ উজ্জ্বল করে জাহির করল। 'জয় সাবর্ণ' লেখা ফানুস আকাশ ভেদ করে ওপরের দিকে উঠতে থাকল।

উক্ত জনস্বার্থ মামলার কলিকাতা উচ্চ আদালতের কয়েকটি প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রতিলিপি পাঠকদের জন্য সংযুক্ত করা হল।

(2003)2 CAL LT 625 (HC)

Sabarna Roychowdhury Paribar Parishad .... Petitioner

Versus

The State of West Bengal & Ors. .... Respondents

Constitutional Writ Jurisdiction

(Original Side)

W.P. No. 1484 of 2001

Before : Ashok Kumar Mathur, CJ. and Jayanta Kumar Biswas, J.

Decided on May 16, 2003

Public Interest Litigation-Date of birth of the city of Calcutta-Court appointed an expert committee to go into the question-committee's report not objected to by the State Government and accepted by the Court.

The petitioner filed a public interest litigation raising two questions of historical importance, i.e., what is the date of birth of the city of Calcutta and whether Job Charnock was the founder of Calcutta. The Court constituted an expert committee submitted its report to the effect that Calcutta does not have a 'birthday' and its origin is part

of a general process of rural settlement, clusters of which agglomerated in the last decade of the 17th century into the English Company's trading factory. This grew into the town in the 18th century. No particular year marks its Calcutta's 'date of birth'. A copy of the expert committee's report was given to the State Government which accepted the findings of the expert committee.

Held

The Court accepts the expert committee's findings and directs the State to proceed in accordance with such findings. The Court directs that the expert committee's report shall be treated as a part of the judgment.

Appearances

❖ Mr. Ajit Panja, senior advocate, with Mr. Sarajit Roychowdhury, advocate for the Petitioners.

❖ Mr. Balai Roy, Advocate General and Mr. Aloke Ghosh for the respondents.

Dictated Order

A.K. Mathur, CJ, – This is a Public Interest Litigation whereby two questions of historical importance have been raised i.e. what is the date of birth of the City of Calcutta (now renamed as 'Kolkata') and whether 'Job Charnayak' was the founder of this city.

2. Since both these two questions raise a serious question of the history and the Court felt that it would not be proper for this Court to undertake this exercise, therefore, this Court by an order dated 12th April, 2002 appointed an expert committee to go into these questions. The order dated 12th April, 2002 reads as follows :

"The Court : By an order dated 5th April, 2002, a committee of the following persons was constituted to go into the question whether

Job Charnayak was a founder of Calcutta or not, what is the date of birth of Calcutta and who was the founder :-

1. Prof. Nemai Sadhan Bose,
2. Prof. Barun De,
3. Prof. Pradip Sinha,
4. Prof. Arun Kumar Dasgupta,
5. Prof. Sushil Chowdhury.

All the five professors were contacted by the Registrar General and they have kindly consented to be the member of the Committee. Let this committee be formed and give their findings on the following two questions :-

1. What is the date of birth of Calcutta–Whether it is 24th August, 1690 or some other date?

2. Whether Job Charnayak was the founder of Calcutta or not?

Let this committee give their findings six months. The petitioner shall bear the incidental expenses of this committee like transport and other connected matters. The venue and place of the meeting of the committee is left on the choice of the members of the committee.

Let the copies of these order sheets be sent to the five members of the committee by the Registrar General, Appellate Side and the parties may also send the signed copy of the minutes of this order to the five professors of the committee.

Put up the matter after six months from date.

All parties including the Registrar General to act on a xerox signed copy of this Dictated Order upon usual undertaking."

3. The Committee was constituted by the eminent historians namely,

1. Prof. Nemai Sadhan Bose, Former Vice-Chancellor, Viswa Bharati, Shantiniketan.
2. Prof. Barun De, Former Director, Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata.

3. Prof. Arun Kumar Dasgupta, Formerly Professor of History, University of Calcutta.
4. Prof. Sushil Chaudhury, Former Professor of Islamic History & Culture, Calcutta University.
5. Prof. Pradip Sinha, Formerly Professor of History, Rabindra Bharati University, Kolkata.

4. The expert committee after examining all the historical records has submitted their report and answered both the questions which were referred to them. They have summed up their recommendations as follows :

"To sum up :

(1) Calcutta does not have a 'birthday'. Its origin is part of a general process of rural settlement, clusters of which agglomerated in the last decade of the 17th century, into the English Company's trading factory. This grew into the town in the 18th century. No one year marks its 'date of birth'.

(2) One Simple "founder" cannot be determined. Names that can be celebrated in the 17th century, process and had, indeed, been celebrated for more than one century up to today are : Charnock, who settled in Sutanuti, Eyre and Goldsborough, on English side, and Lakshmikanta Majumdar who developed the tract : the Sett and Bysack families who lived in Govindapur, and Sabarna Choudhuries who sold the villages to the English.

(3) Historical texts are not meant to always emphasise exact dates and/or founders. They should deal more with processes of continuity and change, or synthesis as well as dialectical plurality, of course always backed up by data and consistent logic."

5. After receipt of the report of the expert committee, a copy of the report of the expert committee was given to the State and the learned Advocate General, Mr. Balai Roy, appearing on behalf of the State submits that the State accepts the recommendation of the expert committee and does not want to file any caveat against the findings given by the expert committee.

6. Since the findings given by the expert committee have been accepted by the State, we accept the findings of the expert committee and dispose of the writ petition and direct the State to proceed in accordance with the findings given by the expert committee.

The report of the expert committee shall be treated as a part of this judgment.

All parties are to act on a xerox signed copy of this Dictated order on the usual undertaking.

Application disposed of accordingly

ACKNOWLEDGEMENT--CALCUTTA LAW TIMES, AUG. 2003.
THE EXPERT COMMITTEE REPORT

In the High Court of Calcutta

Before : A.K. Mathur, CJ and S.K. Mukherjee, J.

Re : Order No. WP 1484 of 2001, dated 2.04.2002

Our committee was former to "give .... findings on the following two questions :-

1. What is the date of birth of Calcutta : whether it is 24th August, 1690 or some other date?
2. Whether Job Charnock was the founder of Calcutta or not? The preamble to the relevant 'dictated order' circulated to us mentions another question 'to be gone into'-"who was the founder"?

It is generally held and commonly taught that Calcutta was founded by Job Charnock when he "raised the English flat" (?) at a ghat on

the river bank at Sutanuti, which became a part of the city after his death (1693). From this stems the common belief that Job Charnock was Calcutta's founder. However, from the time A.K. Roy, in the Bengali Census of 1901 appended a short History of Calcutta as an official publication of the British Government of India, it has been emphasized that his ancestors the Sabarna Choudhuri family, then resident at Sarsuna near Barisha, south of the city, had sold the three villages comprising the city, including Dihi (sic) Kalikata (where a tank called Lal Dighi was located) to the East India Company in the time of Charnock's successor, Charles Eyre. Roy, late in 1926, wrote about one of the founders of his family, 'Lakshmikanta Majumdar', a book which he subtitled. "A Chapter in the Social History of Bengal", about how this officer of the Mughal Empire had developed the region around the three villages and about the existence of flourishing rural life in the region including Kalikata, as well as Sutanuti, Gobindapur and Kalighat in the 17th Century. He and his descendants were Zamindars in the region under Mughal rule. For a long time it has been common knowlege that there had been settlement in all the villagers before Charnock landed and began to finally reside in one of them from 1690, and the Company shifted and expanded settlement thereafter his death in 1693. Charnock was the first company official to state a settlement in a fairly populated rural and mercantile area. It is relevant to underline that cities do not necessarily have dated of birth and/or a 'founder'. Of course, there may be exceptions. Some are set up by State flats, or by explicit community decisions, recorded inscriptions, charters or otherwise. Amongst such instances are : Alexandria in Egypt, St. Petersburg, perhaps Jaipur below Amber Fort, Chandigarh built as capital of Punjab and Haryana. But, more generally, cities like Calcutta or Madras, even much earlier Delhi and Banaras have grown by not very perceptible changes in the process of agglomeration from settlement clusters to municipal demarcations.

The regions of great and big historical cities such as Rome and London are shrouded in legends. The birth of the city of Calcutta is to be judged in similar historical background and context.

Job Charnock fled from Hooghli (where the English established their first factory in 1651 and which was their chief factory) following a skirmish with the Mughals and was searching for a place for establishing a trading centre for the English company. He landed at Sutanuti on 20th December, 1686. After three months he moved to Uluberia where he stayed for three months and then came back to Sutanuti for the second time in September 1687. Following a war with the Mughals, Charnock and his compatriots left Fort St. George and returned to Sutanuti again on 24th August, 1690. His main motive was to find out a suitable and strategic place form where the English trade could be conducted, even defy the authority of the Mughals in Bengal He had no idea or intention whatsoever to lay the foundation of a city in an alien country, neither did he do anything to run the small hamlet of Sutanuti into at least something which could be called even the nucleus of a city. In fact, even after nine months of his stay in Sutanuti, the Fort William Council wrote to the Directors in London that "they (the British in Sutanuti) were in a wild, unsettled condtition at Chuttanutee, neither fortified house nor godown, only tents, huts and boats. "Thus, when the so-called 'founder' of Calcutta breathed his last in January 1693. Sutanuti was far cry from the later imperial city of Calcutta.

Moreover, in all the correspondence of Job Charnock and his compatriots, the dateline was invariably 'Chuttanuttee' and not Calcutta or even 'Kolkata'. Later, the dateline used was For William and it was not before early eighteenth century that the name 'Calcutta' appeared in official correspondence of the English Company. In other words, neither Charnock himself nor his later compatriots were ever aware of the existence of a city called 'Calcutta', nor were they connected consciously with the foundation of Calcutta.

As late as 1782 Warren Hastings in a minute, preserved in the British Museum, complained about the unsuitability of Calcutta as the "capital of a powerful dominion and the source of a vast political system. "The reason he gave were its humidity and its choice as a British settlement by a few frugal adventurers.

The rise of a city, historically, is more a process rather than an isolated fact. Undoubtedly, British historians and rather recent British literature, over the years, were instrumental and establishing the idea that on 24th August, 1690, Job Charnock laid the foundation of the city or Calcutta. There is an obvious lack of exactitude in the imperial idea that it is Charnock who, as an act of imperial destiny, founded the city. In 1990 the Calcutta Terecentenary was observed by the British as well as the Government of West Bengal. On that occasion, in a companion volume to the Brithish Museum's lavish exhibition, Calcutta, City of Palaces" in that year, J.P. Lostly, the Curator incharge of Prints and Drawings, India Office Library, the British Library of London, an eminent scholar, wrote about Charnock's final return after two previous visits to the villages that would later become Calcutta : "On 24th August 1690 (he) established himself once again at Suttanuttee" (p. 15). Suttanutti, as Lostly says, meant "cotton bale" and the place was actually called Sutanuti Hat or cotton bale market. Lostly is quite explicit in clarifying that Charnock died in 1693 and "had done little to establish a permanent factory. His son-in-law, Eyre was the man who build his grandiose mausoleum in St. John's Churchyard. If (an) extract from the records (which Lostly quotes) is to be taken as it stands, then it is to Goldsborough (the Company's Governor of all its settlements in India at that time) .... visiting Suttanuttee in 1693 after Charnock's death .... that the credit must go for shifting the nucleus of the settlement southwards to Calcutta, for the lines drawn by Goldsborough became the walls of the factory compound within which the August (Eyre) was already living in 1695. (p. 17).

Goldsborough did not 'found' Calcutta. Nor did Charnock who address his reports to the Company in his records from 'Chuttanuttee'. nor Kalikata, which had not been purchased at that time. Nor did Eyre, after whose time the address is shown as whatever spelling was given at that time of Calcutta as it has become by the 18th century, Kalikata was the place to which the company shifted to build its Fort William, which was the exact address at that time. Kalkata is mentioned in the late 16th century Ain-I-Akbari, and as a Pargana after that in Bengal literature Dihi Kalikata was one of the villages bought by the Company. There is reference also in the literature, (e.g. ,C.R. Wilson, Old For William in Bengal, Volume I, 1906) to another location called Bazar Kalikata, presumably between Laldighi and Sealdah. It may be recalled in this connection that early in the 20th century when the capital of the British Indian Empire was transferred from Calcutta to Delhi, it was the British merchant community which vigorously protested against the move, called Calcutta 'Queen of the East' by virtue of its trade and commerce and the so-called 'pleasure' derived from them. From the late 19th century, Writers like Cotton, Wilson and Hunter poured their love and admiration on that luminous object of British achievement, the jewel of jewels that was Calcutta The 'founder' of that great city, Job Charnock came in for much adulation. In the preface to the first volume of his *Early Annals* (1895) C.R. Wilson had written, "Charnock, and Charnock alone. founded Calcutta". Wilson's admiration for Charnock exceeded reasonable limits. Job Charnock may be identified as the person who first set up an English factory (that is a business house), in Sutanuti in the immediate neighbourhood of Kalikata. When British historians wrote about the origins of the imperial city of Calcutta they looked for a convenient starting point.

Job Charnock arrived in India in 1655. He was a minor member of the Council of Bengal in 1657. He was first seen in Kasimbazar

around 1658. He became the chief of the Patna factory in 1664 from where he returned to Kasimbazar in early 1681. He was embroiled in a dispute with the local merchants and administration, ordered to pay Rs. 43,000/- to the former but he gave a slip and fled to Hoogli where he took over as the Agent in April 1686. Be that as it may, the skirmish at Hoogli signalled the outbreak of hostilities. The intervention of the Dutch at the instance of the Nawab resulted in cessation of hostilities but the British, considering it not safe to stay in Hoogli any longer, moved down to Sutanuti, 26 miles downstream and south of Hoogli. This was 20th December 1686. From here the British sent the Nawab their terms for a settlement, including grant of a land for building a for which the latter regarded as insolent and rejected forthwith. The British decided to show more force and destroyed the Nawab's salt golas, demolished Thana and Garden Reach Forts, seized Hijli and set the native ships on fire. The Mughals failed to expel the British from Hijli and opened negotiations for settlement. After three months a cessation of arms was agreed upon and the Nawab permitted them to settle at Uluberia.

Though Charnock regarded it as 'honourable peace', he was cautious that "such a peace is best made with sword in hand". But the British were not serious about peace unless they had wrested some extra privileges, especially a fortified settlement as a evident from a Surat letter. However, Charnock stayed in Uluberia about three months, but he found the place so 'improper' for his purposes that he came back to Sutanuti again in September 1687. Meanwhile a fresh nalal force from England was sent to Bengal under Capital Health and the Court's instruction was emphatic that no peace be made without having fortified settlement. When Health arrived a Sutanuti on 20th September 1688, the British negotiation with the new Subadar, Bahadur Khan was still on. But Health and Charnock, without waiting for the final outcome, attacked Balasore and set sail to seize

Chittagong. The expedition to Chittagong, however, proved abortive and the British decided to take refuge in the safe haven of Fort St. George where they arrived in February 1689, when they made a 'humble petition' and expressed their 'repentance' to the Mughal Emperor, they were 'pardoned'. The British under Job Charnock returned to Sutanuti on 24th August 1690 and finally settled there which became the nucleus of the future imperial city of Calcutta. He died shortly after (1693). In 1698 his son-in-law Charles Eyre, by giving a present of Rs. 16,000/- to the then Bengal Subadar, Prince Azim-Us-Shan, got the permission to buy the Zamindary rights of Govindapur, Sutanuti and Kolikata from the Sabarna Roychoudhuri family. When the fort was constructed, they named it Fort William after the king of England. The Fort William became the nucleus of the future imperial City of Calcutta. Thus, the growth and development of Calcutta was closely connected with the British trade both corporate and private. In other words, the early history of Calcutta is inseparable from the history of British imperialism in India. And in the final analysis, neither Job Charnock can be regarded as the founder of Calcutta nor the claim that Calcutta was born on 24th August 1690.

When Charnock died in January 1693, Sutanuti was a far cry from the later imperial City of Calcutta though, undeniably, his name rightly came to be significantly associated with the history of the development of Calcutta as a colonial city.

The early history of Calcutta does not begin with the arrival of Job Charnock. Among others, attention may be drawn to an article by Sukhamaya Mukhopadhyay, "Ingraj purva juger Kalikata" (Kalikata before the coming of the English) in *aitihasik* (6th July, 1978). He asserted that Kalikata, before the English, was not a petty village but an important place in its own right. It was not inhabited by low-caste people only. There were settlements of high-caste social groups along a narrow strip of high ground on the banks of the Ganges (the

Hooghly River of the British documents). The medieval Bengali poet Krishnaram Das (1676-77) in his *Kalikamangal*, mentions the Brahmin family, the Sabarna Chaudhuries.

Sanatan Ghoshal (1678-80), another medieval Bengal poet, claims Kalikata to be his birth place. This indicates that the Brahmin family of Ghoshals lived there. Mukhopadhyay goes on to mention that the map of Van den Brock, a Dutchman, shows 'Calcutta' as a place name. This was in 1660. Even earlier, Abul Fazal's Ain-I-Akbari mentions 'Calcutta' as a mahal under Sarkar Saptagram (1585). The importance of Kalikata was derived from the fact that it was an administrative division under the Mughals. Whichever way one may call it, a pergunah, as the medieval Bengali poets did, or a mahal as Abdul Fazal did, it was recognised as a revenue-paying unit.

Apart from Brahmin families there were other settlers in an around Calcutta who had moved into the place before the English. The Seths and Basaks, who were weaver merchants, moved from Saptagram to Kalighat and later on to Kalikata. The presence of the Armenians has already been noticed Mukhopadhyay refers to Suiti Kumar Chatterjee's discovery of a gravestone in the yard of the Armenian Church in Calcutta of a woman named Rezabebeh and carrying the date of 1632. It seems clear that outside merchants from all over India and abroad frequented the busy mart of Sutanuti and the neighbouring Burra Bazar area. Mukhopadhyay's reference to Ghulam Hussain's Riaz-us-salatin (1788) opens up another dimension of the history of Kalikata. The book says that the image of Kali was long established here and the revenue earnings of the area was earmarked for the worship of the goddess. The locality was known as 'Kalikarta' which means that Kali was the Karta or lord or owner of the place. The word 'Calcutta' may have been a distortion of Kalikarta. There is also the oft-quoted passage of *Manasavijay* by Bipradas Pipilai (1495-96).

Evidently, when Job Charnock arrived at Sutanuti in 1690, Calcutta was not a pestilential marshy land inhabited by lower class people only. There were settlements of high-caste groups on the river side stretching from Sutanuti, through Kalikata, Gobindapur right upto the Kalighat shrine located on Adi Ganga, that is Tolly's Nullah, Sutanuti was a flourishing cloth market which attracted a variety of India and foreign merchants. Under the Mughals Kalikata was recognised as a parganah under Sarkar Saptagram. It was a sacred place due to the presence of the image of goddess Kali *(ati punyamay dham)* and the Government allocated the local revenue for the upkeep of the shrine. Many medieval Bengali poets have mentioned Kolikata as an important place which was in existence at least as far back as the 15th century.

Som pre-Charnok Calcutta had two attractions. It has a holy shrine and a flourishing cloth market and there was a relation between the two. Seagoing vessels sailing along Bhagirath combined trade with religion. It was customary for ships going out to Gangasagar for pilgrimage or to take part in inter-Asian trade to offer puja at the famous shrine of Kalighat. No wonder that Kalikata before the coming of the English was an important place.

In the absence of dependable historical sources and narrative one has to fall back upon assorted pile of legends, stories and beresays to write up an authentic account of this riverside settlement called Kalikata. Nevertheless, it appears right to hold that the Sabarna Chaudhuri family and the outstanding figure of Lakhmikanta Majumdar of that family occupied a central place in the history of early Kalikata. The Sabarna Chaudhuries played a significant historical role in the expansion of Bengal socio-economic and cultural life, Sutanuti, Govindapur and Kolikata, which formed part of the zamindary of the Sabarna Roychoudhuries, became the nucleus of the future imperial City of Calcutta. The Sabarna Choudhuries were certainly important in the development of commerce and religious activities on the east

bank of the Hugli River from Dakshineswar to Behala in the 17th and early 18th century. But the final the final question–"Who was the founder of Calcutta" leads to a problem of historical method. Determination of truth in history is a question of different intepretations of either the same evidence or different sets of evidence. Historians do not act as Judges, arbitrating one specific version. We have examined the problems in calling Job Charnock, 'The Founder of Kalikata'. There are similar problems in calling Laksmikanta or any of his descendants 'The Founder' of Calcutta.

To sum up :–

1. Calcutta does not have a 'birthday'. Its origin is part of a general process of rural settlement, clusters of which agglomerated in the last decade of the 17th century, into the English Company's trading factory. This grew into the town in the 18th century. No one year marks its 'date of birth'.
2. One simple 'founder' cannot be determined. Names that can be celebrated in the 17th century process, and had, indeed, been celebrated for more than one century up to today arernock, who settled in Sutanuti, Eyre and Goldsborough, on English side, and Laksmikanta Majumdar who developed the tract : the Sett and Bysack families who lived in Govindapur, and Sabarna Choudhuries who sold the villages to the English.
3. Historical texts are not meant to always emphasise exact dates and/or founders. They should deal more with process of continuity and change, or synthesis as well as dialectical plurality, of course always backed up by data and consistent logic.

Nemai Sadhan Bose (convener)
Barun De
Arun Kumar Dasgupta
Sushil Chaudhury
Pradip Sinha

সাবর্ণ সংগ্রহশালা

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল একটি সাবর্ণ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা। সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপদানের জন্য উক্ত পরিষদের উদ্যোগে 'বড়বাড়ির সপ্তর্ষি ভবনে' ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন সাবর্ণ সংগ্রহশালার পত্তন হল। উদ্‌বোধন করলেন মাননীয় ঐতিহাসিক শ্রী রাধারমণ রায় মহাশয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালান জোকার গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের কারিগরি বিভাগের অন্যতম প্রধান মাননীয় শ্রী নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্‌বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহশালায় জনসাধারণের স্রোত বয়ে যায়। অতিথি এবং দর্শকবৃন্দ এই সংগ্রহশালার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এতদিন ঐতিহ্যপূর্ণ সামগ্রীপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, পুস্তক এবং Antique দ্রব্যাদি সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারে গচ্ছিত থাকত। তারপর সেগুলি বড়বাড়ির 'সপ্তর্ষি ভবনে' সংগৃহীত হতে থাকে। এখন সেগুলি একটি নির্দিষ্ট সংগ্রহশালায় সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শিত হওয়ার ব্যবস্থা হল। অভিনব গ্যালারি এবং পাঠাগারের মাধ্যমে সেগুলি দর্শকদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রী কানুপ্রিয় রায় চৌধুরী মহাশয় জানালেন—সাধারণ মানুষদের মধ্যে ইতিহাস-সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই সংগ্রহশালার উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন—সর্বসাধারণের সুবিধার্থে সংগ্রহশালার মধ্যে পাঠগৃহেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় শ্রী রাধারমণ রায় বলেন—এই সংগ্রহশালাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতে হবে আগামী প্রজন্মকে। তিনি এই সংগ্রহশালার খুবই প্রশংসা করেন। মাননীয় শ্রী নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে স্বীকার করেন যে এই সংগ্রহশালার গুরুত্ব অপরিসীম। আরও সংগ্রহের মাধ্যমে এই সংগ্রহশালা একদিন বিরাট আকার ধারণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই সংগ্রহশালায় ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের গোবিন্দপুর, কলিকাতা, সুতানুটি প্রজাস্বত্ব হস্তান্তরের দলিলের প্রতিলিপিসহ বহু প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষিত হয়েছে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের জমিদারি আমলের একটি বিরাট মাটির জালা (বড়ো কলশ জাতীয় পাত্র) প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। ভিক্টোরিয়া আমলের মুদ্রা, বাতিদানি, হুঁকো প্রভৃতি ঐতিহ্যপূর্ণ বহু ছোটখাটো জিনিসপত্র এই সংগ্রহশালার গ্যালারিতে সুসজ্জিতভাবে রাখা হয়েছে। সাধক রামপ্রসাদের স্বাক্ষর করা বৈষয়িক নথি, হরিণের শিং, শংকর মাছের দাঁত থেকে শুরু করে বংশের মহাপুরুষগণের ছবিও এই সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত হয়েছে।

বহু তথ্যপূর্ণ বইপত্রও পাঠাগারে সংগৃহীত হয়েছে। এইসব বইপত্র সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের গবেষণার কাজে প্রভূত সাহায্য করছে। তা ছাড়া পাঠাগারে বহু গবেষণাপত্রও রাখা হয়েছে।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী বিমান রায় চৌধুরী ঘোষণা করলেন—বৃহস্পতিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলিতে সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং বিকাল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত সংগ্রহশালা সাধারণের জন্য খোলা থাকবে। পরিবারের মহিলাগণই এই সংগ্রহশালার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালাবেন।

ইতিমধ্যে 'সাবর্ণ সংগ্রহশালা' যথেষ্ট প্রচারের মধ্যে এসেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ তাঁদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এই সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে যাচ্ছেন। দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেল এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকেও ইতিমধ্যে সংগ্রহশালার তথ্যাদির প্রচার অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এমনকি অনেকে সংগ্রহশালার পাঠাগারের বইপত্র নিয়ে গবেষণার এবং ইতিহাস রচনার কাজে লিপ্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

সাবর্ণ সংগ্রহশালা (উপসমিতি)

রক্ষণাবেক্ষণ ; সুচরিতা রায় চৌধুরী, বিজলী রায় চৌধুরী, জয়দীপ রায় চৌধুরী, সন্দীপ রায় চৌধুরী।

উপদেষ্টৃমণ্ডলী : সর্বশ্রী নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় [প্রদর্শশালা বিজ্ঞানী], রাধারমণ রায় [গবেষণক ও ইতিহাসবিদ]

ফটোগ্রাফিক ও কম্পুটার সহায়ক : শ্রী সঞ্জয় রায় চৌধুরী

মূল ভাবনা ও তত্ত্বাবধানে : শ্রী দেবর্ষি রায় চৌধুরী, সুজাতা রায় চৌধুরী।

কালীঘাটের কালীমন্দির
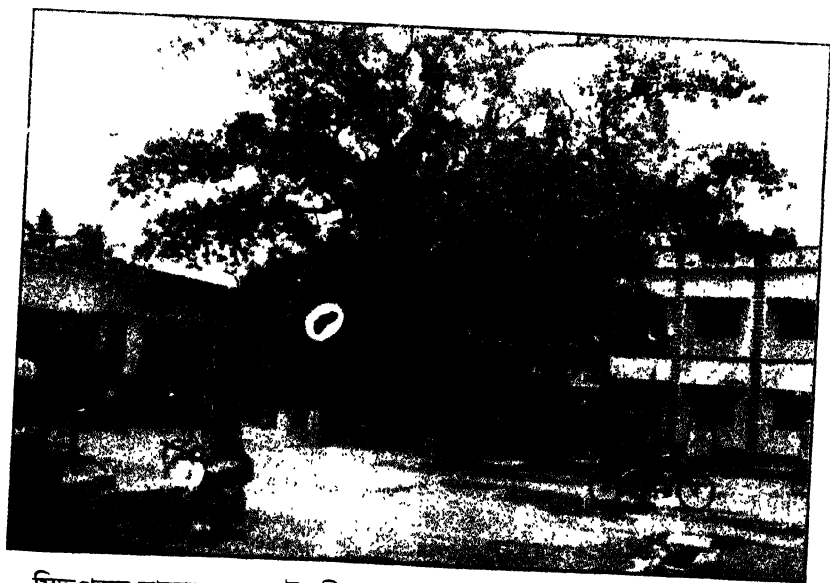
সিদ্ধপুরুষ রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী এবং সাধক রামপ্রসাদের সাধকপীঠ পঞ্চবটী

স্বামী যোগানন্দ মহারাজ
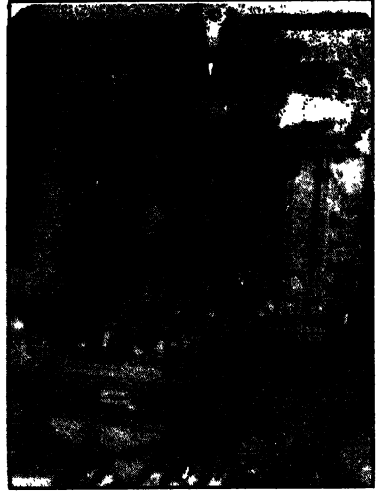
উত্তরপাড়ার মুক্তকেশীদেবীর মূর্তি
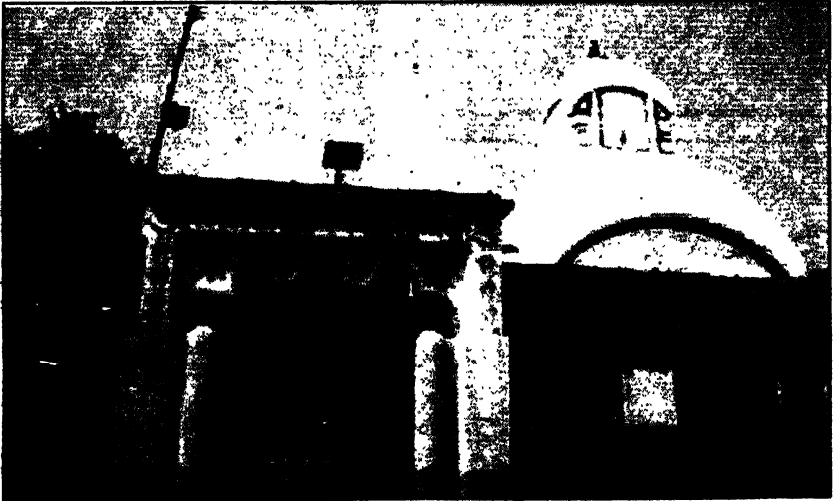
নিমতা কালীবাড়ি

বিরাটি নবমীর কুমারী পূজা
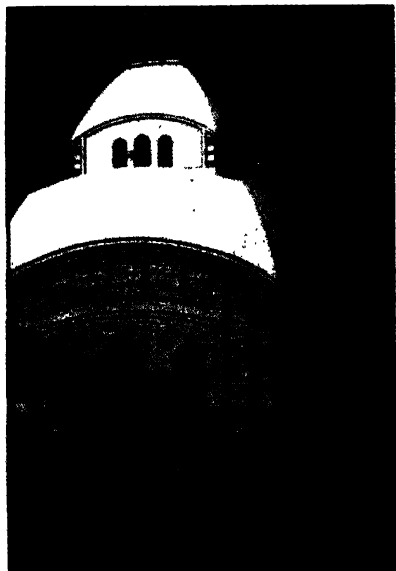
মন্দিরবাজারের শিব মন্দির
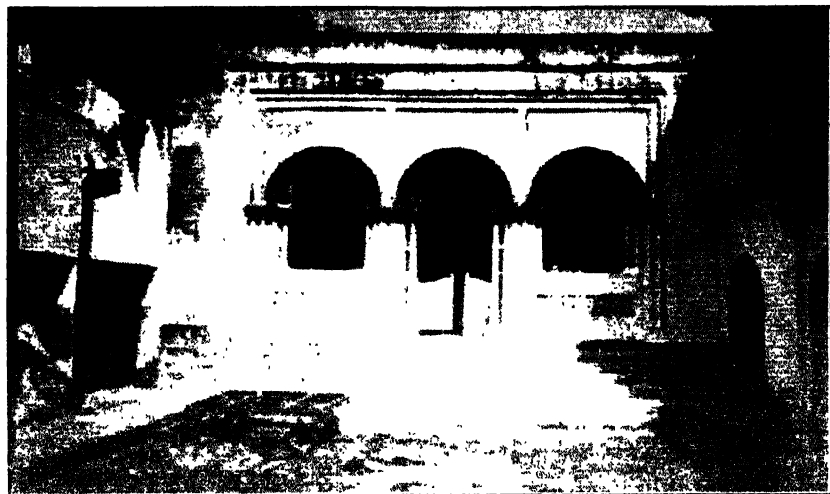
বিরাটির ঠাকুর দালান

বড়িশার আটচালা কাছারি বাড়ি

সুশীলেশ্বরী দেবীর মন্দির
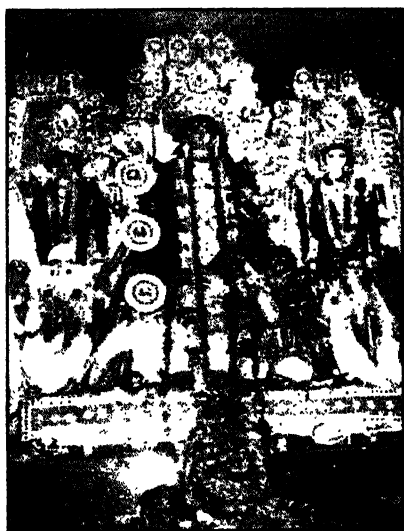
বড়িশার আটচালা বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা

বড়িশার মেজো বাড়ির
অশ্বমুখ সিংহসহ দুর্গাপ্রতিমা

বড়িশার বড়বাড়ির
অশ্বমুখ সিংহসহ দুর্গাপ্রতিমা
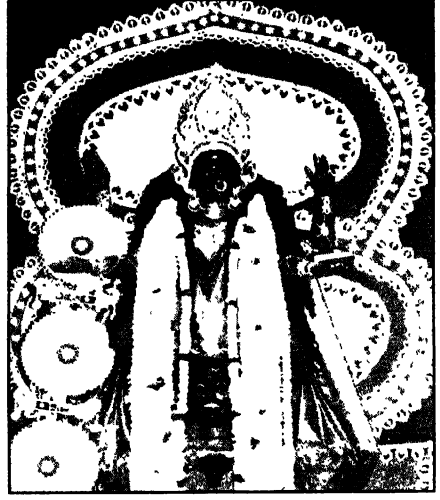
বড়িশা - শ্রী শ্রী চণ্ডীমাতা

বড়িশার কালীকিঙ্কর ভবনের দুর্গাদালান

বড়িশার বড়বাড়ির দুর্গাদালান
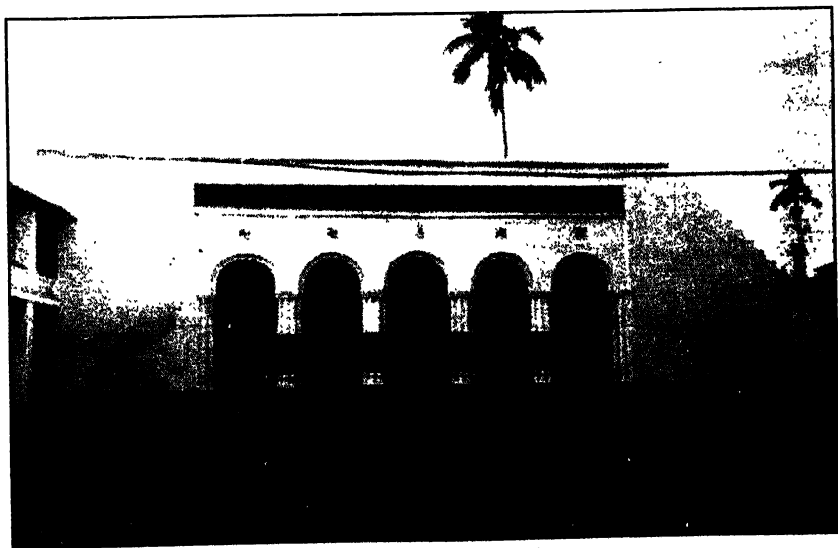
বড়িশার বেনাকিবাড়ির দুর্গাদালান
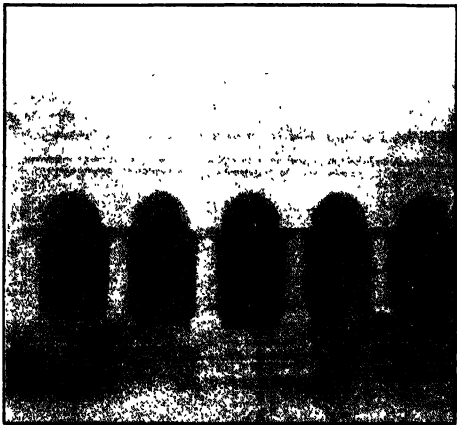
বড়িশার মেজোবাড়ির দুর্গাদালান
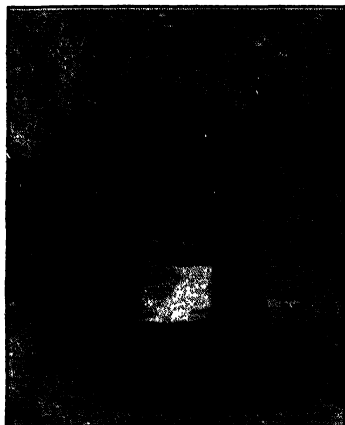
বড়িশার মাঝের বাড়ির সিংহদ্বার

করুণাময়ীর মন্দির

ময়দার কালীবাড়ি
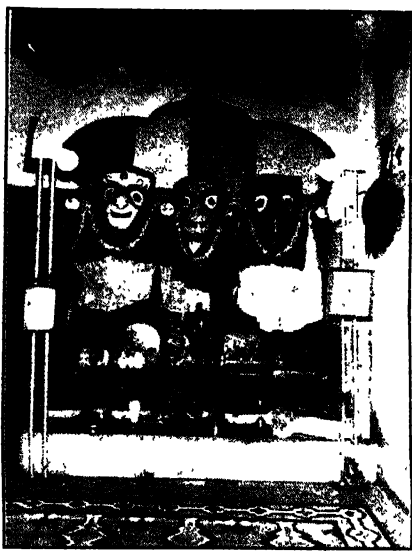
বড়িশার জগন্নাথ বিগ্রহ

বড়িশার শ্রীশ্রী রাধাকান্ত জীউ
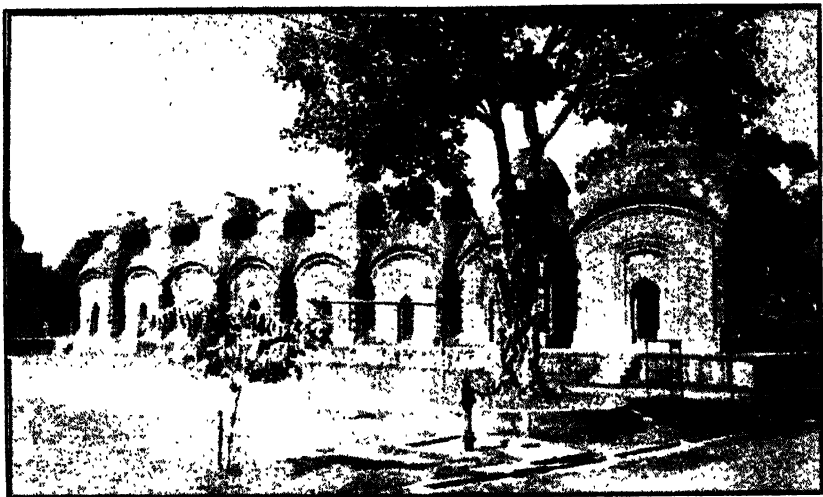
বড়িশার দ্বাদশ শিবমন্দির

বড়িশায় সাবর্ণ সংগ্রহশালা ও পাঠাগার
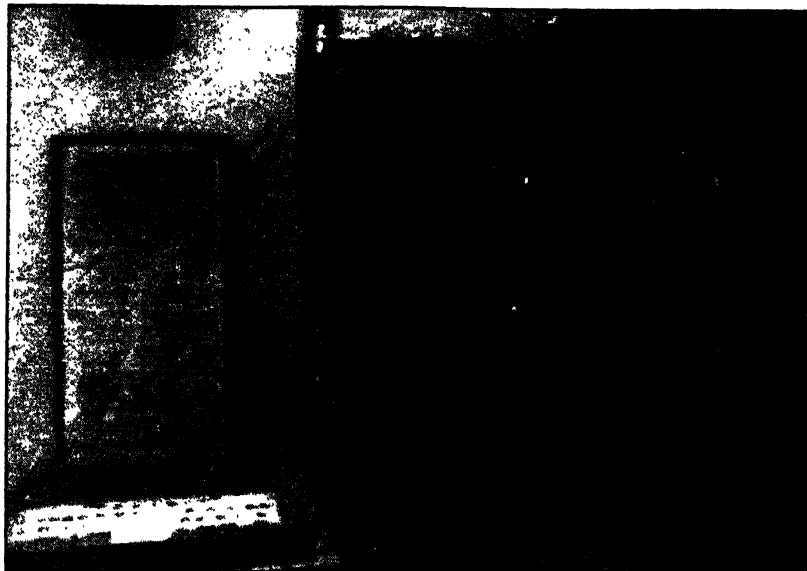
সাবর্ণ সংগ্রহশালার অভ্যন্তরীন চিত্র

খেপুত - ঠাকুর মন্দির
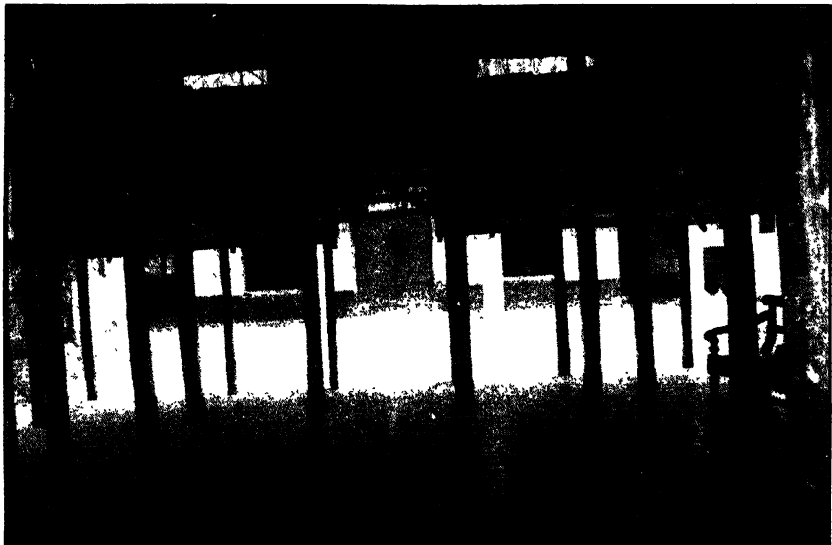
খেপুত - আটচালা

খেপুত - সদর দরজা - উপরে নওবৎখানা

খেপুত - ইষ্টদেবী কালীমাতা
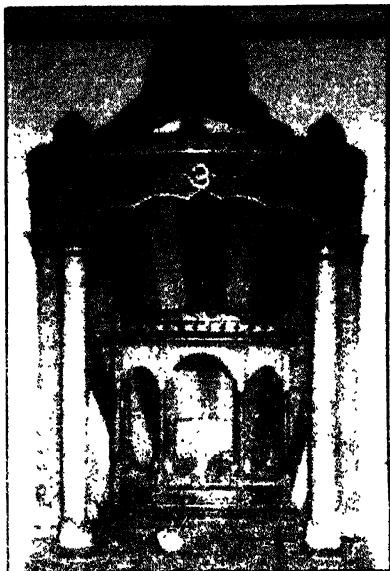
খেপুত - শ্রী শ্রী রঘুনাথজীউর সিংহাসন পাশে মঙ্গলচণ্ডী ও লক্ষ্মীর কৌট

খেপুত জমিদারী আমলের ত্রিতল বাড়ি
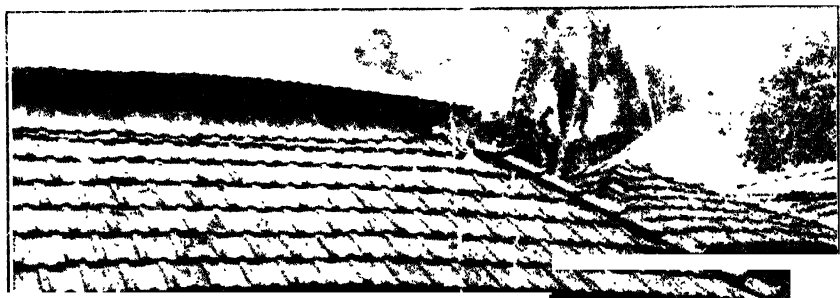
খেপুত - আটচালার পূর্বদিকে ভাঁড়ারঘর
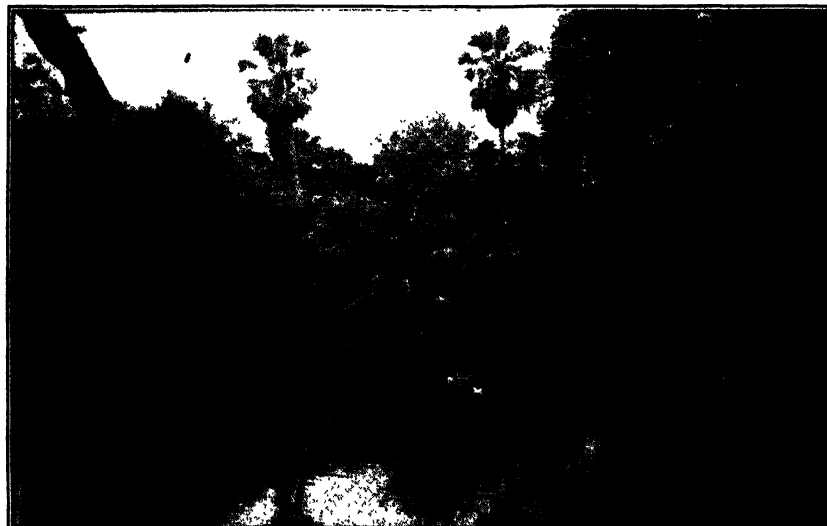
খেপুত - রামের পুকুর
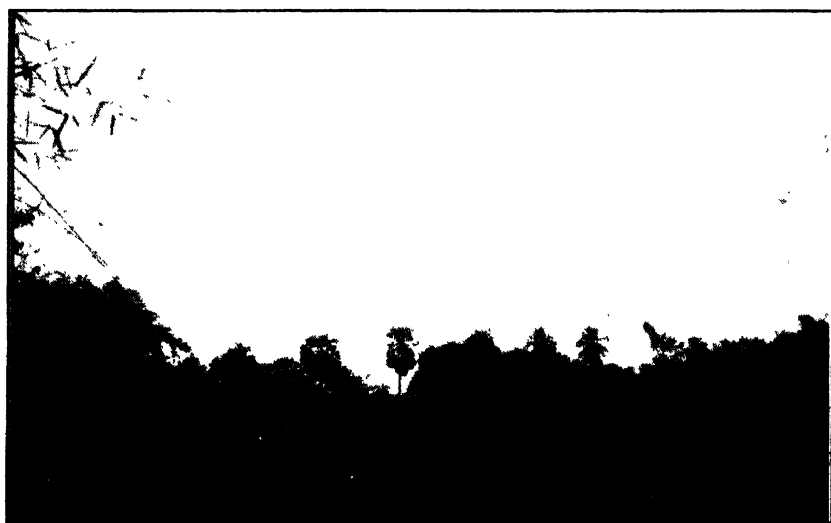
খেপুত - ইশারা পুকুর

তথ্যসূত্রের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাগুলির নিকট আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

১। গীতা— কয়েকটি ছত্র

২। মনুসংহিতা— ”

৩। পীঠমালা— ”

৪। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী— ”

৫। Laksmikanta–A chapter in the social History of Bengal–A. K Roy.

৬। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

৭। বেহালা জনপদের ইতিহাস—সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। সম্বন্ধ নির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি

৯। কালীক্ষেত্র দেবীপিকা—সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০। কালীঘাট-ইতিবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১১। সাবর্ণ কলিকাতা—সাধন দাশগুপ্ত

১২। কবি কৃষ্ণরাম দাস—কাব্যগ্রন্থ

১৩। কলিকাতা—সেকালের একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৪। Barabari—Prabal Roy Choudhury & Devashi Roy Choudhury

১৫। দেশী কলকাতার দেশী জমিদার—পিনাকী মুখোপাধ্যায়

১৬। সাবর্ণ বার্তা—২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫—সম্পাদক—ড. শুভব্রত রায় চৌধুরী।

১৭। নিমতা বিরাটির ইতিহাসের রূপরেখা—দেবপ্রসাদ রায়

১৮। হালিশহরের মানুষ—হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৯। কামদেব ও কালীঘাট— গোরাচাঁদ রায় চৌধুরী

২০। পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র—দীপ্তিময় রায়

২১। আমার কলকাতা—পূর্ণেন্দু ঘোষ (প্রবন্ধ)

২২। কালীপুজোর সময় কালীঘাটের কালীমন্দিরে বড় করে লক্ষ্মীপুজো হয় কেন?—সুমন গুপ্ত (প্রবন্ধ)

২৩। হালিশহর ইতিবৃত্ত/অনুষঙ্গ—শিবসৌম্য বিশ্বাস

২৪। শ্রীরামপ্রসাদ কবি ও কাব্য—ড. প্রমথনাথ মণ্ডল

২৫। হে অতীত তুমি কথা কও—অতীন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬। সাবর্ণ পরিচয়—অরুণা চক্রবর্তী (রায়চৌধুরী)

২৭। সাবর্ণ রায় চৌধুরী দমদমে (দমদম সেকাল একাল)—হরিশ গোস্বামী

২৮। Calcutta Law Times—Calcutta High Court

২৯। কবি ভগবান মুখোপাধ্যায়—কাব্যগ্রন্থ।

৩০। মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (২য় ও ৩য় খণ্ড)—সম্পাদিত ও লিখিত ড. প্রণব রায়।

৩১। মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন সম্পদ—ড. প্রণব রায়।

৩২। চিতুয়া (চেতুয়া) পরগনার সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্য (১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ) —ড. প্রণব রায়।

৩৩। [illegible]

৩৪। [illegible]

৩৫। [illegible]

--- o ---